অগ্রন্থিত রমেশচন্দ্র

সম্পাদনা

সমর চন্দ

প্রথমত

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ ১৩৯৫

প্রকাশক ঃ মানবেন্দ্র রায়
প্রথমত। ৩/১২৭ যতীনদাস নগর, কলিকাতা-৫৬।

মুদ্রাকর ঃ শিবশঙ্কর প্রেস, ৪৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র ঃ রবীনঘোষ, দুর্গাপুর

প্রচ্ছদ লিপি ঃ অনির্বাণ দত্ত

প্রচ্ছদপট মুদ্রক ঃ স্ক্রীন ভিউ, কলকাতা-১২

বাইন্ডার্স ঃ গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স
৩৮ এ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। কলি-৯

পরিবেশক ঃ **দে বুক স্টোর**। ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

সম্পাদকের নিবেদন

'রমেশচন্দ্র সেনের গল্প'— সম্পাদনার পর 'অগ্রন্থিত রমেশচন্দ্র' সম্পাদনা করতে পেরে খুবই আনন্দ হচ্ছে। প্রথমে ঠিক ছিল, রমেশচন্দ্র সেনের যাবতীয় রচনাকে একত্রে সংকলিত করা হবে। কিন্তু দেখা গেল, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কারণ রমেশবাবুর সমস্ত রচনার খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নি। আর সমস্ত রচনা একটি মাত্র সংকলনে রাখাও সম্ভব নয়। তাই নির্বাচনের পথে যেতে হল।

সংকলনভুক্ত দীপক (উপন্যাস), অমাবস্যার ভাষা, অবলম্বন, ফল্গু (ছোট গল্প) 'দেশ' পত্রিকায়, একখানি পোস্ট কার্ড, চিরন্তনী (ছোট গল্প) শারদীয় যুগান্তরে; পাঁচপন, শারদীয় বসুমতীতে ; ক্ষণিকা, শারদীতে প্রকাশিত হয়েছিল। মুক্তির কাঁটা কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে মিহিরকুমার সেনের কাছে সংরক্ষিত পত্রিকার কাটিং-এ দেখা যাচ্ছে চৈত্র, ১৩৩৭ সালে এটি ছাপা হয়। ভবানী সিংহের ফিশারী প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক স্বাধীনতায়। 'পথের কাঁটা' গল্পটি 'কালপুরুষ' পত্রিকার বিশেষ সংকলন থেকে সংগ্রহ করেছি। 'নন্দ ঘোষ' সোনার বাংলায়, আষাঢ় ১৩৫৩-এ প্রথম প্রকাশিত। আর 'সমিতির ইতিহাস' সাহিত্য সেবক সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। এই ইতিহাস পাঠে জানা যায়, রমেশবাবু 'কাজলের কৈফিয়ৎ' নামে একটি প্রবন্ধ সমিতির সভায় পাঠ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যুগ্মভাবে একটি গল্প সংকলনও সম্পাদনা করেছিলেন। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। এই প্রসঙ্গে জানাই, সংকলিত উপন্যাস এবং ছোটগল্পগুলি এবং পরিশিষ্টে উল্লিখিত যে সমস্ত রচনার প্রকাশকাল জানানো যায় নি সেগুলির পত্রিকার কাটিং মিহিরকুমার সেনের কাছে আছে। প্রকাশকাল সংগ্রহের অক্ষমতার জন্য আমরা লজ্জিত ও দুঃখিত।

রমেশবাবুর লেখা কোন চিঠির সন্ধান পাওয়া যায় নি। চিঠি লেখার তাঁর মোটামুটি অভ্যাস যে ছিল তার প্রমাণ তাঁকে লেখা অন্যদের চিঠি।

যা হোক, তাঁর যে সমস্ত রচনা আমাদের হাতে এসেছে এবং তাঁর সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য আমরা পেয়েছি তাই দিয়েই সংকলনটিকে সাজাবার চেষ্টা করেছি। এর বাইরেও তাঁর একটি উপন্যাস 'সেলিরিনা' এবং বেশ কিছু ছোট গল্প রয়ে গেল। এর পরের দায়িত্ব পাঠক সাধারণের। এই সংকলন কতদূর সফল অথবা ব্যর্থ তার বীজ নিহিত তাদের তৃপ্তি, অতৃপ্তির উপর।

রমেশচন্দ্র সেন। জন্ম ১৮৯৪, ২২শে আগষ্ট, বাংলা ১৩০১ সন ৭ই ভাদ্র কলকাতার চোরবাগান। মৃত্যু ৬৮ বছর বয়সে, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ সন। পিতা কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, মাতা বরদাসুন্দরী দেবী। আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার কোটালী পাড়া পরগণার পিঞ্জরীগ্রাম। স্ত্রী বনলতা দেবী। এঁদের পাঁচ পুত্র ও নয় কন্যা। দু'জন অকালপ্রয়াত।

প্রথম জীবনে পণ্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা গ্রহণ। পরে টোলে পাঠকালীন প্রাইভেটে এণ্ট্রান্স পাশ। পরবর্তীকালে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থান (১৯১৭) ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনে যোগদান এবং সংস্কৃতে ভাষণ প্রদান। বিদ্যানিধি উপাধি লাভ। পেশায় কবিরাজ ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য ইংরেজ পুলিশ তাঁর ২০১, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটের বাসা বাড়ীতে তল্লাশী চালায়। বেশ ক'বছর উত্তর কলকাতা কংগ্রেস সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ব্যক্তি জীবনে অরবিন্দের ভক্ত হলেও কম্যুনিষ্ট বন্ধুর অভাব ছিল না তাঁর। 'সাহিত্যপ্রচার সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১১ সালে। ১৯১২ সালে এই নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'সাহিত্য সেবক সমিতি'। ৫০ বছর স্থায়ী এ ধরনের সংগঠন বাংলা সাহিত্যে প্রথম। 'কুরপালা,' 'শতাব্দী', 'কাজল', 'গৌরীগ্রাম' প্রভৃতির মত উপন্যাস এবং বেশ কিছু ভাল গল্পের লেখক হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর উপযুক্ত মূল্যায়ণ আজ পর্যন্ত হল না।

স্রোতের বিরুদ্ধে
প্রথমত প্রকাশনীর বই

রমেশ চন্দ্র সেনের গল্প
সম্পাদনাঃ সমীর রায়, সমর চন্দ
রং বেরং
সমর চন্দ

অগ্রন্থিত রমেশচন্দ্র

সম্পাদনা

সমর চন্দ

প্রথমত

কর্তৃক

প্রকাশিত

সূচী

পুর্নবিবেচনা

মানবসত্তা প্রত্যেক একক ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনও বিমূর্ত নয়। বাস্তবে তা হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কগুলির সমাবেশ। মার্কস

১ ১ : রমেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য রচনাকালীন সমসাময়িক পৃথিবীর চলমান ইতিহাসটি কেমন ছিল ? এবং তার সাথে তৎকালীন ভারতবর্ষ, যে সামাজিক বিবর্তন এবং রাজনৈতিক জঙ্গী এবং নরমপন্থী দ্বিবিধ টানাপোড়েনে একটি বিশেষ জায়গায় গুণগত উল্লম্ফনে পৌঁছে যাচ্ছিল সেটাও ভেবে দেখার মত। পাশাপাশি চলে আসে প্রবহমান বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত প্রথা ও প্রগতির দিকচিহ্নগুলি। দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পুঁজির ক্রমাগত নিষ্পেষণ শোষণে উদ্ব্যস্ত ভারতীয় জনজীবন, আবার একচেটিয়া ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক তন্ত্রের চরম দুর্দিনে ফ্যাসিবাদের উত্থান, তারও চাইতে রোমাঞ্চকর, পুঁজিবাদী সমাজবিক্রিয়ার কাছে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ক্রমযাত্রা সব মিলিয়ে সমস্ত যুগটি, আশা আকাঙ্খা নৈরাশ্য হতাশা মৃত্যুভয় এবং নতুন জীবনযাত্রার গাঢ় স্বপ্নে একটি ভিন্নমাত্রিক ইতিহাসের জন্ম দিচ্ছিল। ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার এই আশ্চর্য ক্রান্তিকালের আলোঅন্ধকারে জায়মান সেদিনের জনমানস কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল সেদিনের শিল্পসাহিত্যে, সাহিত্যিকদের দর্শন ভাবনায়, সে বিশ্লেষণের সামগ্রিকতায়, রমেশচন্দ্রের সৃজনশীলতাকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

জীবনানন্দ দাশ এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে ছয় বছরের বড়, এবং জগদীশগুপ্তের চেয়ে নয় বছরের ছোট ছিলেন রমেশচন্দ্র সেন। আবার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন রমেশচন্দ্রের থেকে পনের বছর পরে। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও রমেশচন্দ্রের পাঁচ বছরের অনুজ। সতীনাথ ভাদুড়ীর চেয়েও তিনি এক যুগের অগ্রজ। পরবর্ত্তী কালে যখন রমেশচন্দ্র সৃজনশীল এবং তাঁর গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, ঠিক সে সময়ই প্রকাশ পাচ্ছে উপরোক্তদের রচনাকর্মও। এবং উপরোক্ত সহযাত্রীদের সংগে যেমন তার এক জায়গার তীব্র সাযুজ্য ছিল, ঠিক সেরকমই বিবিক্ত ভাবনাও ছিল দুস্তর। অর্থাৎ প্রথাবিরুদ্ধ ভাবনায় তিনি যখন তৎকালীন প্রগতিপন্থা মূল্যবোধ ভাঙা সাহিত্যিকদের সহকর্মী, ঠিক তখনই তিনি আবার নিজস্ব অভিজ্ঞতা লালিত তাৎপর্যের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যায় আমাদের দৃষ্টিকে অন্য মাত্রা দেন। বাস্তবিক সামাজিক বিবর্ত্তনের এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনার শিরায় শিরায় এতো গভীর প্রোথিত যা বহমান বাংলা সাহিত্যে খুব একটা নজরে আসে না। প্রবহমান স্রোত থেকে এভাবেই তিনি এবং তাঁর রচনাকর্ম চরিত্রে ভাবনায় আলাদা এক তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টি করে যায়। রমেশচন্দ্রের রচনা বিশ্লেষণে এই দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতাই একটি ভিন্ন মাত্রা পায়। এবং তাঁর মূল্যায়ণে এই তাৎপর্য পূর্ণ দৃষ্টিপাতই মূল চাবি হয়ে কাজ করে যায়।

১.২ঃ জীবিত কালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস সংখ্যা এগারো। এবং পরে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে দুটি অগ্রস্থিত উপন্যাসের যার একটি সম্ভবত চল্লিশের দশকে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ পেয়েছিল। সুতরাং ওইদুটিকে ধরে সংখ্যাটি তের হচ্ছে। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হচ্ছে 'শতাব্দি' গ্রন্থটি। প্রকাশ থাকে সত নাথের 'জাগরী'র প্রকাশ সালও ১৯৪৫। তারাশঙ্কর লিখছেন ধাত্রীদেবতা এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'সরীসৃপ' এবং দুটোই কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাড়িত পৃথিবীর মৃত্তিকা জলও আকাল। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর 'চক্রবাক'উপন্যাসটি।'শতাব্দি' তিনি উৎসর্গ করছেন পন্ডিচেরীর, প্রাক্তন বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দকে। আর হিরোসিমা নাগাশাকি নগর দুটিতে এক ব্যাপক নরহত্যা ঘটিয়ে উপসংহারে শান্তি চুক্তিতে শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ঠিক পরের বছর ১৯৪৬ প্রকাশিত হচ্ছে'কুরপালা' এবং তারপর দুবছর তাঁর কোন গ্রন্থ প্রকাশ পাচ্ছে না। আবার ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হচ্ছে তিনটি গ্রন্থ। 'কাজল' উপন্যাস এবং অন্যদুটি গল্প সংগ্রহ। ঠিক সে সময় স্বাধীনতার পর প্রাকতেভাগা এবং তেলেঙ্গানার জনযুদ্ধ দুটি ঘটনা স্মরনে রাখা

জরুরী। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করছেন 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' আর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সতীনাথের এপিক এসময়েই বই হয়ে বের হচ্ছে। বেআইনি হচ্ছে কম্যুনিস্ট পার্টি। সমাজতন্ত্রী জহরলাল নেহেরু জেলে পুরছে মার্কসবাদীদের। তেলেঙ্গানায় নিজাম এবং রাজাকরদের সমর্থনে এর মধ্যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। কাকদ্বীপে বড় কমলাপুরে ফসলকাটা মাঠে লাঠি আর সড়কি হাতে রাত জাগছে তেভাগার কৃষক। রমেশচন্দ্র লিখছেন গৌরীগ্রাম এবং মালঙ্গীর কথা। প্রকাশ পাচ্ছে যথাক্রমে ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪তে। দুর্ঘটনায় মারা গেলেন সেবছরই কবি জীবনানন্দ দাশ। তার আগেই ঘটে গেছে যে চুক্তির স্বাধীনতা তার ফলশ্রুতি দুই বাংলার অঙ্গচ্ছেদ। এবং কলকাতায় নোয়াখালিতে দাংগার নামে বেপরোয়া নরহত্যার ইতিহাস ছুঁয়ে আছে আমাদের জননায়কদের দায়বন্ধ দেশপ্রেম। শেয়ালদা স্টেশন থেকে এপার বাংলায় উপছে পড়ছে দেশত্যাগী বাস্তুত্যাগী ছিন্নমূলদের অপ্রতিরোধ্য ঢেউ। মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষে হিম শীতল হৃদয়কে সেঁকে নিয়েছে কলকাতা মহানগরী এবং তার বাসিন্দা মানুষজনেরা। রমেশচন্দ্র লিখেছেন 'পুব থেকে পশ্চিম' উপন্যাস। সাদাঘোড়া প্রেত, হারানী এরকম কয়েকটি ছোট গল্প। গ্রন্থ হয়ে 'পুবথেকে পশ্চিম' বের হচ্ছে, ১৯৫৬ নাগাদ। ১৯৫৯ এবং ৬০ সালে প্রকাশিত হচ্ছে যথাক্রমে তাঁর আরো তিনটি উপন্যাস এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহটি। ১৯৬১তে প্রকাশিত হয়েছে 'পূর্বরাগ' উপন্যাসটি। প্রকাশ থাকে এটি তার প্রথমদিকের রচনা। কেননা ত্রিশের দশকের শেষে ১৯৩৯ সালের ১০ই জুন থেকে 'দেশ' পত্রিকায় এই লেখাটি 'টিকি বনাম প্রেম' শিরোনামে ধাবাবাহিক বেরুতে শুরু করেছিলো। দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় শুধু মাত্র নাম বদল ছাড়া এমন কিছু রচনাটির স্থানবদল ঘটেনি। ১৯৬২-র ১লা জুন প্রায় নীরবতার ভিতর তিনি মারা গেলেন। তারপর এক দীর্ঘ বিস্মৃতি। রমেশচন্দ্র ঢাকা পড়ে যান বাংলাসাহিত্যের পুঁজিবাদী ঘরানার ভিতর লালিত প্রগতিপন্থীদের হিম তাচ্ছিল্যে, অবজ্ঞায় নির্বোধ প্রজ্ঞাভিমানে।

অথচ এই সামান্য কয়েকটি গ্রন্থের ভিতরও অসম্ভব প্রতিভাও তাঁর রচনা কর্মের রীতি ও বিষয়গত অসামান্যতা। বাংলা গদ্যসাহিত্যে ঋজুভাষ এপিক ইজমের মূলস্থপতি যে রমেশচন্দ্র এ আমরা ভুলে যাই কি করে? বিষয়গত বিন্যাসে তার উপন্যাসগুলিকে যদি একনজরে দেখি তাহলেই স্পষ্ট হবে, একটি বিন্দুর উপর ক্লান্তিকর ক্রমপ্রত্যাবর্ত্তনে তাঁর ছিল ঘোর অনীহা। বিষয়কে বার বার ভেঙে তিনি নিজের অভিজ্ঞতাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন একেকটি রচনার ভিতর।

আর এই ক্রমাগত বিষয় ভাঙার ভিতরই তিনি ছুঁয়ে যাচ্ছেন চারপাশের মগ্ন চেতন্য ইতিহাসকে, সময়ের ক্রমধারায় জারিত মানব সমাজের উঠে আসা চরিত্রগুলিকে, চরিত্রগুলির সম্পর্ক সূত্র এবং সম্পর্ক বদলের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে এবং বিষয় ভাবনার সংগে ভারসাম্য রাখছে তাঁর নিজস্ব রচনারীতি; যা একই সংগে বুদ্ধিবাদী মরমী বুদ্ধি নির্ভর এবং আবেগে টানটান। ধ্রুপদী গাম্ভীর্য্যের সংগে আধুনিক গদ্যের সারল্য, মানবজীবনের গভীরতর সংকট এবং সংশয়ের সংগে, বহমান সাধারণ জীবনযাত্রার অসম্ভব হাদ্য সুরটিকে তিনি সাবলিলতায় অম্বিষ্ট করেছেন সারাজীবনের নিঃসঙ্গ ব্রতে, রচনা চর্চার উদ্দীপনে। বিষয়গত কাঠামোর বিন্যাসে তাঁর উপন্যাসগুলিকে এমনি ভাবেই আমরা সাজিয়ে নিতে পারি।

১. শতাব্দি। সামন্ততান্ত্রিক গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের কাহিনী। এখানে মাধ্যম, ব্যাক্তি বিশেষের শ্রেণী চরিত্র বদল। অর্থাৎ সামন্ত পূঁজির মুৎসুদ্দি পূঁজি হয়ে বৃহৎ শিল্পপূঁজিতে রূপান্তরের ঘটনা। এবং ধরা পড়ছে আমাদের মিশ্র অর্থনৈতিক অবস্থায় ত্রিশঙ্কু সাংস্কৃতিক চেতনাটির কথাও।

২. কুরপালা। একই মোটিফ, যা ব্যাক্তিকে ছাড়িয়ে ব্যাষ্টিতে প্রবেশ করছে। একটি গ্রাম ভেঙে পড়ছে নব্য ধনতান্ত্রিক গঠন প্রক্রিয়ার করাল গ্রাসে। কোন দুর্ঘটনা ব্যাতিরেকেই ছিন্নমূল হয়ে পড়ছে একশ্রেণীর মানুষ। শ্রেণী পরিবর্ত্তন ঘটে যাচ্ছে সমাজের সামাজিকতার এবং মানবিক সত্তারও।

৩. চক্রবাক। বিষয় ত্রিকোন প্রেম। এক পুরুষ এবং দুই নারী। মানব হৃদয়ের রহস্যময় নির্জনতার তীব্র সংরাগ।

৪. কাজল। কলকাতার পতিতাপল্লী। একটি সামাজিক গ্লানিময় রূঢ়তার ডকুমেন্টারি। আমাদের অর্থনৈতিক সামাজিকতার গ্লানি এবং ব্যাধির. মানবিক জগতের শাদাকালো বাস্তবতা।

৫. গৌরীগ্রাম। তেভাগার লড়াই। আলোড়িত গ্রামজীবন। একটি গ্রামীন মানুষের অর্থনীতির টানে ভেসে যাওয়ার ট্রাজিক কাহিনী।

৬. মালঙ্গীর কথা। সামন্ততন্ত্রের একটি উদারনৈতিক চরিত্র, অথচ যে উদারতা আংশিক সত্য হলেও সামগ্রিক একটি অর্ধসত্য তত্ত্বের ভিতর নিহিত তারই প্রমান জমিদার বৈদ্যনাথ এবং বিধবা চাষি বউ কুন্তির অসম কাহিনীতে।

এখানেও অংশত চলে আসে তেভাগার অভিজ্ঞতার উষ্ণতা।

৭. পূব থেকে পশ্চিম। পূর্ব বাংলা থেকে ছিন্নমূল মানুষদের ভেসে আসা এবং টিকে থাকার সংগ্রামের বাস্তব কাহিনী। (সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে, উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনার প্রথম উদাহরণ হিসেবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অর্জুন' উপন্যাসটিকে। অথচ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্যকার জীবনের শৈশবেই রমেশচন্দ্র সেনের উপন্যাসটিকে আমরা ভুলে যাচ্ছি। ভুলে যায় আমাদের স্থিতিশীল বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতেরাও। হয়ত বা রমেশচন্দ্র নিজে পুঁজিবাদী পত্রিকা গোষ্ঠীর আপনজন ছিলেন না, বলেই।)

৮. সাথিক। ভারতবর্ষের চাল্লশের দশক। আগস্ট আন্দোলন। এ রচনার বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অসহযোগিতার পরিবর্তে চরমপন্থী বিপ্লবী বিন্দুটি। মূলচরিত্রটির বৈজ্ঞানিক অভিযোজন, এই সামান্য উপন্যাসটিকেও একটি অন্য মাত্রা দেয় উপন্যাসের উপসংহারে।

৯. নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ। তীব্র আধুনিক এই উপন্যাসের বিষয়। এ্যালিয়েনেশন। পুঁজিবাদী মিশ্র অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় জারিত একটি মেয়েই এই উপন্যাসের মূল চরিত্র। আশা আকাঙ্খার অদ্ভুত দোটানায় তার জীবনের বিয়োগান্ত কাহিনী এই উপন্যাসের মূল থীম।

১০ অপরাজেয়। পুঁজিবাদ এবং তার প্রধান শত্রু শ্রমজীবি মানুষের জীবনের দৈন্য এবং অসহায়তার বাস্তব আলেখ্য, এ উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের মূল বিষয়।

১১. পূর্বরাগ। এই রচনাটির বিষয় মানবজীবনের অসঙ্গতিকে নিয়ে ঈষৎ সিরিওকমিক, বিদ্রূপতাড়িত। যদিও এটি প্রথমপর্বে লেখা, খুবই সাধারণ, তবু লেখকের সজীব বর্ণনা এবং অনুভূতির টানটান বিন্যাস নজর এড়ায় না।

উপরের তালিকাটি বিশদ ভাবে দেখলে টের পাই, বাংলা ভাষায় সামান্য রচনা কর্মের ভিতরও লেখকের বিষয় থেকে বিষয়ে চলে যাওয়ার অদ্ভুত সাবলিলতা। নিঃসন্দেহে সার্থক শিল্প সৃষ্টির শিরোপা সব উপন্যাসগুলির উপর আরোপ করা যাবে না। কিন্তু এগারোটির ভিতরও চার চারটি উপন্যাস গঠনে বিষয়ে অনন্য ধ্রুপদীধর্মী হয়ে ওঠায়,লেখক হিসেবে রমেশচন্দ্রের গোত্রান্তরিত অসাধারণত্ব আমাদের ভাবায়। যখন বহমান অধুনা বাংলাসাহিত্যের ত্রিকোন প্রেম বা এই

জাতীয় কোন একটি স্থির বিষয় নিয়েই একেকজন গদ্যকার শতখানেক গ্রন্থ বছর পনেরর দুর্বহ শ্রমে উগরে দিতে পারেন, তখন রমেশচন্দ্রের জীবন যাপনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার তাৎপর্যপূর্ণ দার্শনিক প্রতীতি বোধ আমাদের চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করে তোলে। সেই ভাবনাবোধ থেকেই আমরা রমেশচন্দ্রের প্রকৃত স্থানাংক নির্ণয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি। আর আমাদের এই অন্বেষণ, পূর্বসূরীর প্রতি আণুন্যতায় নয, বরং উত্তরসূরীদের কাছে আমাদের বাস্তব অবস্থান দায়বদ্ধ করে তোলে, রমেশচন্দ্রের প্রতি বিস্মরণ, আমাদের সংস্কৃতির শিকড়হীন দুর্বলতার এবং মধ্যবৃত্তিয় স্থানচ্যুতির কলঙ্কময় উদাহরণ।

১.৩: 'আপনার এই উপন্যাসটি একটি অভিনব রচনা। অভিনব এবং অতিশয় সহজ ও ধীর গভীর বলিয়াই সহসা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিতেও পারে।' 'শতাব্দি' পাঠের পর ব্যক্তিগত পত্রে কবি মোহিতলাল এরকম আলংকার কথা লেখক রমেশচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন। অবশ্য সমালোচক মোহিতলালের 'শতাব্দি' সম্পর্কে শেষ ও নিশ্চিত প্রতীতি ছিলো। "কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার লক্ষ্যভেদ হয়েছে।" একজন লেখকের চরিত্রে 'লক্ষ্যভেদ' শব্দটি কিরকম গভীর ব্যঞ্জনাময় এবং অববারিত সত্য হ'য়ে উঠতে পারে শতাব্দি'র আশিরনখ তার স্বাক্ষর মেলে। যদি আমরা গঠনগত বিন্যাসে সতীনাথের 'জাগরী' উপন্যাসটিকে ফরাসী কথাসাহিত্যের গাঢবদ্ধতা তথা মানসিক উত্থান পতনে চেতনাবাহী রচনার উদাহরণের সংগে তুলণীয় গণ্য করি তাহলে পাশাপাশি রমেশচন্দ্রের 'শতাব্দি'কে রাখলে বিশ্বসাহিত্যে রুশ গদ্যসাহিত্যের উপমা মনে পড়ে যায়। বহমান কালের প্রেক্ষাপটে বিশাল ক্যানভাসে অজস্র চরিত্রের আসাযাওয়া। প্রকৃতি এবং মানুষের বর্ণাঢ্য চিত্রনরীতি। যা একটি নিছক উপন্যাসের স্তর টপকে অনায়াসে একটি যুগের, একটি অকথিত অধ্যায়ের সমাজতাত্ত্বিক গূঢ় অভিনিবেশের ফসল হয়ে ওঠে, রচনাস্থিত সামগ্রিক তাৎক্ষনিকতাকে অতিক্রম করে যার আবেদন কালসীমার বৃত্তসীমা পেরিয়ে যায়। এক্ষেত্রে উপন্যাসের বর্ণময় ছবি, যেনবা মাইকেলএঞ্জেলোর চিত্ররীতির স্পষ্ট দ্যোতনাময় পুরুষকঠিন ডিটেলের সংগে সাদৃশ্যে তুলনীয় হয়ে ওঠে। একটি কঠিনবস্তুর ভিতর জেগে ওঠা শ্রমকাতর ভাস্কর্যের দার্ঢ্যতা রচনায় প্রোথিত হয়ে উঠে। 'শতাব্দি'র বিষয় নির্মানে, ভাষারীতিতে ধ্রুপদী বিস্তারে আমরা উপরি কথিত সত্যটিকে স্পর্শ করতে পারি।

'শতাব্দি'র মূল চরিত্র রাজেশ্বর মণ্ডল। উপন্যাস শুরু হয় যে সময়ে আমাদের

বলে দিতে হয় না সেটিকে, রাজনৈতিক স্তরের নবচেতনায় ১৯০৫ সালটি মূর্ত হয়ে ওঠে এ উপন্যাসে যদিও আসলে 'শতাব্দি'র শুরু হয় উপন্যাস শুরুর অনেক আগেই ঊনবিংশ শতাব্দির অন্তিম গোধূলিতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী ভাঙাচোরা সামাজিক বিক্রিয়াজারিত বাংলাদেশে। সামন্ততন্ত্রের প্রায় অবলুপ্ত অন্তর্গলী যাত্রায়। সমস্ত বাংলাদেশে সে সময় ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের আন্দোলনের পাশাপাশি ঘটে যাচ্ছিল এক নীরব সামাজিক বিপ্লব সমস্ত রাজ্য জুড়ে ঘটে যাচ্ছিল প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থায় একধরনের infeudation. এবং যার ফলশ্রুতিতে জাতপাতের সংকীর্ণ সীমা টপকে ভেঙে পড়ছিল সামাজিক প্রথাসিদ্ধ শ্রেণীসম্পর্কগুলি। জাতিব্যবস্থা এবং শ্রেণীব্যবস্থার গোপন আঁতাত নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ক্রমে ক্রমে সময়ের অবশ্যম্ভাবী কঠিনতম চাপে। অর্থাৎ যেমন নতুন রাজনৈতিক অভীপ্সায় প্রায়লুপ্ত সামন্ততন্ত্রের সব শেষ উত্তরাধিকারীরা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে আরেকটি নবায়িত শাসনসংস্কার স্বাধীনতাউত্তর গনতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলো ঠিক সেসময়ই বাংলাদেশেই অবধারিত জন্মাচ্ছিলো আরেক নতুন শ্রেণী অবশ্যই মিশ্র প্রক্রিয়ায়, যারা স্বাধীনতার উত্তরকালে ধণতান্ত্রিক উৎপাদন এবং মুনাফার চাবিটি নিজেদের দখলে আনার জন্য বদ্ধপরিকর। এবং এই নতুন শ্রেণীর প্রাকঅধ্যায় সূচিত হয়েছিল শতাব্দির নায়কদের হাতেই। এক শতাব্দির টানাপোড়েনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভারসাম্যহীনতার ছবিটি এই রকম ঃ

এক ঃ অগিমন্ডল। ঊনবিংশশতাব্দির ব্রাত্যজনদের শেষ চিত্র। অবশ্য প্রচলিত জাতপাতের দ্বন্দ্বে সে ব্রাত্য হলেও, নিজস্বশ্রেণী প্রাধান্যে সে অবশ্যই সেদিনের এলিট'। যে 'এলিটিজম' সম্পত্তি এবং ঐশ্বর্যের সংগে নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত। সে মাতব্বর অর্থাৎ গ্রামীন জনমানুষের জমিজমা সক্রান্ত, সামাজিক সম্পর্কযুক্ত বিবাদবিসংবাদের ফয়সালা সে করে দেয়।

দুই ঃ রাজেশ্বর। অগিমন্ডলের উত্তরাধিকার তার উপর বর্তেছে। যদিও সে তার জামাতা মাত্র। অর্থাৎ দলপতির অধিকারটি পৈত্রিক বংশানুক্রমিক স্বীকার করা হচ্ছে না যদিও, তবু দেখা যাচ্ছে এই অধিকার বোধটি কখনোই বিত্তের সংগে সূত্র রহিত হচ্ছে না। অগিমন্ডলের জমি কেন্দ্রিক আধিপত্য টপকে রাজেশ্বর তার প্রতিভাকে নিয়ে গেছে ব্যবসায়িক মুনাফার ধারায়। অর্থাৎ সামন্ত পুঁজি নিয়োজিত হচ্ছে প্রাথমিকপর্বে মুৎসুদ্দি পুঁজির সংগঠনে। লক্ষ্য করার বিষয়, অগিমন্ডলের কন্যার পাণিপ্রার্থনার উপযুক্ততার বিবেচনায় রাজেশ্বর কৃষিতে

গভীরে অনুধ্যান না দিয়ে, নৌকায় পয়সা নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে বিবাহ অর্থাৎ নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের প্রাথমিক উদ্যোগ বাণিজ্যিক প্রগতি। একজন মুৎসুদ্দির গ্রামীন বৃত্ত টকে চিনে নিতে উনবিংশ শতাব্দির প্রথমতম নগরী বাবু এবং পুঁজপতি শ্রেণীর দম্ভ উজ্জ্বল কলকাতাকে চোখে দেখা অবশ্য জরুরী। কলকাতা থেকে ফিরে রাজেশ্বর টের পাচ্ছে নিজস্বসংকীর্ণতম অস্তিত্বের এবং পুঁজির একাধিপত্যের উষ্ণতার সে পাড়ি জমায় কলকাতায়। উদ্দেশ্য পুঁজির পুনর্ব বহার মাধ্যম, প্রচলিত ধনতান্ত্রিক পুঁজির শাগরেদি। এবং শেষে রাজেশ্বরও সে দিনের ব্রিটিশ পুঁজির ঠিকাদারী করে, একটি কারখানার পত্তন করে একজন স্বাধীন শিল্পপতি হয়ে উঠেছে। ভেঙে পড়েছে ইতিমধ্যে গ্রাম্য মাতব্বরী অবস্থাটি এবং সংস্কারগুলিও। কলকাতা আসার প্রাক মুহূর্তে রাজেশ্বরের অভিজ্ঞতা পঞ্চায়েতি সালেশির জন্য আর কেউ তার কাছে না এসে, ফড়ে করালীর মারফৎ থানা পুলিশ আদালত মামলার দিকে চলে যায়। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নাট বল্টুগুলি থানা আদালত হয়ে ভেঙে দিচ্ছে গ্রামীন সামন্ততান্ত্রিক শাসনের রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়াটিকে। উপন্যাসের একটি এপিসোডে ঘটনাটি অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন রোগা গোপালের হাতে মার খাওয়ায় জনৈক বিচার প্রার্থীকে রাজেশ্বর সরাসরি জিজ্ঞাসা করে, ' কিন্তু একটা কথা, গোপালি রোগা মানুষ আর তুমি এতো বড় জোয়ান। সে একা তোমায় মারল কি করে?" লোকটির তড়িৎ উত্তর, "এই বুদ্ধি লইয়া তুমি মোড়লগিরি করবা? সে হৈল টাকাতিয়া মানুষ। কত তার পয়সা।" রমেশচন্দ্র বলেছেন -' লোকটা এক কথায় ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি রেখাচিত্র আঁকিয়া দিল।" অর্থাৎ শতাব্দি উপন্যাস জুড়েও ধরা পড়ে যাচ্ছে এই সামাজিক ব্যাপক ভাঙচুরের স্থির চিত্রটি।

তিন: এরপর পরবর্তী স্তর, অর্থাৎ চলে আসে রাজেশ্বরের চার ছেলে। এবং এখান থেকেই চরিত্রগুলি প্রতীকের মাত্রা পায়। মহেশ্বর বড় ছেলে, যেনবা পরবর্তী কালের ঈষৎ লিবারেল মধ্যবর্তী শ্রেণীর কথামুখ। মেজ তারকেশ্বর মুনাফালোভী প্রতারক শ্রেণীটির প্রতিভু। ছোট বীরেশ্বর নৈরাশ্য পীড়িত বিচ্ছিন্নতায় ভোগা মানুষের মুখবন্ধ। এব তৃতীয় নরেশ্বর যে বাবার কারখানার মালিক হতে গিয়েও স্ববিরোধিতার সামনে বৃত্তে বাঁধা পড়ে না। তাঁর দর্শন ভাবনা জারিত হয় বলশেভিকইজমের রসায়নে, শ্রেণীচ্যুতিতে। এবং শিকড়হীন ধনতন্ত্রের চরম বন্ধ্যাত্বের প্রতিভু রাজশ্বরের চরিত্রের বৃত্তসীমাকে ভেঙে নরেশ্বরেই

উপন্যাসের শেষে সমর্থক হয়ে ওঠে। আসলে এই সামাজিক প্রক্রিয়াটির অবধারিত ফলশ্রুতি নরেশ্বর অর্থাৎ সাম্যবাদী বিপ্লব। অমলা চরিত্রটিও এবারে আর নিছক রক্ত মাংসে আশ্লিষ্ট না হয়ে থেকে 'আইডিয়া' 'হয়ে উঠে। তারকেশ্বর ছাড়া তিন ভায়ের জীবনেই সে আসে, আশার, ভালবাসা আকাঙ্খা কামনার পথ পার হয়ে শেষ অবধি প্রেরণার সূর্যকর দীপ্তিতে। অর্থাৎ উপন্যাসের নিছক আবেগময় গল্প কাঠামোকে বাদ দিয়ে 'শতাব্দি' হয়ে উঠে মানবিক শ্রেণী অবস্থানের সিসমো গ্রাফ। কাল এবং স্থান এখানে ভিন্ন মাত্রা পাচ্ছে। সামাজিক বিক্রিয়ার ঐতিহাসিক শর্তগুলির বৈজ্ঞানিক ভাবনায় জারিত হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের চক্ষুদ্বয়ের দ্বান্দ্বিকতা আমরা বুঝে উঠি গভীরতর অর্থ সংকেতে। ঔপন্যাসিক তাঁর গল্পের সীমাবদ্ধতা টপকে হয়ে ওঠেন স্থির লক্ষ্য ভেদে অভ্রান্ত অর্জুন। তাঁর দায়বদ্ধতা গল্প বলিয়ের মামুলি রহস্যে ঢাকা পড়ে থাকে তা। উপন্যাসের গুণগত ব্যাখ্যায় এসময় চলে আসে 'উচ্চতা' শব্দটি। প্রচলিত আখ্যানের তরলগামীতায় এং শব্দটি বেমানান। কিন্তু রীতি ও কাহিনীর সামগ্রিক গাম্ভীর্যে শতাব্দি ওয়ে ওঠে উপন্যাসের উচ্চতার পরিমাপক।

১.৩ঃ শতাব্দির ঠিক পরেব উপন্যাস 'কুরপালা'। অথচ 'কুরপালা' এবং গৌরীগ্রামে'র মাঝে তাঁর আরো একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। যদিও রমেশচন্দ্র কোন ট্রিলজির ভাবনায় এই তিনটি উপন্যাসকে বেঁধেছিলেন কিনা, এমন কোন বাস্তব প্রমান এ পর্যন্ত আমাদের হাতে আসেনি তবুও তিনটি উপন্যাসের ভিতর একটি যোগসূত্র থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ সময় নামক অদৃশ্য শক্তির প্রবল উপস্থিতি টের পাই এদুটি উপন্যাসেও। বিদেশে বোধ হয় বালজাকই, এরকম ভাবে একটি প্রায় অবলুপ্ত শ্রেণীর বিয়োগান্ত দৃশ্যকে চাক্ষুষ করেছিলেন, এবং টের পেয়েছিলেন উদীয়মান ভন্ড শ্রেণীটির প্রচন্ড জেগে ওঠা। কুরপালায় ব্যাক্তির ভাঙন ব্যাষ্টিতে এসে ওতপ্রোত মিশে গেছে। এখানে আর কোন একজন বিচ্ছিন্নের সারাংশ নয়, বরং একটি গ্রামের অবস্থান বদলানোর ঐতিহাসিকতা প্রাণ পেয়েছে একনিষ্ঠ চরিত্র চিত্রনে। ধ্বংসোন্মুখ জমিদারতন্ত্র এবং উদীয়মান পুঁজিপতির নির্মম দ্বন্দ্ব ও আপোষ এতো স্পষ্ট সমকালীন বাংলা গদ্যে খুঁজে পাই না। চাষি জোলার গ্রাম কুরপালার সামগ্রিক চরিত্রই বদলে যাচ্ছে হাত বদলের ক্রমাগত খেলায়। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র যখন খাজনার চুক্তিতে কৃষকের জমির মালিকানার আংশিক সত্যকে স্বীকার করে নেয় তখনই উদীয়মান পুঁজির নির্লজ্জ বিকাশ মুনাফার অশ্লীল তাগিদে সেই কৃষককে

জমিচ্যুত উদ্বাস্তু করে। পুঁজিবাদের চাকা যদিও ন্যস্ত থাকে মজুরীর ভিত্তিতে শ্রমজীবি মানুষের কাঁধের উপর। অর্থাৎ সামান্য সময়েই বদলে যায় আপেক্ষিক পরিভাষাগুলিও। খাজনার স্থান নেয় মুনাফা। কৃষকের উদ্বৃত্ত ফসলের অংশ হয়ে ওঠে মজুরীর মুষ্টি ভিক্ষা। খাজনাব স্থিরবৃত্তটিও ভেঙে পড়ে মুনাফার ক্রমাগত চাহিদায়। শ্রেণী সমাজগুলিও ভেঙে যায় ক্রমাগত। নতুন শ্রেণীর উদ্ভাস ঘটে বঙ্কিম কুণ্ডুর ভিতর। অর্থাৎ সেই বৈশ্য প্রগতি। যে জমিদারী বিনে যায় ক্রমাগত, অথচ ভূস্বামীর প্রচলিত আলখাল্লায় আসক্তি রহিত। ক্ষীয়মান জমিদার শ্রেণীর লোকজন অস্তিত্ব বাঁচাতে তৎপর হয়ে ওঠে পুঁজির ছত্রছায়ায়। যেমন এই উপন্যাসের শেষে · "বীরেন হাজিরাবাবুর কাজ পাইয়াছে। স্থানীয় মজুরেরা কেহ কেহ তাদের পুরানো জমিদারের ছেলেকে দেখিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করে।" ১৯০৫ স্বদেশী আন্দোলন প্রসংগে রমেশচন্দ্র কুবপালায় জানান, "...বিলাতি বয়কট। সংগে সংগে জোলাদেব অবস্থা ফিরিল, অনেকেই টিনের ঘর তুলিল।" ভাবি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে গণআন্দোলনের ব্যর্থতা এবং পুঁজির চিন্তার কি অদ্ভুত স্বার্থক হয়ে ওঠে এই লেখকের দৃষ্টিতে। ঔপনিবেশিক পুঁজির বিরুদ্ধে বিলাতি বযকট আন্দোলন। ফলশ্রুতি টিনের চাল। অর্থাৎ আন্দোলনের শেষেও ঐতিহাসিক অবধারিত স্তরটি এসে যাচ্ছে। দ্বান্দ্বিক সূত্রে। হিরণকুমার সান্যাল যদিও কুরপালার সামগ্রিব বিস্তারকে আয়ত্তে নিতে পারেননি, তবুও সমালোচনায় এই ঐতিহাসিক সত্যটি তার নজরে এসেছিল। ফলে কালচেতনার অস্পষ্টতা হেতু তাবাশঙ্করের পিছনে হাঁটা দর্শনের সংগে রমেশচন্দ্রের বাস্তব অনুরাগকে তিনি সমালোচনায় চিহ্নিত করেছিলেন স্পষ্টভাবে।

এই কুরপালায় পরবর্ত্তী স্তর গৌরীগ্রাম এবং আংশিক মালঙ্গীর কথা। একজন রাজেশ্বরের শ্রেণীচ্যুতি, কিম্বা একটি গ্রামের সামাজিক বিবর্ত্তন, আমাদের পরবর্ত্তী সমস্যার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে বৃহৎ কৃষক শ্রেণী ভূমিদাসে রূপান্তরিত, দেশের শাসক পরিবর্ত্তনে এবং শাসন ব্যবস্থার আংশিক পরিশুদ্ধিতেও তাদের বৃত্তান্ত বদলে যায় না। ফলে জমির উপর আদিম মালিকানার প্ররোচনার আকাঙ্ক্ষায় আমাদের দেশে সেই ক্রান্তি লগ্নে তেভাগা তেলেঙ্গানার ইতিহাস আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এই উপন্যাসকে কৃষি বিপ্লবের তকমা এঁটে দেওয়া নির্বোধের অন্ধত্বকেই চিহ্নিত করে, তবু নিঃসন্দেহে এই উপন্যাস দুটিতে আমূল ভূমিসংস্কার কেন্দ্রিক ভাবনা ভেবে দেখার মত। গোকুল নামে একজন নিছকই আপাদমস্তক গ্রাম্যজন এ

উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দু। জীবিকার একমাত্র অবলম্বন নৌকাটি সরকারি বদান্যতায বাজেয়াপ্ত হযে গেলে দুইটি সন্তানের এবং স্ত্রীর জন্য তাঁকে শহরে পাড়ি জমাতে হয়। অথচ এমনই একটি নামহীন গোত্রহীন পরিবারের ছিন্নমূল হয়ে পড়ার কাহিনীমালায় এ উপন্যাসের বিষয় সরলীকৃত হয়ে যায় না। বরং আমরা টের পাই এমনই অজস্র ছিন্নমূল অসহায় পরিবারই চিরকালীন গৌরীগ্রাম সমূহের অমোঘ গ্রামবীজ। সমকালীন রাজনীতি, মানুষের সৃষ্টি দুর্ভিক্ষ, ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুদূর প্রসারী করালগ্রাস, রেশনিং সিস্টেমের অনুপ্রবেশ, চাল কাপড় কেরোসিনের সহজবোধ্য দুরূহ দুষ্প্রাপ্যতা সব মিলিয়ে এই উপন্যাসের গতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছে একটি সদর্থক ধারার দিকে। বামপন্থী সাম্যবাদী রাজনীতির দুর্নিবার ডাকে এক হয়ে গেছে গ্রাম জীবনের নামহীন মানুষেরা। অথচ গ্রামীন রক্তচোষা মহাজন হারানের অস্তিত্ব বিপন্ন হ'লে থানা সজাগ হয়ে ওঠে। বেসামাল বাস্তবতাকে স্থির করতে দারোগা আসে। পিছনে সশস্ত্র পুলিশ। ভাডাটে খুনীর লাঠিতে ছিন্নমূল মানুষ গোকুলের মাথা ফাটে। মৃত্যু হয়। পুলিশের গুলিতেও মরে যান এবং জানের দাবিদার আরো কয়েকজন মানুষ। নতুন যুগের মানুষ, গোকুলের ছেলে মানিক তার হাতেই ভবিষ্য সুতরাং গৌরীর মাঠের জনকলরব মানুষের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে বেড়ে ওঠে। ছড়িয়ে পড়ে। এমনই এক গভীর সংকেতে উপন্যাস শেষ হয়। যেনবা চৈতন্যের আশাবাদ। অর্থাৎ রমেশচন্দ্র পরপর তিনটি উপন্যাসেই চিহ্নিত করলেন ক্রান্তি লগ্ন সময় মানুষ এবং মৃত্তিকার ধ্বস্ত টানাপোড়েন। ভেঙে পড়া ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণী, উন্নয়নশীল মুনাফালোভী বৈশ্য সভ্যতা এবং ধনতন্ত্রের গ্রাস হ'তে মুক্তিকামী যুক্তি জাগর মানবিক সংহতি এই ত্রিধারায় যুক্ত হোল তাঁর ঔপন্যাসিক মনীষা। তাঁর সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে 'কালসচেতন' শব্দটিই সুপ্রযুক্ত। আর বিশদ ভাষ্যে মানবিকতায় দায়বদ্ধ কালসচেতন লেখকসত্তা বলতেই যে ছবি আমাদের চোখে ভাসে, তার সংগে রমেশচন্দ্রের প্রতিকৃতি অসাধারণ মিলেমিশে যায়।

১.৪ : পেশায় তিনি ছিলেন কবিরাজ। সেই চিকিৎসক পেশার সূত্রে তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা জমে উঠেছিলো কলকাতার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত পতিতাদের সম্পর্কে। গভীর নৈরাশ্য থেকে অবিরাম উত্তেজনার তাগিদে পিপাসার্ত কাকের মতন তাদের অদম্য তৃষ্ণার বৃত্তান্ত রমেশচন্দ্রের কাজল উপন্যাসের উপজীব্য। এক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে এই সামাজিক ব্যাধিরূপ

সমস্যাটির আরোপের ধারাবাহিকতা কিছু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। শরৎচন্দ্রের আগে এই সমস্যাটি সরাসরি সাহিত্যে জ্বলন্ত সমস্যার রূপ নিয়ে আসেনি। অবশ্য এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে শরৎচন্দ্র সমস্যাটিকে নিয়ে ব্যাপক নাড়াচাড়া করলেও খুব একটা গভীরে যেতে চাননি, যদিও এ সম্পর্কে তাঁর স্বঅর্জিত অভিজ্ঞতার স্তর ছিল বিশদ। ফলে তার চরিত্রগুলি রক্তমাংসে আশ্লিষ্ট না হয়ে প্রধানত আইডিয়া সর্বস্ব, ভাববাদী এবং মূলত ক্লেদ গ্লানি বর্জিত বাস্তবতা রহিত। জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' উপন্যাসেও প্রচলিত সম্পর্ককে ভিত্তি করে প্রথাসিদ্ধ 'মিথের' বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠতা দেখি, তাতেও বাস্তব ডকুমেণ্টশন, তার চাইতে গুরুত্ব পায় মানসিকতার প্রতিবিম্বিত চেতনাবাহী ধারাস্রোত। আর পরবর্ত্তী কালের গদ্যকারেরা বিষয়টিকে ব্যবসায় রূপান্তরিত করে বাস্তবতার নামে অভীষ্ট করেছেন ক্লেদ এবং মর্বিডিটিকে, যা তথাকথিত 'ন্যাচারালিজম'কেও লজ্জা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই এদের রচনারীতি সফ্ট পর্নোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। রমেশচন্দ্র কিন্তু এক্ষেত্রে অদ্ভুত ভারসাম্য রেখেছেন পতনশীল এই সমস্যাটিকে নিয়ে দীর্ঘ উপন্যাসে কোন সামাজিক প্রক্রিয়ায় এই শ্রেণীটির বৃহৎ অংশ উদ্ভূত হচ্ছে যেমন তার ব্যাখ্যা আছে। ঠিক সেরূপই অজস্র চরিত্রের ভীড়ে মানবিক সম্পর্কের সুস্থতার কথা ভুলেও তিনি বিস্মৃত হন নি। ফীচার ধর্মী সহজ মনোরঞ্জনের রচনারীতি এক্ষেত্রেও তাঁর অভীষ্ট নয়। বরং কাজলের আগাগোড়া তিনি বেঁধেছেন ধ্রুপদী বিস্তারে! এবং সুনীতির মুখোশ আবৃত সামাজিক মুখগুলির কদর্যতার কথা তীব্র বিদ্রূপে তিনি এ উপন্যাসে যেভাবে নগ্ন করেছেন, তা একথায় তুলনারহিত। আবার শেষ অবধি এ উপন্যাস নৈরাশ্যের একবুক উদ্ধারহীন, অন্ধকারে তলিয়ে যায় না। পাপের পঙ্ক সমুদ্রে ক্লেদজ কুসুমের দার্ঢ্য অভিমানের যে তীব্র আর্তনাদ আমাদের মাংসল পৃথিবীকে অস্থির করে তোলে, কাজল সে অঙ্গীকারের গোত্রজ। এবং এই একটি উপন্যাসের জন্যই রমেশচন্দ্র চিরকালীন হয়ে থাকতে পারেন। অবলীলায় আমরা তাঁকে তুলনা করতে পারি আলেকসান্দার কুপ্রিন, ম্যাক্সিম গোর্কি'র মানবিক আর্তির সংগে, এমিল জোলার, লাউ চাও-এর প্রখর বাস্তবচেতনতার নিরিখে। 'ইয়ামা দ্য পিট', 'লোয়ার ডেপথ', 'নানা' ইত্যাদির পাশাপাশি বাংলাসাহিত্যের একটি বইকে রাখতে হলেও কাজলের দাবি সবচাইতে প্রাধান্য পাবে এমন বিশ্বাস আদৌ ভ্রান্তিকে সমর্থন করে না।

১.৫ : বিষয় এবং রচনারীতিকে প্রতিবার তিনি অতিক্রম করে যাচ্ছেন।

যদিও তাঁর ভিতর আমরা স্ববিরোধীতার আভাসও পাই অনেক সময়। কাল-সচেতনতা এতো তীব্র হওয়া সত্বেও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর ভক্তি প্রায় 'অবশে-সনের' পর্যায়ে এমনই যে তাঁর প্রথমতম গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করতে হয়। বিষয় নির্মানে তিনি সিদ্ধহস্ত, অথচ মাঝে মাঝেই আরোপিত সত্য তাঁর রচনাকে দুর্বল করে তোলে। যেমন 'পূব থেকে পশ্চিম' উপন্যাসের রূঢ় বাস্তবতার উপসংহার ঘটে নায়ক নায়িকার বহু পরিচিত নাটুকে মিলন দৃশ্যের ক্লিশেতে। আবার যেসব উপন্যাসে মানবিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা ঘটনা ব্যতিরেক চেতনা প্রবাহে অনি-বার্য ছিলো, সেখানে তিনি অতিসরল হয়ে পড়েন। এমন কি কুরপালার ঐতি-হাসিক পরিণতি গঠন অভাবে আরোপিত বোধ হয়।

তবু রমেশচন্দ্রের উপন্যাস আমাদের এক অন্য পৃথিবীতে নিয়ে যায়। আমাদের স্বল্প অভিজ্ঞতার স্তরকে দেশও মানুষের মৃত্তিকা প্রকৃতির স্বাদে ঘ্রাণে ব্যাখ্যার এক আশ্চর্য্য ব্যাপ্তিতে পেঁছে দ্যায়। আমরা উপন্যাস পাঠকে বিনোদন-স্তরে আটকে রাখতে পারি না। মহাকাব্যের ব্যঞ্জনা আমাদেব চিন্তার সূত্র-গুলিকে প্রখর করে তোলে। দেশকালঅজ্ঞ অর্ধমনস্কদের জন্য তাঁর সাহিত্যকৃতি কোন মাত্রাই আনে না। মানুষ সম্পর্কে আশাবাদী পাঠকেরাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেন। আসলে শুধু মাত্র পাঠকদের পরিতৃপ্তিতে সার্মাগ্রক শেষ না হয়ে তাব রচনাকর্ম একজন লেখকের কাছেও গ্রহণযোগ্য শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যখন আমরা তাঁকে 'লেখকদের লেখক' এমন ভাবনা না ভাবলেও, একজন 'সম্পূর্ণ লেখক' হিসেবে ভেবে নিতে পারি। কেননা দায়বদ্ধতার প্রশ্নে তিনি আপোস করেন নি। না জীবনে অথবা লেখকসত্তায়।

দুই

২.১: গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, রমেশচন্দ্রের মুখ্য উপন্যাস চতুষ্কের একটি ঈষৎ বিশ্লেষণ ধর্মী রূপরেখা উপরে রাখা হোল। মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল এই বিস্মৃত লেখকের অগ্রন্থিত রচনাগুলি পত্রিকার বিবর্ণ পাতার ভিতর ধূসর হয়ে আসছিলো। প্রায় শতাধিক গল্প এবং দুটি উপন্যাস। এই অগ্রন্থিত গ্রন্থটির প্রকাশ না ঘটলে, হয়ত একজন লেখকের বিশেষ কিছু রচনার অস্তিত্ব অন্ধকারে লীন হয়ে থাকতো। রমেশচন্দ্র সেনকে পুণর্বার বিস্মৃতির তমসা থেকে তুলে আনা, একটি প্রত্নতাত্বিক খননকার্যের মতন দুরূহ ও শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া।

এখন, ভাবা দরকার এই অগ্রন্থিত রচনা সংগ্রহের প্রকাশ কি অর্থে একজন লেখককে সম্পর্কতা দিচ্ছে। যখন আমরা টের পাই, ইতিমধ্যে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছোট গল্প কয়েকটি এবং চারটি উপন্যাসের পাশাপাশি উচ্চারণ যোগ্যতা, আমরা অগ্রন্থিত রচনাগুলিতে দেখি না।

তবু এই রচনাগুলিকে প্রয়োজনীয় বোধ হয়। জীবিতকালে লেখক হিসাবে রমেশচন্দ্র খুব একটা চটজলদি বিজ্ঞাপিত না হলেও তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ সম্ভবপর হয়েছিলো। এমনকি এমন তথ্যও জানা যাচ্ছে তার আগ্রহী প্রকাশকেরা সেযুগেও সংস্করণপিছু তাঁর বইয়ের সংখ্যা বাইশশোর কাছাকাছি রাখতো। অর্থাৎ কলেজ স্ট্রীটের যোগাযোগ সূত্রে রমেশচন্দ্র আরো কয়েকটি গ্রন্থের জনক হ'তে পারতেন। অথচ ভাবি, তিনি নিজস্ব দুর্বলতার বিষয়ে কি তীব্র সচেতন ছিলেন। ফলে নিছক ভারবহনের কলঙ্ক, মুনাফার সূত্র তাঁর কাঙ্খিত হয়নি।

অগ্রন্থিত রচনাসংগ্রহের অধিকাংশই তাঁর প্রাথমিক লেখাপত্র। মৃত্যুর পর যদিও কিছু লেখা ইতস্তত প্রকাশ পেয়েছিলো, তথাপি সেসব ছোটগল্পে 'তারা-তিনজন', 'প্রেত', 'ডোমের চিতা' স্রষ্টার উপস্থিতি টের পাওয়া গেলেও উষ্ণতা কিছুটা হিমায়িত। অর্থাৎ তাঁর সামগ্রিক লেখন চর্চার সাফল্য এবং ব্যর্থতার বীজ পাশাপাশি সুপ্ত ছিলো। যা তিনি সচেতন প্রজ্ঞায় বুঝতেন। ফলে এই-সব লেখাপত্র তাঁর জীবদ্দশায় আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত থেকেছিলো। অথচ রমেশ চন্দ্রকে সঠিক এবং যথার্থ অর্থে অনুশীলন করতে হ'লে এইসব লেখাপত্রের গ্রন্থনাও আবশ্যিক হয়ে ওঠে। যেমন মানিকবন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যভঙ্গির অনুশীলনে সাহায্য করে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ, দিন-লিপি। সতীনাথের অযত্ন গদ্যানুশীলন আমরা বুঝে উঠি, তার ডায়েরীর পৃষ্ঠাগুলিতে উদ্যান এবং বৃক্ষ পরিচর্চা সম্পর্কিত টুকরো লেখালেখিতে। একজন লেখকের মানসিক স্থানাংক নির্ণয়ে এমনই সব অজস্র অনুসঙ্গ, ভাবনার সহায়ক হয়ে উঠে। দুঃখের কথা, কোনদিনলিপি, কিম্বা নিকট জন বন্ধুদের কাছে এমন কিছু চিঠিপত্র পাওয়া রমেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে দুষ্কর যে, তা দিয়ে তাঁর সৃজনশীলতাকে বুঝে নেওয়া যায়। ব্যাখ্যা করা যায়। বাধ্যত এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে তাঁর অগ্রন্থিত রচনাসংগ্রহই।

২. ২ ঃ যতদূর সম্ভব, দেশ পত্রিকায় 'দীপক' উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশিত

হয়েছিলো চল্লিশের দশকের কোন সময়। একটু গভীর ভাবে দেখলে দেখা যায় 'চক্রবাক' উপন্যাসটির বীজ, নিঃশব্দে দীপকে কাজ করে গেছে। 'চক্রবাকের' মূল উপপাদ্য ত্রিভুজ প্রেম। দুই নারীর একটি বিশেষ পুরুষের প্রতি (যে আবার তাদের আত্মীয় সূত্রে ঘনিষ্ট কেউ নয়।) গূঢ় আকর্ষনের মানবিক সংরাগ। দীপকে বিষয়ে বিপ্রতীপে গেছে দুই পুরুষের মাঝে একটি নারীর ভূমিকায়। এখানে সমস্যাটি আরো জটিল, কেননা এই নারীটি আবার একজন পুরুষেরই সামাজিকসূত্রে স্ত্রী। এহেন মানবিক সমস্যা যেখানে প্রায়শই উপন্যাসে বিকৃত রূপ নেয়। রমেশচন্দ্র গভীর অনুশীলনে সমস্যাটিকে হার্দিক মানবসত্তার গভীরে প্রোথিত করতে পেরেছেন। অর্থাৎ হৃদয় ঘটিত কারবারে রমেশচন্দ্র নৈয়ায়িক দর্শন গ্রাহ্য করছেন না, তাঁর মানবিক দায়বদ্ধতার সূত্রে। উপন্যাসটির গঠনে রয়ে যায় একটি মৃদু সাংগীতিক অনুপ্রেরণা। এবং এখানে উপস্থিত তাঁর কয়েকটি পরিচিত মানুষের চারিত্রিক 'টাইপেজ'।

২. ৩ঃ এছাড়া গ্রন্থনায় স্থান করে নিচ্ছে অগ্রন্থিত শতাধিক গল্পের কিছু কিছু। লক্ষ্য করার বিষয় বাজার চালু সাময়িক পত্রিকায় এর বেশীর ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোনটি আবার শারদীয় সংখ্যাতেও। অথচ এখানেও লেখকসত্তার রমেশচন্দ্রের নির্মোহ লক্ষ্যণীয়।

বিশেষ তাৎপর্যময় দিক এটা যে রমেশচন্দ্র তার এইসব গল্পভাগেও সাধারণ শ্রেণীর দিক থেকে সরে আসেন নি। উদ্বাস্তু মানুষ, দারিদ্র্য পিষ্ট মুচি, জেলখানার কয়েদি, শহরে কৃষকসন্তান, অন্ধ স্ত্রী, বংশমর্যাদায় আস্থাশীল নিঃস্ব মধ্যবিত্ত, এরকম অসংখ্য চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এইসব গল্পে ত্যাগে স্বার্থ-পরতায়, জীবন প্রেমে নৈরাশ্যে বঞ্চনায় ক্ষোভে। মানবিক সত্তা এবং সমর্থনকে কোনসূত্রেই রমেশচন্দ্র অস্বীকার করতে রাজী নন।

২. ৪ঃ রমেশচন্দ্রের হাতে গড়া সংগঠন সাহিত্য সেবকসমিতি। বাংলা-সাহিত্যের বেনজির ঘটনা এই সংস্থাটির দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্ব এবং পোলেমিক চরিত্র। সংস্থার পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রমেশচন্দ্র রচনা করেছিলেন সংস্থার ইতিহাস রচনার সূত্রে নিজের সাহিত্য জীবনের অসাধারণ উজ্জ্বল আলেখ্যটি। যেটি নিঃসন্দেহে আজকের বাংলাসাহিত্যের একটি বিস্মৃত গোপন ইতিহাস। লক্ষ্য করার বিষয় রচনাটির ভিতর দীপ্য হয়ে উঠেছে রমেশচন্দ্রের সরস বৈঠকী মেজাজ ঔদার্য্য, সমিতির প্রতি গভীর মমত্ববোধসহ সৃষ্টির অসাধারণ স্বচ্ছতা।

গোষ্ঠী তান্ত্রিক বৃত্তায়নের সংকীর্ণতার যুগে যার খোঁজ পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

তিন

৩. ১ঃ রমেশচন্দ্রসেন বাংলাসাহিত্যে ব্রাত্যদের একজন। তাঁর উপন্যাস এবং গল্পগুচ্ছগুলির কোন কোনটি দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে। তবু তাকে আমরা ভুলে গেছি। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ প্রায়শই অকৃতজ্ঞ। তারা বিজ্ঞাপিত পণ্য সামগ্রিকে মূল্যবানভাবে। কিন্তু মুনাফা কেন্দ্রিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির যে বাজার তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়ানো প্রগতিবাদীরাও কি যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় রাখতে পেরেছেন? ইতস্তত দুটি একটি পুনর্মুদ্রন ছাড়া তাদের স্মৃতিতে রমেশচন্দ্র একবারও ধরা পড়েননি।

৩. ২ঃ জীবনের সংগে প্রগাঢ় সংযোগ, অকৃত্রিম দরদী আবেগ, মানুষের প্রতি সন্নিষ্ট মমত্ববোধ এবং ভিন্নমুখি মর্যাদায় দৃঢ় লেখকসত্তা সবমিলিয়ে তাঁকে যে বড় বেশী অভারতীয় মনে হয়। অভারতীয় কেননা দুইশত বছরের উপনিবেশিক দাসত্বের স্মৃতিভারলাঞ্ছিত ভারতীয় লেখকদের বৃহৎ অংশের কাছে এই ধরনেরঋজুতা সম্পন্ন চরিত্র বোধ আমরা দেখতে পাইনি। দাসত্বের বহুমূল্য শিরোপা যখন তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী কালের অধিকাংশ সাহিত্যিককে অদ্ভুত ভারসাম্যে বিখ্যাত করে তুলেছে তখন স্বাধীনচিত্ত রমেশচন্দ্র যে অখ্যাত অপরিচিত হয়ে পড়বেন এবং ধূলিধুসরিত হতে হতে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাবেন, এমন অবস্থার কোন সংশয় থাকে না। এই ধ্বস্ত অবস্থাকে চিহ্নিত করে সাহিত্য ইতিহাস লেখকদের দায়হীন অসতর্ক গবেষণামূলক ক্রিয়াকর্ম গুলিও। সুকুমার সেন, ভূদেব চৌধুরী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বামপন্থী সরোজমোহন মিত্র অবধি সাহিত্য সমালোচকদের বৃহৎ আলোচনা গ্রন্থগুলিতে একধরনের অনুদার দর্শিতার কারণে রমেশচন্দ্র অনুল্লেখিত থেকে যান। হয়ত এই বাস্তবতা স্বাভাবিক, কিন্তু অপরাধ যোগ্য। অপরাধ যোগ্য এবং ক্ষমাহীন অক্ষমতার নামান্তর।

৩, ৩ পদার্থ বিজ্ঞানে অনুনাদী কম্পনাংক বা রেসোনান্স ফ্রিকোয়েন্সি বলে একটা ব্যাপার আছে। দু হাজার মদমত্ত মাতঙ্গ কিংবা বশংবদ খচ্চরের

এলোমেলো পদপাতে একটা সেতু অবিকৃত থেকে যায়। কিন্তু মাত্র কুড়ি জন মানুষের একসংগে সংহত তৎপর ফৌজি কুচকাওয়াজ, (যার যান্ত্রিক শক্তি খুব সামান্য হলেও সেতুটির অনুনাদী কম্পাঙ্কের সমান।) যা সেতুটির অগোচরে এক বিশিষ্ট দোলন সৃষ্টি করে। পুনরুৎপাদিত ফীডব্যাক কাপলিং এর ফলে ক্রমশ বহুগুন বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় অঙ্কের নিয়মে এক ভয়ংকর জায়গায় পেঁাছায়। যখন ভেঙে পড়ে সমগ্র সেতুটির কংক্রিট অস্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক সেতুটিও আজ অবধি টিকে আছে মদমওসমালোচকদের দৃষ্টিহীনতা এবং স্তাবক কলমচিদের ব্যক্তিত্ব রহিত চলাফেরার নিঃসংশয়ে। অথচ একদিন একসময় আমরা কুড়িজন মানুষ, মাত্র কুড়িজন এই সেতুটিকে অবলীলায় তুচ্ছ গুড়িয়ে দিতে পারি ৩ৎপর পদধ্বনীজানিত ফীডব্যাক কাপলিং এর ক্রমাগত বেড়ে ওঠায়। রমেশচন্দ্র এই ধ্বংস প্রক্রিয়ায় আমাদের হাতে এক অমোঘ অস্ত্র। সুতরাং রমেশচন্দ্র কোন ভাবেই সাহিত্যের উপসংহার নয়। বরং একটি যুদ্ধ শুরুর সংকেত যে যুদ্ধে রমেশচন্দ্রের রচনাবলী অনায়াসে আমাদের হাতে যুদ্ধাস্ত্র হয়ে ওঠে।

মানবেন্দু রায়
জানুয়ারী ১৯৮৮

দীপক

বিবাহের মাস দেড়েক পরের কথা।

স্ত্রীকে লইয়া পল্লব শ্যামবাজার অঞ্চলের একটা সিনেমায় গিয়াছিল। ইণ্টারভ্যালে লাউঞ্জে বসিয়া চা খাইতে খাইতে স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা হইতেছিল গ্রেটা গার্বোর অভিনয়ের। কী গম্ভীর প্রাণস্পর্শী তার অভিনয়-নৈপুণ্য। মনের গভীরতম সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ করিতে কোন আয়াসই তাঁকে করিতে হয় না। সেই সব কথা যেন আপনা আপনি ভাসিয়া উঠে তাঁর রহস্যময় চোখ দু'টিতে।

আলোচনায় বাধা পড়িল, বেয়ারা দু'টা ডিসে ছুরি কাঁটা সমেত কাট্‌লেট লইয়া আসিল। উত্তরা এখনও ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করে নাই, সে জানে না কোন হাত দিয়া ছুরি কোন হাত দিয়া বা কাঁটা ধরিতে হয়, তবে সে শুনিয়াছিল তাহারও একটা নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে লোকে হাসে। বেচারী তাই বিপদে পড়িয়া গেল।

পল্লব এক টুকরা কাট্‌লেট মুখে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কেটে দেব?'

উত্তরা কোন উত্তর করিল না।

ঠিক এই সময় পিছন হইতে একটা যুবক ছুরি ও কাঁটা তুলিয়া লইয়া বলিল, 'আমি একটু সাহায্য করি তোমাকে, কি বল?' বলিয়াই উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সে কাট্‌লেট কাটিতে আরম্ভ করিল।

উত্তরা চাহিয়া দেখিল চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি দীর্ঘাকৃতি যুবক, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে, চোখের চাহনীর সরল দীপ্তিতে মানুষটা যেন আর পাঁচজনের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। এইরূপ নিঃসঙ্কোচে কাট্‌লেট কাটিতে আগাইয়া আসা যেন তার পক্ষে মোটেই বেমানান হয় নাই।

পল্লব স্ত্রীর নিকট যুবকের পরিচয় দিল, 'আমার বাল্যবন্ধু দীপক রায়।'

উত্তরা বলিল, 'ওঃ'।

দীপককে যদিও সে দেখে নাই, বস্তু স্বামীর নিকট তার অনেক কথাই শুনিয়াছিল।

পল্বল বয়কে ডাকিয়া আর এক কাপ চা ও কাটলেট দিতে বলিলে, দীপক বলিল, 'আমার জন্য হলে দরকার নেই।'

একটু পরে প্রেক্ষা-গৃহের ঘণ্টা বাজিলে দীপক উত্তরা [illegible] পল্বলকে [illegible] ক্লাশের দরজা পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া বলিল [illegible] আমার সিট [illegible] আনাব।

একখানা [illegible]

[illegible]

বা[illegible]।

[illegible]

[illegible] আছে

সর্বমাত্র একটা [illegible]

[illegible] সিনেমার ছবির [illegible]

[illegible] থানিকটা [illegible]

[illegible] বলিল 'বড্ড [illegible] গেছে [illegible]।

[illegible] একটু হাসি [illegible]

[illegible] দেখিনি।'

দীপক [illegible] জোরে গাড়ী চালাইতেছিল [illegible]

[illegible] পল্বল বলিল [illegible]

[illegible]

[illegible] পল্বল [illegible] সঙ্গে [illegible]

[illegible] হইতে গাড়ী [illegible]

[illegible] রাত্রে চললে কোথা।

দীপক [illegible] দিতে [illegible]।

গাড়ীর গতি-বেগে সামনের আলোগুলি [illegible] পড়িয়া যায়, তাদের পরস্পরের ব্যবধান দূর হইয়া পিছনে গড়িয়া [illegible] আলোর মালা। সামনে একটার পর একটা আলোকমালার স্তর ভেদ করিয়া পল্বলের গাড়ী ছোটে।

মুখের উপর হাওয়ার ঝাপটা লাগে, উত্তরার নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, যৌবনের পতাকার মত তার ঘোমটা উড়িতে থাকে, কিন্তু ভয় তখন তার কাটিয়া গিয়াছে। এই গতির আনন্দে সে স্বামীর একটু কাছ ঘেঁসিয়া বসিলে পিছনে মুখ না ফিরাইয়াই দীপক বলিল, 'এইটেই হচ্ছে স্পীডের সার্থকতা।'

গাছের ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো মাঠের উপর পড়িয়া কালো ও সাদার ছক কাটিয়াছে। ছকগুলি সুখ দুঃখে-ভরা মানুষের জীবনেরই এক একটা প্রতিচ্ছবি, আশা ও নিরাশা যেন পাশাপাশি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বহু [illegible] উত্তরার [illegible] দরিদ্র দেবতার কাছে মানুষের ঐশ্বর্য [illegible] চিরন্তনের যে আভাষ আছে, [illegible] নয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] তোমার, তেল [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible] কোথায় গায়ে ঠেকে।

[illegible] কোন [illegible] উদ্দাম প্রকৃতি [illegible], কিন্তু উদ্দাম [illegible] সে চেষ্টা করিত দীপকের সঙ্গে সমান [illegible] মোটরবাইক [illegible] সব ব্যাপারে সে [illegible] দীপকের চিরসাথী।

[illegible] আজ দীপক একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, তার বধূ সদ্য-বিবাহিত এবং সদ্য-বিবাহিতের [illegible] একটা মূল্য আছে।

[illegible] বারবার আপত্তি করিল বটে, কিন্তু দীপকের খেয়ালের কাছে [illegible] আপত্তি কখনও টেঁকে নাই, আজও টিকিল না। তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর [illegible] ভাসিয়া গেল।

[illegible] আরম্ভ করিল আবার গান [illegible]। এবার [illegible] গতিবেগ বাড়িবার সঙ্গে তার গলাও চড়িতে লাগিল। সে বোধ হয় গাহিতেছিল—

'আগুন লেগেছে বনে বনে'

সামনেই বেহালার পুল, পুলের ওপারে খানিকটা দূরে সুপারি, নারিকেল

ও তাল গাছের ঘন সন্নিবেশ, ডান দিকে কালীঘাট ফলতা লাইনের ছোট্ট ষ্টেশন 'মাঝের হাট'। ষ্টেশনের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে গগন-চুম্বী বিস্তৃত মাঠ। তার উপর ইতস্ততঃ ছড়ানো দু' চারটা গাছ, দূরে দেখা যায় গ্যাসের আলোর কয়েকটা সারি।

সাদা রেলিংয়ে ঘেরা দুইটা পথ ডাইনে ও বাঁয়ে চলিয়া গিয়াছে, ডাইনের সরু পথটা ক্ষীণাঙ্গী পল্লী-বালার মত যেন তাদের হাতছানি দিয়া ডাকিল।

দীপক সেই পথে গাড়ী চালাইয়া দিয়া বলিল, 'চললাম বজবজ।'

পল্লব ত' অবাক, সে বলিল, 'বল কি হে? এত রাত্রে বজবজ!'

দীপক কোন উত্তর করিল না।

পথের মোড়েই ডানদিকে একটা ষ্টেশন। প্লাটফরমের নীচে লোহার কয়েক সারি মসৃণ রেখা পড়িয়া আছে, কোনটা সরল, কোনটা আঁকা-বাঁকা। দীপক উত্তরার উদ্দেশে বলিল, 'এইটে হ'ল বজবজের লাইন।'

মোটর চলিয়াছে হু-হু করিয়া, হেড-লাইটের আলোকরশ্মির মধ্যে সামনের ধূলো ও ধূলোর মত অসংখ্য পোকা-মাকড় চিক চিক করে। উজ্জ্বল আলোর মাঝে ধূলিকণাগুলিকে প্রাণবন্ত বলিয়া মনে হয়।

পথের ধারে মাঝে মাঝে দেখা যায় দুই একটা ঝাঁপবন্ধ দোকান-ঘর, কখনও বা একটা গণ্ডগ্রাম।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিতে করিতে এই পথ বাহিয়া শাকসব্জী ও ডাব বোঝাই গরুর গাড়ী কলিকাতার দিকে আসে। কোনটার সব্জীর স্তূপের উপর মানুষ শুইয়া আছে, কোনটার গাড়োয়ান নিদ্রায় আর গরুগুলি পথ বাহিয়া সোজা চলে অভ্যাসের বশে।

কোন গাড়োয়ানের হাতে ডাবা হুঁকা, সে মাঝে একবার সুখটান দেয় আর বলদের লেজ মোচড়াইতে মোচড়াইতে বলে, 'হট্ শালা! গরু।'

সরু পথে বিপরীত-গামী গাড়ীর সামনে কখনও দীপককে ব্রেক কষিতে হয়, বিরক্ত হইয়া সে বলিয়া উঠে, 'ড্যাম ইট।'

একবার এইরূপ ব্রেক কষার সঙ্গে সঙ্গে তার কানে গেল একটা গান, সব্জীর স্তূপের উপর বসিয়া একজন গাহিতেছিল—

'ঘনিয়ে আসে আকুল আঁধার
খেয়ার কড়ির নাইক যোগাড়
জমান ধন ক'রে উজাড়
(আমি) আছি কূলে বসে

ও মন আছি কূলে বসে।'

গানটা দীপকের ভাল লাগিল।

পল্বল বলিয়া উঠল, 'এই স্পীডের যুগেও আমরা কত পিছনে পড়ে আছি, দেখেছ?'

দীপক বলিল, 'এইটেই হচ্ছে জাতির সত্যকার স্বরূপ এটা যদি সে হারায় তবে তার আর বেঁচে থাকাই চলবে না।'

'তুমি কিসের কথা বলছ? ভাবা হুঁকা হাতে ঐ গাড়োয়ানের এ যেন একটা শাশ্বত যুগের আফিংখোরের ছবি। এই-ই যদি আমার জাতির বৈশিষ্ট্য হয়—'

বাধা দিয়া দীপক বলিল, 'সবটাকে জড়িয়েই বলেছি। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসার ভাবনায় খেয়ার কড়ির সন্ধানে যে মন ছুটছে, সেই মনটার কথাই প্রধানতঃ।'

পল্বল বলিল, 'ওটা হচ্ছে False philosophy, দুর্ভোগীকে অপদার্থতাকে ঢাকবার একটা অপ-কৌশল মাত্র।'

'পৃথিবীর সব ভাল জিনিষকেই ত' ও ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়।'

দীপক ব্যস্ত গাড়ীর হুইল লইয়া, তাই আলোচনাটা মধ্য পথেই থামিয়া গেল।

কপালে ও চুলের মধ্যে বায়ুর হিমশীতল স্পর্শে পল্বলের চোখ বুজিয়া আসে। তর্ক অপেক্ষা পল্লীর এই স্নিগ্ধ হাওয়ার অনুভূতি তার ভাল লাগে, সেও চুপ করিয়া যায়।

ডাইনে বাঁয়ে গ্রামের পর গ্রাম ছাড়াইয়া, গাছের সারির পর সারি পিছনে ফেলিয়া গাড়ী ছোটে।

তিনজনেই নীরব, দীপককে পাইয়া বসিয়াছে ছোটার নেশা, পল্বলের পাইয়াছে ঘুম, উত্তরা দেখিতেছিল আশেপাশের দৃশ্য, মাঝে মাঝে সে চাহিতে-ছিল আকাশের দিকে।

গাড়ী চলিতেছে এত বেগে কিন্তু আকাশের তারা সমান দূরেই আছে। মানুষের যত নিকটেই যাও না তার মনের যেমন কোন হদিস পাওয়া যায় না, দূরত্ব যেমন কিছুতেই ঘোচে না—এও ঠিক তেমনি!

নিশীথ রাত্রে যত বেশী করিয়া আকাশের দিকে চাওয়া যায় তার গভীরতা যেন আরও রহস্যময় হইয়া ওঠে, কারও ভয় হয়—কারও হয় বিস্ময়!

উত্তরা বিস্মিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, এমন সময় দীপক গাহিয়া উঠিল—

সখি জাগো সখি জাগো···

সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভার ঝাবর সিং বলিয়া উঠিল, 'কসুর মাফ্ কীজিয়ে··'

দীপক হাসিয়া বলিল, 'কসুর কুছ নেই।'

ব্যাপারটা এই, পাগড়ী, দাড়ী ও মাথার চুলের চিরুণী সমেত ড্রাইভার ঝাবর সিং ঝিমাইতে ঝিমাইতে দীপকের বুকের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, তার মাথাটা একটু ঠেলিয়া দিয়া দীপক সুর ধরিয়াছিল—

সখি জাগো—

জাগ্রত ঝাবর নিদ্রিত ঝাবরের শয্যার স্থান-নির্ব্বাচনের ত্রুটিতে অত্যন্ত লজ্জিত হইল।

সামনেই কল-কল্লোলিনী গঙ্গা, তার চন্দ্রালোকিত ঢেউ বাসর ঘরের হাস্যময়ী তরুণীর মতন একে অপরের গায়ে লুটাইয়া পড়ে মনের আনন্দে।

মানুষ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তার তৈরী কল-কব্জা নীরব, সুষুপ্ত পশু পক্ষী, ভূচর খেচর সকলে, তাই বুঝি অভিসারিকা প্রকৃতি লজ্জা ও ভয় ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে গন্ধে, রূপে ও শব্দে।

পুরুষের সঙ্গে এই ত' তার মহা মিলনের সময়, এই ত' সৃষ্টির মুহূর্ত্ত।

জাগ্রত প্রকৃতির ক্ষুদ্র একটা অংশের মতন সামনের জেটীতে একটা রক্তবিন্দু বিচরণ করিতেছিল।···

চাঁদের আলোয় বিন্দুটাকে তাজা একটা জবার মতন দেখায়।

কখনও সে দাঁড়ায় জেটীর রেলিংয়ের উপর ভর করিয়া কখনও চাহিয়া থাকে সামনের ঢেউয়ের নৃত্যের দিকে।

রাত্রের পাহারাওয়ালা শাশ্বত বিরহীর জাত, বৃটিশ রাজত্বের বিরহী 'বিহারী' যক্ষ সে।

শুখা খাইয়া আপনমনে সে বেসুরো গান ধরে, সেই গান হাওয়ার সঙ্গে পাঠাইয়া দেয় তার প্রিয়ার উদ্দেশে।

বজবজ প্রবাসী পোর্ট পুলিশের এই প্রতিনিধি জলের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল সেই জানে, হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গিল – কাঁধের উপর দীপকের স্পর্শে।

দুইটি বাঙ্গালী যুবক, সঙ্গে একটী তরুণী, এত রাত্রে ইহাদের আবির্ভাবে কনষ্টেবলের বোধ হয় মনে পড়িয়াছিল বঙ্গের সহিংস যুব সম্প্রদায়কে।

সে ঠিক করিতে পারিল না, চেঁচাইবে কি হুইসল দিবে। এরা যে স্বদেশী ডাকাত কিম্বা ঐ জাতীয় একটা কিছু উৎপাত বিশেষ, সে সম্বন্ধে সে একরূপ নিঃসন্দেহ হইয়াছিল।

চেঁচাইলে কিম্বা হুইসল দিলে এক গুলীর ঘায়েই ইহারা সাবাড় করিয়া দিবে। কি করা যায় — বেচারী যেন মহাসঙ্কটে পড়িল। এই সব কল্পনা এবং দ্বিধা ও সংশয় তার মনে জাগিল এক মুহূর্তের মধ্যে।

সে কিছু স্থির করিবার পূর্বেই তার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিমুখে দীপক বলিল, [illegible]'

তার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় পাহারাওয়ালা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সে বলিল, 'বাবু সাব।'

তারপর আরম্ভ হইল কনেষ্টবলের সুখ দুঃখের কথা।

[illegible] জানা [illegible] তার দেশের গাঁও, সে কে আছে, কা [illegible] [illegible] কিয়া।'

[illegible] কনেষ্টবলের [illegible]। বিবাহের প্রশ্নে লোকটা যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, [illegible] গিয়া।'

'আর বে করলেন কেন, তোমার ত' বয়স কম।'

উত্তরে কনেষ্টবল বলিল, 'ও বড়া খুবসুরৎ থা' — যেন খুবসুরৎ স্ত্রী মরিয়া গেলে তার স্বামীর আর বিবাহ করিবার কোন অধিকার নাই।

কনেষ্টবলের উত্তরে তার পরলোকগত পত্নীর প্রতি এমন একটা প্রেম প্রকাশ পাইয়াছিল যে, ঐ সম্বন্ধে কোন আলোচনা তখন আর চলে না।

দীপক তার হাত ঝাঁকিয়া আবেগের সহিত বলিল, 'you are a great character.'

কথাটা ইংরেজীতে বলিয়াই আরম্ভ করিল তার হিন্দী তর্জমা, 'তোম আপ একঠো বড়া character আদমী হায়।'

তার হিন্দীর অবস্থা দেখিয়া কনষ্টেবল বলিল, 'হাম সমঝ গিয়া বাবু সাব।'

পল্টলও কনেষ্টবলের সঙ্গে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল, সেও আরম্ভ করিল হিন্দীতে। তার হিন্দী ছিল দীপকের হিন্দীর চেয়ে অনেক ভাল, কিন্তু সত্ত্বেও আলাপটা তেমন জমিল না।

ব্যাপারটা তুচ্ছ; কিন্তু পল্টল ইহাতে মনে মনে ক্ষুন্ন হইল।

দীপকের মনে হইল পাহারাওয়ালার প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়া সে বোধ হয় নব পরিচিত বন্ধুপত্নীর প্রতি অবিচার করিতেছে। ভদ্রতার দিক দিয়া তার

উচিত এমন কিছু না করা যাতে উত্তরা মনে করিতে পারে যে, তাকে অবহেলা করা হইতেছে।

তিনজনেই যোগদান করিতে পারে, এমন একটা সাধারণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা দরকার।

দীপক তাই আরম্ভ করিল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কথা, যে সৌন্দর্য্য তখন তাদের চোখের সামনে তার মহতী মহিমা লইয়া উপস্থিত, যার উপর অধিকার তিনজনেরই সমান।

দীপক বলিল, 'এমন কবি বোধহয় পৃথিবীতে নেই যিনি এ সৌন্দর্য্যের একশ' ভাগের এক ভাগও প্রকাশ করতে পারেন তার কবিতায়। প্রকৃতি কাব্যের চেয়ে কত বড় তা বোঝা যায় এমনি সময়ে।'

পল্লব বলিল, 'তার মানে এই ছন্দোবদ্ধ বই হচ্ছে কবিতার বাইরের রূপ। প্রকৃতিই তার প্রাণ। রূপ প্রাণের যতটুকু প্রকাশ করতে পারে সেইটুকুই তার সার্থকতা। কিন্তু সবটা প্রকাশ করা অসম্ভব।'

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে খানিকক্ষণ পরে তিনজনেই নীরব হইয়া গেল। এমন অনেক সময় আসে যখন কথার চেয়ে নীরবতাকে ভাল লাগে, যেমন কেহ হাসাইবার চেষ্টা করিলে মনে হয় ভাঁড়ামী করিতেছে। তখন কালি-দাসের কবিতা শোনার চেয়ে আকাশের দিকে চাহিলেই মন বেশী তৃপ্ত হয়।

কী সুন্দর আজকের এই রাত্রি তাদের পায়ের তলায় জেটীর লোহার নীচে জল কল্‌কল্‌ করিতেছে বন্দীর ব্যথাহত ছন্দে।

নদীতে দাঁড় বাহিয়া এক একখানা নৌকা যায়, বৈঠার প্রান্ত হইতে জলের উপর ছপ্‌ ছপ করিয়া জল পড়ে। দাঁড়ের দাঁড় কাৎরাইয়া উঠে।

গাছের উপর হইতে পাখীর দল কিচির-মিচির করে, পাতার ভিতর দিয়া শোনা যায় দখিন হাওয়ার গুঞ্জরণ।

আকাশের বুকে শুক্লা একাদশীর চাঁদ চির বিরহীর প্রতীক্ষা করে—যেন কাহার জন্যে, কিসের জন্যে।

দীপক, পল্লব ও উত্তরা তিনজনে নীরবতার মধ্যে পরস্পরকে যেন বেশী করিয়া পাইতেছিল তাদের বন্ধুতার যোগসূত্র যেন দৃঢ় হইতেছিল এই নীরব প্রকৃতির সহযোগিতায়। তিনজনেরই মন তখন পরিপূর্ণতার আনন্দে শান্ত, গম্ভীর।

দীপকের কানে একটা সুর বাজিতেছিল, বরাবরই তার মনে হইত নিশীথ রাত্রির একটা ধ্বনি আছে, সুর আছে। সে সুরটা আজ যেন আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠিল

এই সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া সে গাহিয়া উঠিল—

বাজে সুর বাজে
নিখিল চরাচর মাঝে
বাজে সুর বাজে -
জলে স্থলে নভতলে
কচি কিশলয় দলে
বিহঙ্গম কোলাহলে
আকুতি ওঠে ধ্বনিয়া
মর্ম্মরে তরুলতা -
কয় ভাসা ভাসা কথা
তরঙ্গে জলের ব্যথা
ওঠে ধ্বনিয়া।
বাজে সুর বাজে।

দীপক, পল্বল ও ইন্দ্রাকে যখন বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটা। স্বামী স্ত্রী দুজনেই তাকে অনুরোধ করিল বাকী রাতটুকু তাদের বাড়ীতে থাকিতে।

দীপক বলিল, 'পল্বল তুমি ত'জানো আনখো জায়গায় আমার ঘুম হয় না।'

পল্বল ও দীপক একসঙ্গে স্কুলে পড়িত, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া উভয়েই ভর্ত্তি হয় সেণ্ট জেভিয়াসে'।

তাদের বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। পল্বল মুগ্ধ হইয়াছিল দীপকের প্রতিভায়, তার অকপট ব্যবহারে, তার চরিত্রের মাধুর্য্যে দীপক পল্বলকে শ্রদ্ধা করিত তার স্বভাবের ঋজুতা ও গভীরতার জন্য।

অপরের চক্ষে তাদের প্রথম যৌবনের এই বিচার অতিরঞ্জিত মনে হইত বটে, কিন্তু তাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অটুট, আকর্ষণ ছিল নাড়ীর টানের মতো। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কল্পনাই না তারা করিত। পল্বল ভাবিত— দীপক হইবে এক দিকপাল সাহিত্যিক, যার রচনা যুগে যুগে মানুষকে আনন্দ দিবে. দীপক ভাবিত—পল্বলের বৈজ্ঞানিক খ্যাতি একদিন ছড়াইয়া পড়িবে দেশময়।

কলেজ জীবনে পল্লব বিজ্ঞান সম্বন্ধে দু'চারটা নূতন কথা বলিয়া তার সাহিত্য-ক্লাশের বন্ধুর বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। দীপক পল্লবের মনকে অভিভূত করিত তার মধুর কণ্ঠে স্বরচিত গান শুনাইয়া।

দীপক হইয়াছে এ্যাডভোকেট, পল্লব দালালি করিতেছে শেয়ারের বাজারে—কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা তারা এখনও ছাড়ে নাই। পল্লব অবশ্য স্বীকার করে যে, ওকালতীর সঙ্গে সাহিত্য-চর্চা করা একটু মুস্কিল। সে বলে, দীপক এ্যাডভোকেট হওয়ায় সাহিত্যের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, আইন জগতের লাভ হইয়াছে ঠিক সেই পরিমাণ। শুধু মামলা জয় করিবে না, আইনের নব নব ব্যাখ্যা করিয়া সে ব্যবহারজগতে একটা যুগান্তর আনিবে।

দীপক ঐ রকম কিছু না বলিলেও পল্লবকে বিজ্ঞান-চর্চায় সব সময়ই খুব উৎসাহ দেয়।

দীপক বন্ধুর বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারে নাই। মামার অসুখের খবর পাইয়া পল্লবের বিবাহের আগের দিন সে কোকনদ চলিয়া যায়।

বিবাহের রাত্রে দীপক অনুপস্থিত থাকায় পল্লবের মনে একটা ক্ষোভ রহিয়া গেল। ফুলশয্যার রাত্রেই বন্ধুর প্রসঙ্গ তুলিয়া সে স্ত্রীকে বলিল 'দীপকের মতন প্রতিভা সচরাচর চোখে পড়ে না। তার কাছে সবই যেন নিষ্প্রভ।'

স্বামীর নিকট দীপকের প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া উত্তরার মনে মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হইবার আগ্রহ জন্মিয়াছিল। পল্লবের মতন উচ্চশিক্ষিত লোক যার প্রশংসা করে সে যেন কত বড়ই না হইবে।

পল্লবের কলেজ গ্রুপে দীপকের ছবি সে দেখিয়াছিল। উত্তরার মনে হইয়াছিল তার চেহারা ভাল, কিন্তু রক্তমাংসের দীপক তার চেয়েও অনেক সুন্দর। বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ সুপুরুষ দেখা যায় না।

সেদিন দু'জনেই তার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, একটু পরেই টেনিস খেলা আরম্ভ হইবে, মালী জাল টাঙ্গাইয়া দিয়াছে, টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো।

উত্তরার চেহারাই এমন যে পরিপাটী রূপে প্রসাধন না করিলেও তাকে সুন্দর দেখায়। তবে সে জানে তার উজ্জ্বল রংয়ের সঙ্গে কোন রংয়ের পোষাক ও কি কি গহনা ভাল মানায়।

সে সেদিন পরিয়াছিল লাল একটা ব্লাউজ ও নীলাম্বরী শাড়ী, কানে ছিল তার নীলকান্তমণির ইয়ারিং, গলায় মুক্তার মালা, হাতে দু'গাছা করিয়া চুড়ি।

সে ধীরে ধীরে চায়ের ডিসের উপর একখানা চামচ নাড়িতেছিল।

পল্লব ইজি চেয়ারে শুইয়া বর্মা-চুরুট টানিতে টানিতে স্ত্রীর চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ শুনিতেছে, আর এক একবার চাহিতেছে তার দিকে। চাহিলে যেন চোখ আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না, মন ভরিয়া উঠে একটা গর্বে।

একটু আগেই সে দীপক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে বলে, আইনজীবী হিসাবে দীপক যত উন্নতি করবে দেশের তত ক্ষতি হবে। একটা বড় সাহিত্যিক দেশের যেরূপ সম্পদ একজন উকিল তত না। এইখানেই তফাৎ একজন টমাস হার্ডি ও স্যার এডওয়ার্ড মার্শাল-হলের মধ্যে।

উত্তরা বলিল, 'তিনি কে?'

'মার্শাল-হল হচ্ছেন ইংলণ্ডের বারের সি. আর. দাশ।'

এই সময় সাদা ট্রাউজার ও ধূসর বর্ণের কোট-পরিহিত একটা যুবা টেনিসের র‍্যাকেট দুলাইতে দুলাইতে লনের পথ দিয়া তাদের দিকে আসিতে লাগিল। সে দুপা অগ্রসর হয় আর আকাশে টেনিসের র‍্যাকেট ছোড়ে। [illegible] লোফা-লুফিতে টেনিসের [illegible] মতন তার স্থূল শরীর দোলা খায়। [illegible] সঙ্গে সে মোটা গলায় সুর ভাঁজে

দেবেদা দেবেদা দেবেদা দ্রুম্
প্যারাদৈবি এসে স ক্রীম।
দেবেদা দেবেদা দেবেদা দ্রিম্
দেখিনু তাহারে ডিভাইন ড্রিম।
দুমদা দুমদা দুমদা দুম
প্রিয়ারে দেখিয়া পাইল ঘুম।
কালো কি সাদা সে বুঝিয়া নে
দেবেদা দেবেদা দেবেদা দ্রে।

যুবকটির প্রাত্যহিক আগমনের ধরণই এই। রোজই সে আসে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে।

প্রথমে উত্তরা হাসিয়া ফেলিত, এখন জিনিষটায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

যুবকটী নিকটে আসিলে পল্লব চুরুট দাঁতে চাপিয়া সহাস্য মুখে বলিল, 'গুড আফটার নুন—ও. কে'

ও. কে বলিল, 'সো-টু-ইউ।'

ও কে 'অভিনব কর' নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, আর এই নামটাই মালিকের বেশী পছন্দসই।

অভিনব বলে, 'আমি মানুষটা ও. কে অর্থাৎ অল রাইট কিনা, তাই ঐ নামটা আমাকে বেশী মানায়— ।'

ও. কে পল্লবের হাতে জোরে একটা চাপ দিয়া উত্তরাকে বলিল, 'Blazes, চা রেডী ? বড্ড খিদে পেয়েছে।'

উত্তরা জল গরম করিবার জন্য বেয়ারাকে ডাকিল।

পল্লব ও. কে কে বলিল, 'আজ এখানে একজনকে মিট করবে, আমাদের ওলড্ কালেজ চার্ম।'

'চূণী বাড়ুয্যে ?'

'না—'

'তবে ললিত নন্দী ?'

'আমি তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই।'

ও. কে পল্লবের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিয়াছে তার বিবাহের পর। বরাবর যাতায়াত থাকিলে প্রথমেই সে অবশ্য নাম করিত দীপকের।

এই দেড় মাসের মধ্যে সে একদিনও দীপককে দেখে নাই বটে, কিন্তু পল্লবের মুখে অনেকবার তার কথা শুনিয়াছে, তাই একটু ভাবিয়া বলিল, 'আই সি. দীপক রায় !

পল্লব বলিল, 'দীপক কে বল দেখি ?'

'ঐ যে আমাদের সঙ্গে পড়ত শ্যামবর্ণ, একটু মোটাসোটা।'

পল্লব বলিল, 'ঠিক বলেছ।'

ও. কে বলিল, 'একবার যার সঙ্গে আলাপ হয় তার চেহারা আমি ভুলি না।'

ও. কে চা খাইল দুকাপ, স্যান্ডউইচ ছয়খানা, সন্দেশও গোটাকয়েক, খাইতে খাইতে বলিল, 'এই বিরাট বপুটাকে রাখবার জন্যই এতটা রসদ দরকার।'

পল্লব বলিল, 'ক্রমশঃ মুটিয়ে যাচ্ছ, খাওয়া কিছু কমাও'।

'কমিয়েও দেখেছি, কিন্তু চর্বি জিনিষটা আগাছার মতন, নিজেই বেড়ে যায়। তাই ভাবলুম, দূর ছাই, উপোস করে আর লাভ কি ?'

পল্লব আর ও. কে খেলিতে আরম্ভ করিবে এই সময় দীপক আসিয়া উপস্থিত।

তাকে দেখিয়া ও. কে বলিল, 'Blazes ওঃ তুমি !' তারপর পল্লবকে অনুযোগ করিল, 'বলতে হয় যে সেই দীপক রায় যে আমাদের বার আই এ-তে ফার্স্ট হয়েছে। তুমি আমায় চিনতে পেরেছ, দীপক ?'

দীপক বলিল, 'অভিনব কর ওরফে 'ও. কে'-কে চেনে না এমন ছেলে ত' কলেজে ছিল না।'

ও. কে উত্তরার দিকে চাহিয়া বলিল, 'দেখলেন আমি একটা যে সে লোক নই, একেবারে Blazes !'

উত্তরা হাসিয়া বলিল, 'তা ত' জানি।'

খেলা আরম্ভ হইল দীপক এবং ও. কের মধ্যে।

ও. কে বন্ধুমহলে ভাল টেনিস খেলোয়াড় বলিয়াই পরিচিত, আপিসের সাহেবরাও তার খেলার সুখ্যাতি করে। খেলা আরম্ভ করিল সে এই ভাবিয়া যে দীপককে হারানো তার পক্ষে খুবই সহজ। খেলার চেয়ে তার বেশী লক্ষ্য ছিল উত্তরার দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপর।

সে এক একটা ষ্ট্রোক্ দেয় আর উত্তরার দিকে চায়, তার ষ্ট্রোকের অপূর্ব্ব কৌশল সে লক্ষ্য করিল কিনা ইহা দেখিবার জন্য। প্রথম সেটে ও. কে জয়ী হইল ছয়—তিনে।

জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে বলিল, 'টেনিসটা আমাদের আয়ত্ত বংশানুক্রমে. আমার জ্যেঠামশাই বল টুকর বুড়ো বয়সেও সাহেবদের তাক লাগিয়ে দেন।'

বল্‌টুকরের পরিচয় দীপকের জানা নাই বুঝিয়া ও. কে বলিল, 'বল টুকর আমার জ্যেঠামশাই, বগ্‌ড়ার কালেকটর- '

দীপক বলিল, 'আই, সি ·।'

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেটে ও. কের পরাজয় হইল দুই—চার ও এক—পাঁচ-এ। ও. কে এই পরাজয়ে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া কহিল 'দীপকের হাতও বেশ ভাল।'

দীপক বলিল, 'মনোযোগ দিয়ে খেললে তুমিই জিততে।'

ও. কে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিল।

উত্তরা খানিকক্ষণ পরে দীপককে একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রথম সেটটা আপনি ইচ্ছে করেই হেরেছেন, তাই না ?'

'কেন বল দেখি ?'

'আপনার খেলা দেখে মনে হল।'

রাত আটটা আন্দাজ ও. কে ও দীপক বিদায় লইল।

আজ মাসখানেক যাবৎ প্রায় প্রত্যহই টেনিস খেলার পর পল্বলের বাড়ীতে বন্ধুদের আড্ডা বসে। আলোচনা হয় অনেক রকম, লেনিনবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী নৃত্য পর্য্যন্ত। তবে সব চেয়ে বেশী হয় সাহিত্যের কথা, রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্ব্বতোমুখী শক্তি, শরৎচন্দ্রের গভীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, বঙ্কিমচন্দ্রের দান, বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারা, পশ্চিমের নিকট তার ঋণ।

পল্বলের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আছে, পুস্কিন হইতে গ্যাডস্ত, মলিয়ের হইতে রলাঁ, সারভ্যান্টিশ হইতে ইবানেজ পর্য্যন্তের খবর তারা রাখে। এই দলে বিজ্ঞানের ছাত্র একমাত্র পল্বল। সে চেষ্টা করে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ তুলিবার, কিন্তু উৎসাহের অভাবে আলোচনা তেমন জমে না।

যাহা হোক, এই আড্ডাকে কেন্দ্র করিয়া একটি আলোচনা মজলিশ গড়িয়া উঠিল, দীপক তার নাম দিল পূর্ণিমা। সম্পাদক বা হোতা নির্ব্বাচিত হইল পল্বল।

প্রতি পূর্ণিমায় এই বৈঠকের অধিবেশন হয়। বিবাহিতদের অনুরোধ করা হয়—সস্ত্রীক আসিতে। তাহাতে মজলিশের ধরা বাঁধা কোন নিয়ম নাই।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ বাজিয়া উঠে, মেয়েরা স্তোত্র পাঠ করে। পুরুষেরাও যোগ দেয়। স্তোত্রের মধুর গম্ভীর ধ্বনিতে বাতাস গম-গম করিয়া উঠে, আকাশ ভরিয়া যায় স্তবের ছন্দে। সভ্যরা পড়ে

'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।'

কখনও বা বলে

'নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে'।

অধিকাংশ দিনই সভার অধিবেশন হয় উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ তলে। কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের পর আলো নিভাইয়া দেওয়া হয়, আলোচনা চলে চাঁদের আলোয় বসিয়া।

ঘরে সভা হইলে উত্তরা মেঝেয় আলপনা আঁকিয়া রাখে। ধূপের ধোঁয়ার অপরূপ গন্ধে মনটা তৈরী হইয়া থাকে বাণীর আরাধনার জন্য।

স্ত্রী লইয়া বাহির হইতে যাদের আপত্তি নাই বন্ধু বান্ধবের মধ্যে, সেইরূপ অনেকেই পূর্ণিমার সভ্য বা ব্রতী হইয়াছে। পূর্ণিমা জমিয়া উঠিবার আর একটা কারণ পল্বল ও উত্তরার অমায়িক ও মধুর আতিথেয়তা। এখানে

আসিলে বন্ধুরা ভুলিয়া যায় যে, অপরের বাটিতে আসিয়াছে। সমস্ত রকম স্বাচ্ছন্দের বন্দোবস্ত করিয়া উত্তরা জানে পরকে কি ভাবে আপন করিতে হয়। একটু রাত্রি হইলেই স্বামীর আত্মীয় বন্ধুদের না খাওয়াইয়া ছাড়ে না, তা ছাড়া তার রাঁধিতে ও পরকে খাওয়াইতে অপরিসীম আনন্দ।

পল্বল পূর্ণিমায় তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িয়াছে। ও কে পড়িয়াছে 'হিজি বিজি' নামে একটা হাফ-সিরিয়াস রচনা। পল্বলের খুড়তুতো ভাই ব্যারিষ্টার স্থিতধী বক্তৃতা দিয়াছে, 'আইনের বেআইনিকতা' সম্বন্ধে। দীপক প্রবন্ধ বা গল্প কিছুই লেখে নাই, তবে প্রায় প্রত্যেক সভায়ই গান গাহিয়াছে, গানগুলির অধিকাংশই তার স্বরচিত।

জগন্নাথ মিত্র সাহিত্যের একজন বিজ্ঞ সমঝদার বলিয়া পরিচিত। সে দেশে শিক্ষিত সমাজে এবং কোন এক ধনী মাসীমার সম্পর্ক পাইয়া নিজেকেও একজন অভিজাত মনে করে। যাঁদের কাছে তার যাতায়াত, তাঁরা অনেকেই শিল্পী বা সাহিত্যিক, তাই সঙ্গগুণে সেও সমঝদার পর্যায়ে আসন পাইয়াছে।

এহেন অধ্যাপক জগন্নাথের আজ প্রবন্ধ পড়ার কথা।

পল্বলদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইলেও এতদিন সে পূর্ণিমায় আসে নাই—তাই অনেকেরই এই বিজ্ঞ ব্যক্তিটি সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই লনে আড্ডা জমিয়াছিল, ব্যারিষ্টার স্থিতধী গল্প করিতেছিল ব্যারিষ্টারদের। কেস আর্গুমেণ্ট করিবার সময় লর্ড সিংহের আস্তিনে কনুইয়ের বগল জড়ানোর অভ্যাস, জ্যাকসনের গর্জ্জন, স্যার নৃপেনের উইট, ল'য়ের মূর্ত্তিমান এনসাইক্লোপিডিয়া নামে পরিচিত জনৈক নাইট ব্যারিষ্টারের ভুল ইংরেজী; দেশবন্ধুর আত্মসমাহিত ভাব, লোয়ার কোর্টে গিয়া জে. এন. রায়ের 'জুরী মহোদয়গণ' বলিয়া বাঙ্গলায় বক্তৃতা এইসব ছিল স্থিতধীর গল্পের বিষয়।

পল্বল বলিল, 'দীপক, ওকালতী করে কি আর হবে? তুমি যাও ব্যারিষ্টার হয়ে এস, আজকাল 'বারে' সত্যিকার প্রতিভার অভাব হয়েছে।'

স্থিতধী পল্বলকে একটু খোঁচা দিয়া বলিল, 'সত্যিকার প্রতিভার অভাব হলে, মানে এই ত' তোমার পক্ষে 'বার' জয়েন করবার উপযুক্ত সময়, পল্বল।'

এই সময় জগন্নাথের গাড়ী লনে ঢুকিল। গাড়ী হইতে নামিয়া ঘাসের চাপড়ার উপর দিয়া সে পল্বলদের দিকে আসিতে লাগিল।

তার প্রত্যেক পদক্ষেপে বর্ষার জলপুষ্ট তাজা তৃণগুলি যেন নির্ম্মমভাবে মথিত হইতে লাগিল।

জগন্নাথ অবশ্য খুবই কম আসে, কিন্তু উত্তরা লক্ষ্য করিয়াছে যখন আসে তখনই ঘাসগুলিকে পায়ে করিয়া মাড়ায়। বর্ষায় ঘাসগুলি তাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার এই প্রবৃত্তিটা যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

গিলা-করা পাঞ্জাবীর উপর টোকা দিয়া কল্পিত ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে জগন্নাথ আসিয়া পল্বলদের সামনে দাঁড়াইয়া কহিল, 'হ্যালো—'

সে একটা চেয়ারে বসিলে—ও. কে শরীর দুলাইতে দুলাইতে তার পিছনে আসিয়া বলিল, 'ব্রততী আসেনি?'

পাইপ ধরাইতে ধরাইতে জগন্নাথ সংক্ষেপে উত্তর করিল, 'প্রি-অকুপায়েড।'

ও. কে-র আর কোনও প্রশ্ন করিতে ভরসা হইল না।

সভারম্ভে প্রথমে হইল স্তোত্রপাঠ ও গান, তারপর স্থিতধী একটা কবিতা পড়িল,

'পদ্মার প্রশান্ত বক্ষে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়
অস্তগামী তপনের লালিমা অঙ্কিত
দিনান্তের দিগন্তের কোলে স্নানরতা
সুন্দরী উর্ব্বশী সম কিংবা তিলোত্তমা,
কোথা গৃহ নাহি জানা কিবা পরিচয়
জল বালা ক্রীড়াচ্ছলে নামিলা নদীতে
অথবা দিক্‌বধু কোন গোধূলির ভালে
পরাইলা সৌন্দর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় টীকা।
দখিন হাওয়ায় উড়েছিল বসন-অঞ্চল
কুন্তল ভ্রমর কৃষ্ণ যৌবন পতাকা
সীমাহীন প্রকৃতির অংশরূপে যেন;
সেদিন হেরেছি তারে সেই সে গোধূলি
রূপসীর প্রতিচ্ছবি লইয়া বক্ষেতে
ক্ষীণ-স্মৃতি মাঝে আজও রয়েছে অক্ষয়!'

পল্বলের কবিতাটা ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু পাছে সমঝদার জগন্নাথ কি মনে করে ইহা ভাবিয়া কিছুই বলিল না।

এইবার জগন্নাথের প্রবন্ধ পাঠের কথা। 'আমি একটু আসছি' বলিয়া সে পাশের ড্রেসিংরুমে চলিয়া গেল। গোঁফ আচড়াইয়া ক্রম বর্দ্ধমান টাকের উপর চুলগুলি যথাসম্ভব বিন্যস্ত করিয়া মিনিট কয়েক পরে সে সভায় পুনঃপ্রবেশ করিল। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল বক্তৃতা—

'কলেজে লেকচার দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপত্র পরিদর্শন করে সময় থাকে না বলে আমি কিছু লিখে আনতে পারি নি। তবে আপনাদের ইচ্ছা হলে, আমি মুখে বলতে পারি—'

ও. কে, পল্বল প্রমুখ কয়েকজন বলিল, 'ইয়েস, ইয়েস।' জগন্নাথ আরম্ভ করিল—

'আজকের আলোচ্য বিষয় –আর্ট, বস্তুতান্ত্রিক বনাম আদর্শমূলক। আর্ট একটী ব্যাপক শব্দ। সাহিত্য, চারু-কলা, সঙ্গীত প্রভৃতি অনেক বিষয়ই আর্টের পর্যায়ে পড়ে। তবে আমার বক্তৃতা আজ সীমাবদ্ধ থাকবে সাহিত্যের মধ্যে। ভবিষ্যতে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা যাবে'

ও. কে বলিল, 'বসে বল, তোমার কষ্ট হচ্ছে জগু।'

নিজের নামের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ জগন্নাথ পছন্দ করে না, সে ও. কের দিকে একটু বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার বলিতে লাগিল

'সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বীরবলের সঙ্গে সাধারণতঃ আমি আলোচনা করে থাকি। স্পর্ধা না করেও একথা আমি বলতে পারি যে, কবিগুরু এবং বীরবলের সঙ্গে কখনও কখনও মতভেদ ঘটলেও মোটের উপর সাহিত্যের লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে আমি একমত।'

জগন্নাথ এইভাবে খানিকক্ষণ বক্তৃতা করিল। বক্তৃতায় প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য না থাকিলেও বেশ বড় বড় অনেক মনীষীর নাম করায় এবং ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট ধরণের দু'চারটা কথা বলায় অধিকাংশ সদস্যের কাছেই বক্তা বাহবা পাইল।

রাত্রে সদ্যপ্রস্তুত মাংসের বাটী হইতে উত্থিত পেঁয়াজের গন্ধমিশ্রিত ধোঁয়ায় পূর্ণিমার সদস্যরা সাহিত্য-প্রসঙ্গ প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। জগন্নাথ বিশ্ব-সাহিত্যে 'গোরা'র ও 'ঘরে-বাইরে'র স্থান নির্দ্দেশ করিলে ও. কে জিজ্ঞাসা করিল, 'শ্রীকান্তের স্থান কোথায় ?'

জগন্নাথ এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না।

পল্বল, ও. কে এবং জগন্নাথ তারপর নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দিল মেয়েদের আদর-যত্ন সম্বন্ধে। পল্বল ও. কে-র স্ত্রীকে বলে, 'মাছের মুড়োটা ফেলে রাখলে চলবে না,' জগন্নাথ হাসিরাশিকে মাংসটা শেষ করিতে অনুরোধ করে।

সে সাধারণ ভাবে একটা মত প্রকাশ করিল, 'সুন্দরীরা প্রায় সকলেই স্বল্পাহারী।'

ও. কে অমনি বলিয়া উঠিল, তার পিসিমা, বঙ্গ-পাশার জমিদার প্রমোদবাবুর স্ত্রী খান একটা পাঁচ বৎসরের শিশুর চেয়েও কম। সে তারপরই উদাহরণ দিল স্থিতধীর স্ত্রীর।

স্থিতধী বলিল, 'নিজের স্ত্রীর সামনে পরের স্ত্রীর অত সুখ্যাতি করো না।'

ও. কে-র স্ত্রী বাবলা বলিল, 'উনি স্বচ্ছন্দে করতে পারেন এবং করেও থাকেন।'

উত্তরা সকলের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতেছিল, সে স্বামীকে বলিল, তুমি পুরুষ বন্ধুদের প্রতি আজ এত উদাসীন কেন?'

পল্লব বলিল, তাঁদের যত্ন নেওয়ার ভার ত' তোমার ওপর।'

খাইতে বসিয়া দীপক বেশী কথা বলে নাই, উত্তরাও তাকে খাওয়ার জন্য সব চেয়ে কম পীড়াপীড়ি করিয়াছে। জিনিষটা জগন্নাথের দৃষ্টি এড়াইল না।

সে এক [illegible] চড়ে বুঝিয়া লইল পল্লব স্ত্রীর কথায় ওঠে বসে এবং সেই স্ত্রীর মতামত গঠন করে দীপক [illegible] দীপকেরই এক কথায় পূর্ণিমার প্রাণ। পূর্ণিমায় ভিড়িয়া পড়িতে [illegible] সুর মিলাইতে হইবে। সেটা জগন্নাথের পক্ষে অসম্ভব।

বাড়ীর পথে গাড়ীতে বসিয়া সে সমস্তক্ষণ ধরিয়া [illegible] কথাই ভাবিল এবং স্থির করিল পূর্ণিমায় দীপকের প্রভাব কমাইতে না পারিলে, সে আর [illegible] ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগ দিবে না।

পূর্বেও কয়েকবার 'বন-ভোজন' হইয়া গিয়াছে, প্রত্যেক বারেই ও কে. যোগদান করিয়াছিল: একবার ছিল জগন্নাথ

পল্লবের ইচ্ছা ছিল আজও তাদের নিমন্ত্রণ করে, কিন্তু উত্তরা আপত্তি করিল, বলিল, 'জগন্নাথবাবুর 'কালচারী চাল' আর ও. কে বাবুর মামা-মামীর গল্প আমার ভাল লাগে না।'

গতবার যেখানে বন-ভোজন হইয়াছিল, পল্লবের ইচ্ছা সেইখানে অথবা কোনও বন্ধুর বাগান বাড়ীতে যায়।

দীপকের তাহাতে অমত, সে চায় নতুন জায়গা খুঁজিয়া লইয়া নানারূপ র‍্যাড-ভেঞ্চারের মধ্যে আনন্দটাকে উপভোগ করিতে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু'একখানা

বাসন ভিন্ন আর কিছুই সে সঙ্গে লইবে না। সে বলে, 'মাটী খুঁড়ে উনুন তৈরী করব, পাতা এনে আগুন জ্বালব, জল টেনে আনব পুকুর থেকে।'

পল্বল বলিল, 'তোমার আইডিয়া সম্পূর্ণভাবে যাযাবর বনে' যাওয়া!'

দীপক কোনও উত্তর করিল না। মোটের উপর সকল বিষয়েই তার জয় হইল, কিন্তু জল সম্বন্ধে উত্তরা সমর্থন করিল স্বামীকে। পাড়াগাঁয়ের জল খাওয়া বিপজ্জনক, তা'তে অনেক রোগের বীজাণু থাকে!

দীপক হাসিয়া বলিল, 'বেশ, বেশীর ভাগের মতই মেনে নিলাম। জল কলকাতা থেকেই নেওয়া যাবে।'

তারা বাহির হইল সন্ধ্যার কিছু পূর্বে। টালার পুল পার হইয়া দীপক গাড়ী চালাইল ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে। উত্তরা বলিল, 'জল যে কুঁজো থেকে উপচে পড়ে যাবে।'

দীপক বলিল, 'ভয় নেই, কাছেই গঙ্গা আছেন।'

বালীর পুলের কিছু পরেই হেডলাইট জ্বালাইতে হইল। হেডলাইটের আলোয় সামনের য়্যাশফলটের রাস্তাটাকে প্রকৃতির বুকে কালো একগাছা হারের মত মনে হয়।

মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে দু'একটা মিলের বাড়ী অগণন বৈদ্যুতিক আলোর মালা পরিয়া অন্ধকারের মাঝখানটায় সভ্যতার গরিমায় জ্বলজ্বল করে।

দীপক হঠাৎ ব্রেক কষিয়া দিল, সামনেই রেলওয়ে সাইডিংয়ের সাদা-কালোয় চিত্রিত একটা বেড়া দৈত্যের মত পথের উপর পড়িয়া আছে।

এক মিনিট যায়, দু'মিনিট যায়, পাঁচমিনিট হইয়া গেল বেড়াটা একবারও ওঠে না। পল্বল অধৈর্য হইয়া পড়ে, বলে, 'স্পীডের যুগে এ যেন অসহ্য।'

বজবজের পথে গরুর গাড়ী সামনে পড়ায়--সে দিনও সে স্পীডের কথা বলিয়াছিল! সে দিন গরুর গাড়ীতে বসিয়া কে যেন গাহিতেছিল—

'জমানো ধন করে উজাড় আছি কূলে বসে।' আজও একটা গান শোনা গেল—

'I met Susan in Dum Dum Road
  Rose I met in alley
Discomfiture was complete
  When next I met my Sally
All three rose in unison
And gave me গালাগ্যালি।'

পল্বল বলিল, 'এযে ও. কে-র কণ্ঠস্বর।'

সে ও দীপক দু'জনেই নামিয়া গেল, দেখিল সাইডিং এর ধারে রাস্তার উপর ও. কে. ঘুরিতেছে। পল্বল বলিল, এই যে ও. কে তুমি এখনে ?'

ইংরেজী গান গাহিতে গাহিতে ও. কে-র মন তখন ইংরেজী ভাবে মশগুল. সে বলিল, Had been to Kamarhaty. Waiting for an Omni. তারপর, তোমরা এখানে ?'

পল্বল একটু আমতা আমতা করিতেছিল ; দীপক বলিল, 'আমরা পিকনিক করতে যাচ্ছি।'

ও. কে বলিল, 'পেলজেন ! খাবে কি ? কলাগাছ ত' রাস্তায় দেখলুম না !

দীপক বলিল, 'তোমাকে এখানে দেখে' বুঝেছি যে, সে সব উজাড় হয়ে গেছে।'

ও. কে বলিল 'কে কে আছ তোমরা ?'

পল্বল বলিল, 'তুমিও সঙ্গে চল না ?'

ও. কে. জগন্নাথী কায়দায় বলিল, 'প্রি-অকুপায়েড।'

'কোথায় ?'

'ন'টায় চাং-ওয়ার ড্রিঙ্ক এণ্ড ডিনার ! চাঁদা অলরেডী দিয়ে ফেলেছি !'

পল্বল বলিল, 'কে কে যাবে ?'

'জাগেরনট, ব্যারিষ্টার ঢস আর আমি।'

ও. কে. গাড়ীর কাছে আসিয়া উত্তরাকে নমস্কার করিয়া বলিল, 'পল আমায় নেমন্তন্ন করছিল পিকনিকে যেতে না পারায় আমি দুঃখিত।'

অন্য কোনও মেয়ে হইলে এই সুযোগে অন্ততঃ মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া ভালমানুষীর চেষ্টা করিত, কিন্তু উত্তরা সে ধাতে গড়া নয়, সে শুধু বলিল, 'ও'

ও. কে. ওই উত্তরে খুসী হইতে পারিল না।

ও. কের বাস আসা পর্যন্ত পল্বলরা অপেক্ষা করিল। ও. কে. বাসে উঠিয়া পাদানীর উপর দাঁড়াইয়া, টুপী উড়াইতে উড়াইতে চেঁচাইতে লাগিল, 'চীয়ারুয়-অল, চীয়ারু্য, টা-টা।'

পল্বল বলিল, 'হ্যাপিম্যান, মোটা মাইনে পায়, হৈ হৈ করে দিনগুলো কাটিয়ে দেয়। ওকে আমার হিংসে হয়।'

দীপক বলিল, 'A bit of a buffoon.'

দীপকের গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। একটু পরেই গাছের ফাঁক দিয়া লাল একখানা থালার মত কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঁকি মারিল। নূতন

পরিচয়ের পর ধীরে ধীরে নব-বধূর লজ্জার জড়িমা যেমন করিয়া কাটিয়া যায়, মুখে ফুটিয়া ওঠে স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি —আস্তে আস্তে চাঁদের লালচে ভাবও তেমনি কাটিয়া গেল, একটা স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য ছড়াইয়া পড়িল, মনে হইল প্রকৃতির গায়ে কে একখানা জড়োয়া ওড়না জড়াইয়া দিয়াছে।

গাড়ী শ্যামনগর ছাড়াইয়া গেলে পল্বল বলিল, 'এবার থামো এক জায়গায়।'

দীপক বলিল, 'বেশ, জায়গা পছন্দ কর, আস্তে আস্তে চালাচ্ছি।'

কিছু সময় পরে রাস্তার পশ্চিমে একটা জায়গা পল্বলের পছন্দ হইল, খানিকটা খোলা জমি, তিনধারে গাছের সারি। জায়গাটা উত্তরার পছন্দ হইল না, সে বলিল, 'চড়ুইভাতিতে মুক্তির আস্বাদ যতই থাকুক না কেন, খাওয়া ব্যাপারটায় খানিকটা আব্রুর দরকার। এখানে রান্না করলে রাস্তা থেকে লোকে দেখতে পাবে।'

গাড়ী হইতে নামিয়া অনেক খুঁজিয়া তারা একটা জায়গা নির্বাচন করিল, বড় রাস্তা হইতে ডাইনে সরু একটা পথ গিয়াছে, সেই পথের শেষে একটা বাগান বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। কোনও কোনও জায়গায় দুচারখানা ভাঙ্গা ইঁটের গাথুনি সাক্ষ্য দেয় যে, বাগানের চারধারে বহুপূর্বে প্রাচীর ছিল। মাঝখানটায় ছাদ-বিহীন খানতিনেক ঘরের ভাঙ্গা দেওয়াল বাগানে গাছের চেয়ে আগাছার সংখ্যা বেশী।

শ্যাওলা ও কচুরীপানায় ঢাকা একটা পুকুরে জীর্ণ একসারি সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে।

দীপক উনুনের গার্ত খুঁড়িল, চারধার হইতে গাছের গুঁড়ি ও ডালপাতা লইয়া আসিল।

আগুন জ্বালিল উত্তরা, উনানে ফুঁ দিতে দিতে অর্দ্ধশুষ্ক পাতার ধোঁয়ায় তার ও দীপকের চোখ লাল হইয়া উঠিল।

পল্বল দিতে লাগিল কম্প্লিমেন্টস। সে বলিল, 'ভিজে পাতাগুলো যখন জ্বলে ওঠে, তখন সেই লাল আলোয় তোমাদের দু'জনকেই ভারী সুন্দর দেখায়।'

দীপক বলল, 'ওসব থাক্। এখন আলুর খোসা ছাড়াও দেখি।'

উত্তরা বলিল, 'খোসা ছাড়াতে গিয়ে উনি আঙ্গুলের চামড়া তুলে ফেলবেন।'

পল্বল বলিল, 'কখনও না।'

পরম উৎসাহে নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে পল্বল অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু খোসা যতটা ওঠে ছুরির ডগায়, তার চেয়ে বেশী উপক্রম হইল আঙ্গুলের চামড়া উঠিবার! পল্বল ছুরিখানা রাখিয়া বলিল, 'না, সত্যিকার গ্রেটম্যানেরা আলুর

খোসা ছাড়াবার জন্য সৃষ্টি হয় নি।'

দীপক কাজ করিতে লাগিল পরম উৎসাহে, সুন্দরীর সহযোগিতা তার কাজে প্রেরণা জোগাইল। তরকারী কোটা, মসলা বাটা সবই সে করিল এক হাতে। তারপর আরম্ভ হইল ময়দা-মাখা।

পল্লব একটার পর একটা করিয়া চুরুট ধরায়। নিজের অপটুতার জন্য কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়, সেই সঙ্কোচকে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করে রসিকতা করিবার। এই রসিকতার চেষ্টায় দীপক কি উত্তরা কেহই হাসে না। পল্লব ইহাতে মনে মনে আরও বেশী ক্ষুব্ধ হয়।

সে শেষটায় বলিল, 'এস আমরা ওয়ার্ড-মেকিং খেলি।'

উত্তরা বলিল, 'বাংলা, না ইংরেজী?'

'বাঙ্গলা।'

দীপক বলিল, 'সংযুক্ত অক্ষরগুলির সম্বন্ধে নিয়ম?'

পল্লব বলিল, 'ফলা, বানানগুলোকে আলাদা ধরতে হবে।'

খেলা আরম্ভ হইল।

পল্লব 'ফৌ' পর্য্যন্ত বলার পর, উত্তরা বলিল, 'দ'।

পরেই দীপকের পালা, সে বলিল 'চ্যালেঞ্জ।'

উত্তরা বলিল, 'দু'নম্বর হারবেন কিন্তু'—

'বেশ।'

'ফৌদ্র।'

'মানে।'

'মধু!'

আরও কতকগুলি কথা তৈরী হইল, মুমুক্ষু, বৈতনেয়, স্বাদেশিকতা, কৌস্তুভ ইত্যাদি।

হু হু করিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বাতাস ভাসিয়া আসে, গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের মর্ম্মর শব্দ জ্যোৎস্নাকে মুখর করিয়া তোলে। পল্লব বলিল, 'দীপক, একটা গান গাও।'

দীপক বলিল, 'গান নিজে থেকে না এলে আমি গাইতে পারি না।'

রাত্রির নিস্তব্ধতা ক্রমে বাড়িয়া যায়, কড়ায়ের উপর খুন্তী নাড়ার শব্দ, মাঝে একটা পাখীর ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। দূরে কখনও একটা কুকুর ডাকিয়া উঠে, রাত্রির প্রহরী জগতকে জানাইয়া দেয়, 'আমি আছি, তোমাদের জন্য জেগে আছি।'

পল্বল বলিল, 'আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ যে, আমি গান গাইতে পারি না। এই সুন্দর আকাশের তলায় গলা ছেড়ে গান গাইবার যে আনন্দ— সেটাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান।'

মানুষের অভাবের ও দৈন্যের অন্ত নাই, সীমাহীন উদগ্রতার পিপাসার তুলনায় তার শক্তি কত ক্ষুদ্র। একমাত্র গান গাহিবার শক্তিহীনতার কথা মুখে প্রকাশ করিলেও পল্বলের দীন কণ্ঠ স্বরে অনেক অভাবের বেদনাই ধরা পড়িয়া গেল।

এ অভাব-বোধ শুধু পল্বলের একার নয়, এই অভাব দীপকের, উত্তরার এবং সমগ্র মানব-সমাজের।

একটা অজানা-বেদনায় দীপকের মন তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। চারধারে চাঁদের অত আলো, প্রকৃতির প্রচুর শোভা, বাতাসের শিহরণ, কাছেই উত্তরা ও পল্বল, তার অন্তরঙ্গতম দুই বন্ধু। ধনীর সন্তান সে, অভাব তার কিছুরই নাই কিন্তু মানবাত্মার চির-অভাববোধ তখন সাড়া দিয়া উঠিয়াছে তার সমগ্র প্রাণে।

এতক্ষণ তারা লক্ষ্য করে নাই যে, পশ্চিম-আকাশ একরাশ কালো মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। বাগানের পশ্চিম দিকের একসারি বড় গাছ মেঘকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া এতক্ষণ তারা দেখিতে পায় নাই।

পার্ব্বত্য দেশ হইলে, ঐ মেঘরাশিকে প্রথমে তারা ভুল করিত পাহাড়ের স্তর বলিয়া। স্তরে স্তরে সাজানো কালো মেঘের সে কী বিচিত্র শোভা, মনে হয়, দিক্‌বধূকে কে যেন অঞ্জনের মেখলা পরাইয়া দিয়াছে। পশ্চিমের মেঘ ও পূবের আলো দেখিলে, পদ্মা ও মেঘনার মিলনক্ষেত্রের রূপের কথা মনে পড়ে।

কালোর আয়তন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস কমিয়া গেল, মেঘ বাড়িতে বাড়িতে প্রথমে ঢাকিয়া ফেলিল কতকগুলি তারা, তারপর অজগরের মত গ্রাস করিল চাঁদকে।

অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। এই অন্ধকারে দীপকের প্রাণের সেই অভাব বোধ যেন আরও বাড়িয়া গেল। সে গান ধরিল

অন্তহীন এই অন্ধকারে
কে জ্বালিবে আলো?
ভালবাসার কাঙাল আমি
কে বাসিবে ভালো?
(রে মন) কে বাসিবে ভালো?

চিরযুগের তৃষা কাতর
কে জোগাবে জল ?
সন্ধানীরে পথ দেখাবে
দেবে প্রাণে বল ?
কে ঘোচাবে আঁধার মনের--
কে হরিবে কালো ?
কে বাসিবে ভালো আমায
কে বাসিবে ভালো ?

দীপকের স্বর চড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাও গান ধরিল. ধীরে ধীরে তারও গলা চড়িতে লাগিল।

দু'জনের সাম্মিলিত কণ্ঠস্বরে, মধুর ও উদাত্তের অপূর্ব্ব সম্মিশ্রণে গাছের পাতার মৃদু কম্পন যেন তাল দিতে লাগিল, বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিতে লাগিল গানের সুর।

গান শুনিতে শুনিতে পল্বলের খেয়াল ছিল না যে চুরুট নিভিয়া গিয়াছে, সেও ধীরে ধীরে সুর ধরিল।

গান থামিলে একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, 'মাঝে মাঝে সত্যিই মনে হয় এ জীবনের পথে আলো জ্বালবে কে কে পথ দেখাবে ?'

এই সময় কোথা হইতে প্রকাণ্ড একটা হনুমান আসিয়া লাফাইয়া পড়িল পল্বলের খুব নিকটে। পল্বল একলাফে খানিকটা সরিয়া গেলে উত্তরা হাসিয়া বলিল 'তুমি ত' বেশ অনুকরণ করতে পার।'

হনুমানটা সতরঞ্চের উপরের খোলা চুরুটের কেস হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। পল্বল তাকে তাড়াইবার জন্য তখন পর পর তিনটি ভাষার শরণাপন্ন হইল। সে একবার বলে 'যা, যাঃ' ; একবার হিন্দীতে তাড়া করে, 'হটো কমবখ্‌ত', আবার বলে, 'Get out. Get out, you dirty thing'

এই তিন ভাষার মধ্যে কোনোটীর উপরই হনুমানজীর বিশেষ শ্রদ্ধা আছে বলিয়া মনে হইল না। সে তখন ব্যস্ত তার চুরুট লইয়া।

উত্তরা বলিল, থাক না, ক্ষতি ত' কিছু করে নি !'

পল্বল উত্তর করিল, তুমি জান না, এই লোমশ জীবেরা হচ্ছে ব্যাধির বাহক, হাজারো রকম রোগের বীজাণুর ডিপো।'

ধোঁয়া বাহির না হওয়ায় হনুমানজী চুরুটটাকে ভাঙ্গিয়া চিবাইতে আরম্ভ

করিল। যত চিবোয় ততই যেন বেশী রস পায়, এইভাবে উচ্চশ্রেণীর নিকোটিন বিশারদের মতন সে প্রায় আধখানা চুরুট অল্পসময়ের মধ্যে নিঃশেষ করিল দীপক বলিল, 'শ্রীমান যেন বিংশশতাব্দীর স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে।'

সবেমাত্র তিনজনের খাবার লইয়া বসিয়াছে একটু দূরে বসিয়া হনুমানটা।

উত্তরা লুচি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হনুমানটার দিকে ছুঁড়িয়া দেয়, হনুমানটা খপ করিয়া তুলিয়া মুখে পোরে। খান-দুই লুচি খাইয়া সে লাফাইয়া গিয়া একটা গাছের ডালে উঠিল, ডালের উপর হইতে দেখাইতে লাগিল নানাবিধ জিমন্যাষ্টিকের কসরৎ।

ঠিক এই সময় মনে হইল গাছের পাতার উপর সব সর শব্দ করিতে করিতে একদল গগনচারী সৈন্য ছুটিয়া আসিতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল শিলাবৃষ্টি, এক একখানা শিলা যেন প্রকৃতির জমাট বাঁধা এক-এক টুকরা বেদনা।

মুহূর্তের মধ্যে পাখীর বাসাগুলিতে সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল, পাখীরা ব্যস্ত হইল তাদের শাবকের জন্য। মাথার উপর একখণ্ড শিলা পড়ায় হনুমানজী চীৎকার করিয়া কোথায় যেন উধাও হইল। পল্বলরাও ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় লইল নিকটের একটা গাছের তলায়।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, বর্ষার নিরবচ্ছিন্ন জলধারা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকারকে আরও বাড়াইবার জন্যই মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়--যেন উপহাস করিয়া যায় আঁধারঘেরা প্রকৃতিকে। পরক্ষণেই পিঞ্জরাবদ্ধ হাজার বাঘের এক সঙ্গে গর্জ্জনের মত মেঘ গর্জ্জিয়া উঠে! মনে হয় আকাশে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই লাগিয়া গিয়াছে।

তিন রকমের শব্দে প্রকৃতি তখন মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের শোঁ শোঁ আর জলের শব্দ।

পল্বলরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নীচু, চারিদিকের জল গড়াইয়া তাদের জুতা ডুবিয়া গেল। গাছের পাতায় তখন আর জল মানায় না, বরঞ্চ বাতাসের ঝাপটায় মধ্যে মধ্যে জলরাশি মোটা ধারায় পড়িতে থাকে। তিনজনেই ভিজিয়া টৈ-টম্বুর। উত্তরা শীতে কাঁপিতেছে, পল্বল ভাবে এই বুঝি মাথায় গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে বলিল, 'কী দুসময়েই

না রওনা হয়েছি, এখন বাকী আছে অপমৃত্যু'।

দীপক বলে, 'ভাগ্যে যদি থাকে ত' হবে, তার জন্যে ভেবে লাভ কি ?'

তার এই নির্ভরতায় বন্ধুর মনে কোন রেখাপাতই হয় না ! সে তখন ধিক্কার দিতেছিল তার ভাগ্য-দেবতাকে।

আর দীপক তৎক্ষণে গান ধরিয়া দেয়

বাদল-ঘন বনে মাদল বাজে
আঁধারে অপরূপ রূপে সে রাজে
চরণধ্বনি তার শ্রবণ মাঝে
শুনিতে পাস কিরে পাগল মন ?
আঁধার মাঝে আছে বিরাট রূপ তাঁর
আলোর সাথী চোখে দেখা যে পাওয়া ভার—
থাকিস তবু চেয়ে বরষা মাঝে যদি
জীবনে আসে সেই মধুর ক্ষণ।

দীপকের গান শেষ হইলে পল্লব বলিল, 'তোমাকে দমাতে পারে বিধাতার রাজ্যে এমন কিছু নেই !'

বৃষ্টি থামিল প্রায় দুই ঘণ্টা পরে। তখন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, নিকটেরও কোন-কিছু দেখা যায় না। ব্যাঙের দল আরম্ভ করিয়াছে কনসার্ট, পাখীরা ঝাপটা দিয়া ডানার জল ঝাড়িতেছে চারদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে ঝিল্লিরবে।

দীপক বলিয়া উঠিল, 'চমৎকার !'

আর পল্লব একটু অনুযোগের সুরে ঠিক সেই মুহূর্তেই বলিল, তোমার পরামর্শ না শুনে যদি টর্চটা আনতুম তা হ'লে অন্ততঃ গাড়ী অবধি যাওয়া যেত।'

কোথাও হাঁটু পর্যন্ত জল, যেখানে জল নাই সেখানে মাটি এত পিছল যে চলা অসম্ভব। দুই-পা যাইয়াই পল্লব একটা আছাড় খাইল। দীপক এক হাত দিয়া তখন উত্তরাকে ধরিয়াছে, অপর হাত দিয়া সে ধরিল পল্লবকে ।

তারা গাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিল ড্রাইভার হরিনন্দ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে আর পিছনের সিটে বসিয়া আছে সেই হনুমানটা।

দীপক বলিল, 'হ্যালো ফ্রেণ্ড !'

পল্লব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, 'Get out'.

দীপকের প্রীতি সম্ভাষণ আর পল্লবের বিরক্তিতে হনুমানটার কোন ভ্রূক্ষেপ নাই—যেন মান-অপমানে তার সমান নির্বিকার ভাব।

পল্বল গাড়ীর হ্যাণ্ডেল তুলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিলেও বানরটা নামিয়া না আসায়, উত্তরা বলিল, 'থাক না।'

হনুমানটাকে তুলিয়া ড্রাইভারের সিটের পাশে বসাইয়া দীপক ড্রাইভারকে লইয়া জিনিষপত্র আনিতে চলিযা গেল।

আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন, আঁধার যেন চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিয়া বিশ্বটাকে গ্রাস করিতে চায়, গাছগুলিকে দেখায় এক একটা দৈত্যের মত।

দূরে দুই একবার দীপক ও ড্রাইভারের কণ্ঠস্বর শোনা যায়; তা' ছাড়া সব নীরব, নিস্তব্ধ! পল্বলের কেমন যেন ভয় ভয় করে। ভয়ের হাত এড়াইবার জন্যই সে একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে' বলে, 'তুমি বড় ভিজেছ, উত্তরা!'

উত্তরা উত্তর করে, 'আশ্চর্য্যের বিষয় যে তোমার কাপড় চোপড় এখনও শুকনো আছে!'

পল্বল বলে, 'কী জঘন্য ওয়েদার!'

উত্তরা কোনও জবাব দেয় না। তার মনে হয়, পল্বল আরও কিছু বলিতে চায়। যে দু'টা কথা সে বলিয়াছে, তাহা যেন অন্য কথার ভূমিকা মাত্র।

পল্বল একটু পরে আরম্ভ করে, 'নিজের অক্ষমতায় আজ আমি ভারী লজ্জিত। অন্য কিছু করা ত' দূরের কথা ভাল করে হাঁটতে পর্য্যন্ত শিখিনি। দীপকের হাত না ধরলে নিশ্চয়ই আরও অনেকবার পড়ে যেতুম; অথচ সে অতি স্বচ্ছন্দে আমাদের দু'জনকে ধরে নিয়ে এল।'

কথাগুলি বাহির হইতেছিল পল্বলের হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া। উত্তরা স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, 'কি হয়েছে তাতে? সবাই সব পারে না। তুমি এত বড় বিদ্বান আর অনেক লোক ত' এক অক্ষর পড়তে জানে না।'

পল্বল বলিল, 'কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিদ্যার নয়, বেঁচে থাক্‌তে হলে সবার আগে দরকার শরীরের খানিকটে পটুত্ব, আর সেইটে আমার মোটেই নেই। এই ত' ধর তোমাদের আমি সাহায্য করতে পারলে বৃষ্টি নামবার আগেই খাওয়া শেষ হয়ে যেত।'

উত্তরা স্বামীর গলা ধরিয়া বলিল, 'সামান্যের জন্য মন খারাপ ক'র না, লক্ষীটি।'

পল্বল বলিল, 'এই সামান্যই সূচনা করে বিরাটতর ব্যর্থতার। আমার মনে হয় আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান ত্রুটি এইখানে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মানুষ গড়ে না; গড়ে কতকগুলি পাশের ছাপ দেওয়া পুতুল।'

উত্তরা বুদ্ধিমতী এবং আধুনিক রুচিসম্পন্ন হইলেও নিজের আদরের

বিনিময়ে তার নারী মন আশা করিয়াছিল স্বামীর নিকট প্রতিদান পাইবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির আলোচনা অপেক্ষা তার নিকট এই মুহূর্তে আদরের মূল্য অনেক বেশী। কিন্তু পল্লব স্থাণুর মত বসিয়া বক্তৃতা ও হা-হুতাশ করিতে থাকায় —সে স্বামীর কণ্ঠদেশ হইতে হাত নামাইয়া লইল।

ঠিক এই সময় দীপক ও হরি দত্ত আসিয়া উপস্থিত। দীপক তাকে বলিল, 'তুমি স্টার্ট দাও। সেলফ-স্টার্টার হয় ত' চলবে না।'

অন্ধকারের সমুদ্র ঠেলিয়া গাড়ী ছুটিল, গাড়ীখানা যেন একটা যন্ত্র-দৈত্য হেড লাইটটা তার রক্ত চক্ষু, ইঞ্জিনের শব্দ তার ফোঁস ফোঁসানি।

আগড়পাড়া ছাড়াইয়া পথের দু'ধারে আলো মিলিল। আলোর কাচের উপর জলবিন্দু চিক্ চিক্ করে দেখিলেই মনে পড়ে সদ্য শোকাতুরা রমণীর কথা, কান্না তার থামিয়াছে ঘটে, কিন্তু গালের উপরের জল এখনও শুকায় নাই।

মোলালীর নিকটেই দীপকদের বাড়ী। গাড়ী ধর্ম্ম তলা ও সার্কুলার রোডের মোড়ে আসিলে পল্লব বলিল, 'তুমি বাড়ীতে নেমে যাও। হরিদত্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'কেন?'

'ভিজে কাপড়ে বালীগঞ্জ গিয়ে তোমার দরকার নেই।'

বাড়ীর কম্পাউন্ডের মধ্যে আসিয়া দীপক বলিল, 'তোমরাও কাপড় ছেড়ে যাও।'

'এত রাত্রে তোমার মা কি ভাববেন? তা ছাড়া এইটুকুর জন্য আর হাঙ্গামা করে দরকার নেই।'

দীপকের মা জাগিয়াই ছিলেন। গাড়ী দরজায় থামিলে পুত্র ও পল্লবের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি উপর হইতে নামিয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিলেন— দীপকরা তিন জনেই ভিজিয়া গিয়াছে। তিনি পল্লব ও উত্তরাকে বলিলেন, 'তোমরা নেমে কাপড় ছেড়ে যাও।'

পল্লব প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা টিঁকিল না।

উত্তরার কাপড় বদলানো লইয়া রাজেশ্বরী একটু মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। এয়োতিকে নিজের সাদা কাপড় পরিতে দেওয়া যায় না। তাঁর সধবা অবস্থার কয়েকখানা কাপড় ছিল কিন্তু তাহা দিতেও সংস্কারে বাধিল। অগত্যা পুত্রের অপেক্ষাকৃত বড় পাড়ের একখানা কাপড় উত্তরার হাতে দিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন,

'দেখ দেখি কী অলক্ষুণে কাণ্ড। এয়োতিকে পরতে দেই এমন একখানা কাপড়ও বাড়ীতে নেই। দীপুকে বলি বিয়ে কর ও কিছুতেই রাজী নয়। তোমরা যদি একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে ওকে বল, তোমার কথা ও রাখবে নিশ্চয়, তোমার সুখ্যেত ওর মুখে আর ধরে না।'

উত্তরা বলিল, 'আপনার কথায় যখন রাজী হন নি তখন আমাদের বলা অনর্থক। উনি ত' খুবই মাতৃভক্ত।'

কথাটা শুনিয়া মা'র মন খুশী হইল। পল্লবদের চা-জলখাবার [illegible] হাড়িতে খানিকটা সময় লাগিল। ইতিমধ্যেই রাজেশ্বরী স্টোভে খান কয়েক লুচি ও একটু আলুর দম করিলেন বাজার হইতেও কিছু মিষ্টি আসিল। পুত্র ও তার বন্ধুকে একটা ঘরে বসাইয়া, রাজেশ্বরী উত্তরাকে বসাইলেন পাশের ঘরে। মাঝের দরজায় বসিয়া তিনি তিনজনেরই খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। রাজেশ্বরী বলিলেন, 'চড়ুইভাতির বদলে এখানে কেবল দু'খানা লুচি [illegible] আমি তোমাদের কিছু খাওয়াতে পারলুম না।'

পল্লব বলিল, 'যথেষ্ট হয়েছে, মনে হচ্ছে অমৃত।'

'ক্ষিদের সময় ওরকম হয়', বলিয়া রাজেশ্বরী একটু হাসিলেন।

উত্তরাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, 'কাল আবার আসতে হবে আজ কিছুই খাওয়াতে পারলুম না। আমি গিয়ে কাল তোমায় বলে আসব বৌমা।'

উত্তরা বলিল, 'সে কী মা, আপনি আবার কেন যাবেন। কষ্ট করে। আজই ত' বলা হ'ল।'

রাজেশ্বরী তার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, 'লক্ষ্মীরাণি আমার।'

উত্তরা মাথা নত করিল।

পরপর দুই দিন উত্তরাকে দেখিয়া রাজেশ্বরীর মনে হইল খাসা মেয়ে, যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি বিনয় নম্র স্বভাব। দ্বিতীয় দিন রান্নার সময় উত্তরা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। তার কর্ম্মপটুতা দেখিয়া রাজেশ্বরীর মনে হইল এই রকম একটা পুত্রবধূ পাইলে বেশ হয়।

দীপক ও উত্তরা পরস্পরকে যথেষ্ট এড়াইয়া চলিলেও রাজেশ্বরী বুঝিতে পারিলেন যে, তারা একে অপরকে ভালবাসে। তিনি অবশ্য জানিতেন যে, কোন কিছু অন্যায় কাজ করা তাঁর পুত্রের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু শত হইলেও

সে যুবক, রাজরাণীর মত উত্তরার অমন রূপ তমন সুন্দর হাসি, সরল ব্যবহার, ইহাতে মুগ্ধ হওয়া তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

রাজেশ্বরী পল্বলকেও ছেলেবেলা হইতে চেনেন, ছেলেটী ভাল কিন্তু শিশুর মত অসহায়। দীপকের তার উপর প্রভাব অত্যন্ত বেশী, আর এইটাই সব চেয়ে বড় ভয়ের কারণ।

জগন্নাথ জানিত উত্তরা তার উপর খুশী নয়। চড়ুইভাতিতে তাকে বাদ দিবার কারণ যে উত্তরা, তাহাও সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সে এইজন্য রাগ করিল দীপকের উপর। উত্তরার ইচ্ছাকে সে নিয়ন্ত্রিত করে এইটাই তার অপরাধ।

পল্বল জগন্নাথের বাড়ী গিয়া বনভোজনের গল্প বলিলে মুখে দুঃখে প্রকাশ করিলেও জগন্নাথ মনে মনে খুশী হইল। সে বলিল, 'আমি ভেবেছিলাম বৃষ্টির আগেই তোমরা খাওয়া শেষ করেছ।'

'না ভাই হয়নি আমার জন্যে। আমি ওদের কিছু সাহায্য করতে পারি নি।'

'দীপক ও উত্তরা বোধহয় খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছিল?' এই প্রশ্ন করিয়াই জগন্নাথ পল্বলের দিকে চাহিল ডিটেক টিভের বক্র দৃষ্টিতে।

তার এই দৃষ্টিভঙ্গীতে অন্য যে কোন লোক চটিয়া যাইত, কিন্তু পল্বল তাহা লক্ষ্যই করে নাই, সে সরল সহজভাবে বলিল, 'ওরা যেন প্রাণশক্তিতে সতেজ ও সজীব। আর আমি—'

বাধা দিয়া জগন্নাথ বলিল, 'ঐটেই তোমার দোষ, তুমি নিজেকে সব সময়েই ছোট করে দেখ।

পল্বল কোনও উত্তর করিল না। জগন্নাথ আবার বলিল, 'তোমার মতন সিরিয়াস স্বভাবের লোকেরা সামান্য কারণে অত সজীব হয়ে উঠতে পারে না।'

পল্বল বলিল, 'আমার মনে হয় এটা আমার স্বাস্থ্যের ও মনের দৈন্যের ফল।'

আজ এই দুর্বল মুহূর্তে জগন্নাথের বাহ্যিক সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া পল্বল তার হৃদয়ের দরজা খুলিয়া দিল বলিল, 'সত্যি বলতে কি উত্তরার আমি যোগ্য নই, সময় সময় মনে হয় বিয়ে করাই আমার উচিত হয় নি। Marrying sort আমি নই।

'তুমি প্রেমিক স্বামী, উত্তরাকে খুব ভালবাস তাই ওরূপ মনে হয়।'

'ভাল খুবই বাসি, এত ভালবাসি যে, সে বোধহয় তার গভীরতা উপলব্ধিই করতে পারে না।'

জগন্নাথ জানে কোথায় সীমারেখা টানিতে হয়, তাই চুপ করিয়া রহিল।

তারপর আরও অনেক কথা হইল, জগন্নাথ গল্পচ্ছলে অনেক কিছুই জানিয়া লইল। চড়ুইভাতির রাত্রে উত্তরা ও দীপক কে কখন কোথায় বসিয়াছিল, দীপকের গানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরা কয়বার গাহিয়াছে, কে কাহাকে সাহায্য করিয়াছে কতখানি, পল্লবের নিকট এই সব শুনিয়া জগন্নাথ মানসপটে সেই রাত্রের একখানি ছবি আঁকিয়া লইল।

এই সময় বারান্দায়, 'I met Susan in Budge Budge Road' এই বিচিত্র গান ও. কে-র শুভাগমন ঘোষণা করিল।

সে ঘরে ঢুকিলে জগন্নাথ বলিল, 'তুমি ত' এসে খবর দিলে পল্লবদের পিক্‌নিক্ যাত্রার। আমি ভেবেছিলাম বৃষ্টির লাগে খাওয়া ওবা শেষ করেছে; কিন্তু, এই বলিয়া জগন্নাথ সবিস্তারে খুঁটিনাটি সমেত পিকনিকের একটা বিবরণ ও. কে-কে শুনাইয়া দিল, যেন ব্যাপারগুলি তার চোখের সামনেই ঘটিয়াছে।

ও. কে. বন্ধুর এই বর্ণনা-শক্তিতে বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'বাই গ্রেট গাশে ! এন্ড ব্লদেৎ কোলবার্ট।'

জগন্নাথের বিবরণ শুনিয়া পল্লবের মনে হইল, দীপক ও উত্তরাই যেন পিকনিক করিয়াছে, সে ছিল উৎসবের একজন সাক্ষী মাত্র। জগন্নাথ এবং ও. কে-র কোন আলোচনাতেই সে আর যোগ দিতে পারিল না। একটা অজানা বেদনা তার মনটাকে ঘিরিয়া ফেলিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, 'আজ আমি আসি।'

অন্য দিন পল্লব নিজেই গাড়ী চালায়, আজ ঝাবর সিংকে বলিল, 'হুড খুলে দিয়ে চল স্ট্র্যান্ডে।'

গঙ্গার উপরে জাহাজে জাহাজে আলো দেখা যায়, মানুষগুলি ডেকের উপর হাঁটা চলা করে, মনে হয় এক একখানা জাহাজ যেন এক একটা স্বতন্ত্র জগৎ। বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতার যোগসূত্র ঐ এক একখানা জলযান। স্ট্র্যান্ডে নদীতটে একটা বেঞ্চির উপর শুইয়া পল্লব ভাবিতেছিল, নাবিকদের জীবনের কথা, উন্মুক্ত আকাশের তলে সাগরের ঢেউয়ের উপর জীবনটা তারা কাটাইয়া দেয়। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না তারা লাভ করে!

আশে পাশের আরও দু'চারটা দৃশ্য ; গঙ্গার উপরের ছোট ছোট নৌকা, ওপারের মিলের দুই একটা বাড়ী, এপারে কেল্লার বেতার বার্ত্তার গগনচুম্বী দণ্ড কয়টা, তার চিন্তাধারাকে একটা হইতে আর একটায় লইয়া যায়।

রাত দশটার একটু আগে গাড়ী কম্পাউণ্ডে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লবের কানে গেল দীপকের কণ্ঠস্বর, গলা ছাড়িয়া সে গাহিতেছে—

'তব রূপ পরশে মম অন্তর ওঠে রাঙিয়া,
দাও ওগো প্রিয়তম দাও মম ভুল ভাঙ্গিয়া।'

গাড়ী হইতে নামিয়া পল্লব মিনিট খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কেন যে দাঁড়াইল নিজেই জানে না।

তারপর ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

দীপক ছুটিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে তার হাত দুখানি ধরিল, কি সুন্দর, সরল সে হাসি, শিশুর চাহনির মত অভিসন্ধিহীন চোখের দৃষ্টি।

সে বলিল, 'ও বন্ধু, হোক এতক্ষণে এলে। আমি ত' বসে বসে—'

পল্লব বিস্মিত হইয়া গেল বলিল, 'কেন, উত্তরা ?'

'এসে শুনলাম তার বাবা তাকে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে গেছেন। সে ফিরবে খেয়ে দেয়ে।'

'তুমি এসেছ কখন ?'

'সাড়ে সাতটায়।

'সেই থেকে একা বসে আছ ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কাটলো বেশ। আমার মনে হয় মাঝে মাঝে একা থাকারও দরকার আছে।'

বলিয়াই গান ধরিল—

'সকল হারার সুখ যে রে মন
সকল পাওয়ার বড়,
তবে কেন মিথ্যে পাওয়া
আঁকড়ে এমন ধর।
(রে মন) আঁকড়ে এমন ধর –
সকল হারার আছে যে রে
আকাশ বাতাস মাটি—
হিসেব নিকেশ করে দেখি
তাই শুধুরে খাঁটি
(রে মন) তাই শুধুরে খাঁটি।'

গান শেষ হইলে পল্লব দীপকের হাত ধরিয়া বলিল, 'তোমার বন্ধুত্বই আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য—'

দীপক একটু হাসিল।

খাওয়া দাওয়া করিয়া সে চলিয়া গেল রাত বারটা আন্দাজ। পল্লব বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুইয়া চুরুট টানিতে টানিতে ভাবিতে লাগিল তার কথা। যত ভাবে ততই মুগ্ধ হয়। কী সাদাসিধে সরল সোজা মানুষ, কী তেজস্বী এই দীপক !

জগন্নাথের সঙ্গে আলোচনার ফলে নিজেরই অজ্ঞাতে পল্লবের মনের কোণে যে কালো এক টুকরা মেঘ জমাট বাঁধিয়াছিল, দীপকের শুভ্র হাসিতে তাহা ভাসিয়া গেল।

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। পল্লবের ইচ্ছা কলিকাতার আবহাওয়া ছাড়িয়া কিছুদিন পল্লীগ্রামে ঘুরিয়া আসে। কলিকাতার রাস্তাগুলি নগরীর মানুষেরই মত প্রাণহীন, বাতাস দূষিত, দম যেন আটকাইয়া যায়।

দীপক ও উত্তরা এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিল, কিন্তু মুস্কিল হইল স্থান-নির্ব্বাচন লইয়া। দীপক যাইতে চায় এমন পল্লী-গ্রামে—যেখানে ভাল রাস্তা নাই, কোঠাবাড়ী, গাড়ী, মোটর কিছুই নাই, যেখানে চিমনীর ধোঁয়ায় বাতাস ভারাক্রান্ত নয়, মোটরের ভেঁপু যেখানে মানুষের কানকে সময়ে অসময়ে পীড়া দেয় না।

কিন্তু পল্লব কতকগুলি অভ্যাসের দাস হইয়া পড়িয়াছে, শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই উপকরণগুলি না হইলে তার চলে না। তার চাই ইলেক্ট্রিক পাখা বরফ, ভাল বাথরুম।

দীপক আশ্বাস দিল—এমন জায়গায় তাকে লইয়া যাইবে, যেখানে বিজলী-পাখা ও বরফের কোন প্রয়োজনই হইবে না।

অনেক আলোচনার পর স্থির হইল, তারা পল্লী শোভার লীলাভূমি পূর্ব্ববঙ্গে যাইবে, বোটে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে—নদনদী বিলনালায়। দীপক জায়গার নির্ব্বাচন করিয়া এক বন্ধুর মারফৎ বোটের কিছু ভাড়া আগাম পাঠাইয়া দিল।

ট্রেন খুলনায় পৌঁছিল—শেষ রাত্রে। কুলীর মাথায় মাল তুলিয়া—পূজার যাত্রীর ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে, রেলের ওভারব্রিজ পার হইয়া যখন দীপকরা আসিয়া ষ্টীমারে উঠিল তখনও রাত্রির অন্ধকার কাটে নাই।

খুলনা সহরটি ঘুমন্ত, যাত্রীর নিকট পাশের ঘুমন্ত গ্রাম ও সহর রহস্যময় বলিয়া মনে হয়। সে জাগিয়া আছে, সে ছুটিতেছে কত কোলাহল করিয়া আর পাশেই একদল লোক শান্তিময় আবহাওয়ার সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন। যাত্রীর জগৎ আর ঘুমন্ত মানুষের ঐ জগৎ -এই দুইটার সত্তাই যেন পৃথক।

চাকররা ডেকের সামনে ইজি-চেয়ার পাতিয়া দিলে দীপক ও উত্তরা সেখানে বসিল। পল্বলের মাথা ধরায় সে গিয়া কেবিনে শুইয়া পড়িল। হনুমানটাও গেল তার সঙ্গে। প্রথম প্রথম পল্বল ও এই বানরের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব ছিল না, সে থাকিত উত্তরার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু পশুর, সহজ বুদ্ধিতে দুই-চার দিনেই হনুমানটা বুঝিয়া লইল যে, উত্তরার ব্যস্ত থাকিবার মতন আরও সঙ্গ আছে। তাই বানরটা ক্রমে ক্রমে পল্বলের অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

ডেকের উপর সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া দীপক ও উত্তরার কপোল স্পর্শ করে, সামনের চুলগুলির ভিতর বায়ুর সেই স্পর্শে প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

বিলীয়মান অন্ধকারে নদীর বিস্তার ঠিক বোঝা যায় না, মনে হয়, নদীর সামনের দিক ক্রমেই বড় হইয়া গিয়াছে।

অপরিচিত দেশ দেখার একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আছে, বিশেষতঃ সে দেশ যদি হয় নদীমেখলা। আধ-অন্ধকার ও আধ-আলোর সেই অনুভূতিতে একটা রহস্যের ছোঁয়াচ লাগে।

অন্ধকারের আস্তরণ ধীরে ধীরে পাতলা হইয়া আসে। দিকচক্রবালের উপর ছড়াইয়া পড়ে—একটা শ্যামচ্ছায়া। গাছগুলিকে দেখায়—প্রভাতের নব-বধূর মতন, রাত্রির জড়তার চিহ্ন তখনও তাদের কাটে নাই।

প্রথমে পূর্ব্বাকাশে রক্তবর্ণের একটা ক্ষীণ রেখাপাত হইল, ক্রমে ক্রমে রেখাটা বিস্তীর্ণ হওয়ায় আকাশ সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল, বিশ্বচরাচর জাগিয়া উঠিল নূতন প্রাণের সাড়া পাইয়া। দীপক গান ধরিল, –

নমো নমো নমো নমঃ।
 প্রভাতের আলো
দিকে দিকে চেতনার
 অনুভূতি জ্বালো—
নদ-নদী গাছপালা
ও রূপের স্পর্শে,
হেসে ওঠে নেচে ওঠে
 অপরূপ হর্ষে।
চরাচর পায় প্রাণ

রূপে, রসে, গন্ধে,
রক্ত-বরণী ঊষা!
জগ-জন বন্দ্যে!
রূপ তব অরুণিমা
প্রাণ তব বর্ণে
ছেয়ে দেছ পূবাকাশ
তরলিত স্বর্ণে,
নমো নমো নমো নম।
প্রভাতের আলো।
ও রূপ লেগেছে মোর
নয়নেতে ভালো।

স্টীমারটা কাঁপিয়া ওঠে, ঘর্ঘর শব্দ হইতে থাকে নোঙরের শিকল টানার। সামনের জলরাশি ঠেলিয়া স্টীমার চলিতে আরম্ভ করে।

কোথাও নদীতটে মাঠের অনন্ত বিস্তার ধূ ধূ করে—মাঠের পর মাঠ, কোথায়ও দূরে গ্রামের সীমারেখার মত দাঁড়াইয়া আছে গাছের সারি।

প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া মানুষের পায়ের দাগে দাগে একটা সরল পথ পড়িয়াছে, দূরে পথটা মিশিয়া গিয়াছে ধানক্ষেতের মধ্যে। কোথায়ও নদীতটেই একটা জলাভূমি, কোথাও-বা একটা গ্রাম। খড়ের গাদা, ধানের মরাই, গোবরের স্তূপের পাশেই স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল গৃহস্থের ঘরের চালা দেখা যায়।

স্নানমগ্ন, স্নানরতা গ্রাম্য-বধূরা চঞ্চল ঢেউয়ের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বুকের উপর কাপড় টানিয়া দেয়, যাত্রীর সকৌতুক দৃষ্টির সামনে আত্মগোপন করে। কেহ বা তীরের একটু নিকটে গিয়া চাহিয়া থাকে এই বেগবান জলযানের দিকে। তাদের দৃষ্টি কৌতূহল ও বিস্ময়-বিমিশ্র। পল্লী-বালারা ভাবে, যে দেশের সঙ্গে তাদের পরিচয় নাই—সেই বৃহত্তর বহির্জগতের কতই না বার্ত্তা, কতই না রহস্য লুক্কায়িত আছে—এই জাহাজের মধ্যে, ইহাতে চড়িয়া কলিকাতায় যাওয়া যায়, আরও যাওয়া যায় অনেক জায়গায়! এই মেয়েদের কল্পনার চোখে সেই জায়গাগুলি কত সুন্দর কত রঙিন।

আর চাহিয়া থাকে গ্রামের পশুগুলি, নবজাত গো কিম্বা ছাগ-শিশুরা স্টীমারের হুইশল শুনিয়া সচকিতভাবে পুচ্ছ তুলিয়া ছোটে, বড়রা ভয় পায় না, এ শব্দে তারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; তারা ভাবে—এ ও কী যেন একটা জানোয়ার! পশুর প্রাণেও আছে অপরিচিত রহস্যময়ের প্রতি একটা আকর্ষণ।

স্টীমারের সামনে ছোট ছোট নৌকা দেখিয়া দীপক ও উত্তরার ভয় হয়, -

ঢেউয়ের আঘাতে এখনই বুঝি ডুবিয়া যাইবে! কিন্তু কী অপূর্ব নৈপুণ্য ঐ মাঝিদের, স্টীমারের পাশ কাটাইয়া তারা নৌকা বাহিয়া যায়। ঢেউয়ের উপর নৌকাগুলি আছাড় খাইতে থাকে, এই ওঠে, এই পড়ে; মনে হয়, এই বুঝি ডুবিয়া গেল, পানকৌড়ির মতন জলের উপর আবার মাথা তুলিয়া দোল খাইতে থাকে। মানুষের শক্তি বিকাশের কত যে বিভিন্ন দিক আছে—তাহা দেখিয়া দীপক ও উত্তরা বিস্মিত হইয়া যায়।

ঘন ঘন 'সিটি' দিতে দিতে স্টীমার একটা গঞ্জে ভিড়িল। একটা খালাসী জলে লাফাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিয়া পাড়ে গিয়া উঠিল, হাতে তার একগাছা কাছি ও তারের দড়ি। কাছিটা সে বাঁধিয়া ফেলিল একটা গাছের সঙ্গে, দড়িটা জড়াইল একটা খুঁটিতে।

গঞ্জে কতকগুলি টিনের চালা। নদীর তীরেই স্টেশন-ঘর। যাত্রী ও ফিরিওয়ালার দল ঘাটে ভিড় করিয়াছে, কারও মাথায় টিনের বাক্স-হাতে বোঁচকা, কোন রমণী হ্যারিকেন হাতে দাঁড়াইয়া, কারও কোলে একটি শিশু।

নগ্ন-গাত্র ফিরিওয়ালারা দাঁড়াইয়া আছে—কলা, পেঁপে, চিঁড়া, দই, ফুটি, শশা প্রভৃতি নানাবিধ বেসাতি হাতে করিয়া। কেহ হাই-হিল ছেঁড়া বুটজুতো পরিয়াছে, কেহ মাথায় দিয়াছে তুর্কী-ফেজ, কারও গায়ে খালি একটা ওয়েস্ট-কোট সামঞ্জস্যহীন এই বেশ-ভূষায়ই তারা কত না গর্ব অনুভব করে। এইগুলিই যে তাদের সযত্ন-রক্ষিত সম্পদ।

একটি বার তের বছরের ছেলে, নদীর তীর হইতে উত্তরাকে গোটা কয়েক কাঁচা শশা দেখাইয়া বলিল, 'নেবেন, মাত্র দু'পয়সা দাম?'

পাশের একটি প্রৌঢ় ফিরিওয়ালা তাকে ধমক দিল, "দর কমাইয়া বাজার মাটী কর কেন, আবাগীর ছাওয়াল।"

বালকটি কি যেন উত্তর করিল, দীপকরা তাহা শুনিতে পাইল না।

উত্তরা তাকে ডাকিল, 'উপরে এস।'

স্টীমার তখনও ঘাটে ভাল করিয়া ভিড়ানো হয় নাই। সারেঙ একবার পিছনের দিকটা তীরের দিকে লইয়া যায় একবার আগাইয়া দেয় সামনের দিকটা। এই অবস্থায় স্টীমার হইতে সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইলে ফিরিওয়ালা বালকটি এক লাফে আসিয়া তাহার উপর উঠিল। স্টীমারের পিছনটা এই সময় পাড়ের দিকে চাপিয়া দেওয়ায় সিঁড়িটা পড়িয়া গেল এবং সিঁড়ি সমেত বালকটি পড়িল জলের মধ্যে। এক সঙ্গে অনেকগুলি লোক চীৎকার করিয়া উঠিল, 'জলে পড়েছেরে, মানুষ জলে পড়েছে!'

পারের নিকটে হইলেও জলের তোড় এত বেশী যে, ছেলেটিকে স্টীমার ও পাড়ের মধ্য দিয়া ঠেলিয়া লইয়া গেল মাঝ-নদীতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীপক জুতো খুলিয়া, রেলিং টপকাইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। সে যে লাফাইয়া পড়িবে উত্তরা তাহা বোঝে নাই, তাকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখিয়া উত্তরা একটা কাতর শব্দ করিয়া উঠিল।

উপর হইতে সারেঙ নদীতে কয়েকটা বয়া ফেলিয়া দিল, একজন খালাসী জলে লাফাইয়া পড়িল, তিন চার জন মাঝি নৌকা খুলিয়া দিল।

উত্তরা ছুটিয়া গিয়া সারেঙকে ডাকিল, বলিল, 'দীপকবাবু জলে পড়ে গেছে।'

'হ্যা, কি হয়েছে, দীপক জলে --?' বলিয়া ধড়মড় করিয়া পল্বল উঠিয়া বসিল। ব্যাপারটা যে কি, প্রথমে সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। উত্তরা বলিল, 'একটি ছেলে ডুবে যাচ্ছে দেখে দীপকবাবু জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

পল্বল ছুটিয়া গিয়া সারেঙকে বলিল, 'আপনি যা হয় ক'রে হোক ওদের বাঁচান, যত টাকা লাগে—'

সারেঙ আশ্বাস দিয়া বলিল, 'একজন ভাল সাঁতারু খালাসী গেছে, নৌকো গেছে তিন-চার খানা, আপনার ভয় নেই বাবু।'

পল্বল নীচে নামিয়া পারে গিয়া উঠিল, তার সঙ্গে সেই হনুমান। একটু পরে দেখা গেল নদীতীর দিয়া তারা হন হন করিয়া ছুটিতেছে।

বালকটি সামান্যই সাঁতার জানে, সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল ভাসিয়া থাকিবার কিন্তু আশ্বিনের তীব্র স্রোতে সে অবসন্ন হইয়া পড়ে, এক একবার চুবানি খায়, আবার মাথা তোলে। তার একটু পিছনেই দীপক, সে ছেলেটিকে ধরিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। কখনও মনে হয় এই বুঝি ধরিয়া ফেলিল—কিন্তু পরক্ষণেই ছেলেটি ডুবিয়া যায়। একটু পরে সে ভাসিয়া উঠে আর একদিকে।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে উত্তরার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঠিক এই সময় দেখা গেল, বাঁকের শেষে ক্লান্ত বালকটি হাত দুখানি শূন্যে তুলিয়া জলে ডুবিয়া গেল। দীপকও সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল।

দীপক তার প্রাণের কতখানি যে অধিকার করিয়াছিল, উত্তরা তাহা বুঝিল আজ এই প্রথম। দীপককে যে-মাঝিরা জল হইতে তুলিয়াছিল --উত্তরা নিজের হাত হইতে তাদের চারগাছি চুড়ি খুলিয়া দিল।

তখন তীরের লোকেরা আলোচনা করিতেছিল—ঐ ছেলেটির সম্বন্ধে। কেহ বলিল, 'ছেলেটি ছিল আজন্ম দরিদ্র ও অসহায়, মরিয়া তার সকল জ্বালা

জুড়াইল।' কেহ প্রশংসা করিল তার সৌন্দর্য্যের, কেহ বা বিনয় নম্র স্বভাবের। একজন দিল সব চেয়ে করুণ সংবাদ! ছেলেটির নানী তাকে পাঠাইয়াছিল — শশা বেচিয়া এক পয়সার লবণ লইয়া যাইতে। ঐ লবণ কিনিতে পারিলে তার 'পানিভাত' খাওয়া হইত।

দীপক এক বাটী গরম দুধ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা বারটা আন্দাজ পল্টল তাকে ডাকিয়া তুলিল, সামনেই 'পাটগাতি ষ্টেশন', এবার তাদের নামিতে হইবে।

প্রথমেই দীপকের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল জলের তলায় সেই ডুবন্ত বালকের মুখখানি, একবার বাঁচিবার আশায় ছেলেটির চোখ দু'টা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, পরক্ষণেই ছাপ পড়ে অবসাদ ও হতাশার! দীপকের প্রসারিত হাতখানি ধরিবার জন্য নিজের হাত দু'খানি সে ব্যাকুল আগ্রহে বাড়াইয়া দিয়াছিল; হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয় আর কি! ঠিক এমন সময় জলের তোড় ছেলেটিকে ঠেলিয়া লইয়া গেল আর এক দিকে, ডুবিবার আগে তার মুখের চারিদিকে একটা নীল আভা দেখা দিল। তারপর যে কি হইল দীপক জানে না।

নদীপথে পাটগাতির মাইল দুই দূরে ডুমুরিয়ার হাট। ষ্টেশনে স্নানাহার শেষ করিয়া দীপকরা হাটে পেঁৗছিল বেলা চারটা আন্দাজ।

দু'টা বিলান নদীর সংযোগস্থলে এক ফালি জমির উপর হাট বসিয়াছে, নদী দুইটার জল কাক-চক্ষুর মত স্বচ্ছ। পারের ধারে বাঁশের ও লগির সঙ্গে বাঁধা সারি সারি নৌকা, উপরের দিকে চাহিলে মনে হয় মরা গাছ ও বাঁশের জঙ্গল।

খোলা জায়গায় এবং ছোট ছোট চালার নীচে সারি সারি দোকান বসিয়াছে, লাল মোটা চাল, বেগুন, লঙ্কা, লাউকুমড়া ইত্যাদির দোকানই বেশী। জোলারা বসিয়াছে তাঁতের কাপড় ও গামছা লইয়া। মেছো হাটায় কই, মাগুর প্রভৃতি জ্যান্ত মাছের আমদানীই বেশী। পোনা, ইলিশ প্রভৃতির দোকানও দুই একখানা আছে।

আর এক শ্রেণীর আছে স্থায়ী বড় বড় দোকান, প্রকাণ্ড করোগেটের এক একখানা ঘর। এই দোকানগুলিতে তেল, নুন, কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া পেটেন্ট ঔষধ, শালের খুঁটি, টিন সবই পাওয়া যায়।

হাটের বৈশিষ্ট্য এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে স্ত্রীলোক একজনও নাই। আজ হাটে একজন সুন্দরী তরুণী দেখিয়া নগ্নগাত্র হাটুরেরা বিস্মিত

হইয়া গেল। এমন রূপ তারা কখনও দেখে নাই, তাই অনেকেই চাহিয়া রহিল উত্তরার মুখের দিকে।

দু' একজন দোকানী জিজ্ঞাসা করিল, 'কী চাই আপনাদের?'

এধার হইতে ওধার পর্যন্ত বারকয়েক ঘুরিয়া দীপকরা আসিয়া হাটের প্রান্তে অপেক্ষাকৃত একটা নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়াইল।

হাটটা ছোট একটা দ্বীপের মতন, দুইধারে নদী আর দুই দিকে বিলের জল থৈ থৈ করে, জলের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে ধানের শীষগুলি, হরিদ্বর্ণের মত শীষের ডগায় ডগায় বাতাস ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে।

পূর্ব আকাশে ফুটিয়া উঠিল একটা অনির্বচনীয় দৃশ্য, কালো যবনিকার উপর কে যেন রূপালী একটা রেখা টানিয়া দিয়াছে।

দূরে উত্তর পূর্ব কোণে জমাট বাঁধিয়াছে এক রাশ কালো মেঘ, মেঘের নীচ দিয়া উড়িয়া আসিতেছিল এক সারি বকের পাতি। গ্রামের পর গ্রাম ছাড়াইয়া গাছের সারির পর সারি পার হইয়া, কত নদী-নালার উপর দিয়া সে গুলি কোথায় যেন চলিয়াছে।

পল্বলরা প্রাণ ভরিয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। পাখীগুলি উড়িয়া উড়িয়া তাদের মাথার উপর আসিল, হাট পার হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল দক্ষিণ দিকের কোন এক অজানা রাজ্যে, শুভ্র রেখা মিলাইয়া গেল আকাশের নীল সমুদ্রে।

উত্তরা ও পল্বল আগে আগে যাইতেছিল, একটু পিছনে ছিল দীপক। পাশাপাশি কয়েকটা বেলোয়ারি চুড়ীর দোকান। এক দোকানে একটা বৃদ্ধ দর কসা-কাস করিতেছিল।

বেদে বলিল, 'নিয়ে যাও মোড়লের পো, পরলে নতুনবৌকে খুপসুরৎ দেখাবে।'

'মানাবে, এ্যা'- বলিয়া একটু হাসিয়া, এদিক-ওদিক চাহিয়া বৃদ্ধ চার আনা দিয়া চুড়ী কিনিল।

দোকানী বলিল, 'কি দেখছ?'

'নাতিটা দেখলে তার বৌকেও এক জোড়া কিনে দিতে হবে।'

'নিয়ে যাওনা আর এক জোড়া, নাতবৌ কাল দেখলে যে ঠাট্টা করবে।'

'না, তার বয়স বেশী, ভারিক্কি মেয়েমানুষ, সে নতুন-বৌকে ঠাট্টা তামাসা করেনা।'

পল্বল ও উত্তরা এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল, এই সময় কে একজন ডাকিল, 'বাবু!'

তারা পিছন ফিরিয়া দেখিল বিশ-একুশ বৎসরের একজন চুড়িওয়ালা, ছেলেটা কালো হইলেও সুশ্রী ; তার উপর স্বাস্থ্য ভাল। যুবকটা চারগাছা চুড়ী দেখাইয়া বলিল, 'নিয়ে যান বাবু, ও'র হাতে ভারী সুন্দর মানাবে।'

পল্বল উত্তরার দিকে চাহিয়া বলিল, 'কাচের চুড়ী পরার রেওয়াজ ত'উঠে গেছে, ওদিয়ে কি হবে ?'

চুড়ী কয়গাছা ভারী সুন্দর তাই উত্তরা বলিল, 'কিনে রাখা যাক্, আমি কলকাতায় আবার এর চলন করব।' তারপর চুড়ী দু'গাছা হাতে লইয়া সে বেদেকে বলিল, 'ছোট হবে যে।'

একটু হাসিয়া চুড়িওয়ালা বলিল, 'না, ছোট হবে না, দিন আমি পরিয়ে দিচ্ছি।' উত্তরার কোন উত্তরেরই অপেক্ষা না করিয়া বেদে তার ডান হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া অতি স্বচ্ছন্দে চুড়ী কয়গাছা পরাইল, বলিল, 'দেখুন ত' কেমন সুন্দর হইছে, মানাইছে কেমন !'

গ্রাম্য যুবকের এই প্রশংসার ভঙ্গীতে উত্তরা খুশী এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু লজ্জিতও হইল। সে দেখিল যুবক বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে তার দিকে চাহিয়া আছে !

পল্বল যুবকটার হাতে দু'টী টাকা দিলে সে বলিল, 'দাম দশ আনা বাবু।'

পল্বল বলিল, বাকীটে পরাবার বখ্শিস।'

'পরাবার বখশিস্ ত' নেই, তা ছাড়া ও'র হাতে পরালাম এই সৌভাগ্য' বলিয়া চুড়ীওয়ালা একটা টাকা ও ছয় আনার পয়সা ফেরৎ দিল।

পল্বলরা যখন বোটে আসিয়া উঠিল, তখন মেঘ আকাশটাকে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে, হাটে পড়িয়া গিয়াছে সামাল সামাল রব। যাদের বাড়ী খুব নিকটে, তারা দু-একজনে নৌকা খুলিয়া দিল বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেই লগি ও বাঁশ আরও ভাল করিয়া পুঁতিয়া নৌকা শক্ত করিয়া বাঁধিল দোকানীরা সামলাইতে লাগিল তাদের জিনিসপত্র।

বোটের মাঝি বলিল, 'বজরা খুল্তি আর ভরসা হয় না।'

শরৎকালে বাঙ্গালী নিজের মায়ের মূর্ত্তির মতন করিয়া দেবীর প্রতিমা গড়ে, তাকে সাজায় নিজের জাতীয় সজ্জায়। বাঙ্গলার মায়েরা যে গহনা পরেন,

প্রতিমার গায়ে বাঙ্গালী পরায় সেই গহনা। এই পূজাই অর প্রধান জাতীয় উৎসব। এই অঞ্চলে লক্ষ্মীপূজার মতন ঘরে ঘরে শারদীয়া পূজা হয়। স্বল্প সে পূজার আয়োজন, ক্ষুদ্র তার নৈবেদ্য, সাজ-সজ্জা তারই অনুরূপ—।

দীনের মা ঘরে আসেন, শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, গৃহে গৃহে আরতির বাজনা বাজে, জলের উপর দিয়া সেই শব্দ দূরে ভাসিয়া যায়! মণ্ডপী নৈবেদ্য সাজায়, গৃহলক্ষ্মী নিজের হস্তে পূজার ভোগ রাঁধেন, ধূপ-ধুনার গন্ধে, কাঁসর-ঘণ্টার বাদ্যে ভক্তের সম্মিলিত কলরবে এই মরা জাতির প্রাণে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। আজ বিশ্ব পূজিতা অতিথি আসিয়াছেন. দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে পদার্পণ করিয়াছেন মা রাজরাজেশ্বরী।

তন্ত্রধার মন্ত্রে পড়েন—

"যা দেবি সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'

পুরোহিত স্তোত্রের পুনরাবৃত্তি করেন

'যা দেবি সর্ব্বভূতেষু—'

কয়েকটা বাড়ী হইতেই পল্বলদের পূজা দেখিবার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। হিন্দুর সন্তান তাদেরই গাঙে আসিয়া বজরা বাঁধিয়াছে, এই বিদেশীদের আহ্বান না করিলে মাতৃপূজা যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না!

পল্বলরা কয়েক বাড়ী দেবী দর্শন করিল। খড়ের বা টিনের মণ্ডপে মা দশভূজার মূর্ত্তি, সামনে বড় একটা আটচালা ঘরে ছেলে-বুড়ো সকলেই জড় হইয়াছে। যাদের বাড়ীতে পূজা নাই, সেই প্রতিবেশীরাও যোগ দিয়াছে এই জাতীয় মহোৎসবে। হিন্দুর পাশে দাড়াইয়াছে মুসলমান 'দুগ্‌গি' দেখিবার জন্য, ধনীর পাশে দরিদ্র, মনিবের পাশে প্রজা!

আটচালার পাশে ছোট একটা ঘরে বাদ্যকররা খড় জ্বালিয়া টিকারায় সেক দেয়। আটচালায় জীর্ণ দু'একটা চেয়ার, মাঝখানে একটা চৌকির উপর মাদুর বা চাদর পাতা।

স্বচ্ছল গৃহস্থ এসিটেলিন বা ডে-লাইট জ্বালাইয়াছে, দরিদ্র ঝুলাইয়াছে হারিকেন, আর মায়ের সামনে জ্বালিয়া দিয়াছে মোমের বাতি! এই দরিদ্ররা যে মন লইয়া দেবীকে বাড়ীতে আনিয়াছে, ঠিক সেইরূপ সরল সহজ মনেই ডাকিয়াছে এই বিদেশী তিনজনকে! দীপকের মনে হইল—আজ মা দূরকে নিকট করিয়াছেন, পরকে বসাইয়াছেন ভাইয়ের আসনে।

নবমীর রাত্রি সেনের বাড়ীর 'খেউড়' শুনিবার নিমন্ত্রণ 'খেউড়' এ অঞ্চলের

একরকম গান, যে গান গাহিয়া দলে দলে যুবক আসিয়া মায়ের কাছে ভক্তি নিবেদন করে। গায়কের দলে সব জাতই আছে, তবে বেশীর ভাগ নমঃশূদ্র। এই খেউড়ের কবিদের মনের ভাব প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী বিচিত্র! আটচালায় দাঁড়াইয়া নানা সুরে, নানা ভঙ্গীতে তারা গান গায়, কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে নাচে। বখশিস পায় একজোড়া কি দু'জোড়া নারিকেল, তাহাতেই তাদের কত সন্তোষ!

একদল গাহিয়া গেল,

(ও মা) আইছ এবার নৌকায় চড়িয়া—
যাত্রা করবা গজে
এবার বাদল দিয়া দ্যাশ ভাসাবা
চাষা ভুষা মজে—
(ও মা) গরীবরা যে মজে!
নাচার উপর ওঠবে পানি
ভাসবে কুমড়া-কদু,
লজ্জা সরম রাখতে নারবে
ঘরের কুলবধূ
(ওমা) গৃহের কুলবধূ।

আর একদল গাহিল,

'বছর বছর আইস দুর্গা গা, বছর বছর যাও
বিলান দেশ রথ মা তোমার শালবৃক্ষের নাও।
(ওমা) শালবৃক্ষের নাও।
নাও, মা তোমার আটকাইয়া যায়—লাগে ঠেলা-ঠেলি
পাঠালে ঐ কচুরীর দল জারমণি কৌশলী।
(ওমা) কৈসর কৌশলী।
লড়াই গেছে থামিয়া কবে দোস্তি রাজায় রাজায়
(কিন্তু) কচুরীর ধাপ ওমা দুর্গা গা, বাঙ্গালীরে মজায়
শোষে তাহার নদী-নালা--মারে তাহার ধান
কচুরীরে হনন করিয়া বাঁচাও মোগো প্রাণ
ও মা বাঁচাও মোগো প্রাণ।

খানিকক্ষণ পরে বাড়ীর মেয়েরা উত্তরাকে ভিতরে লইয়া গেল। সেখানে তার ভাব হইয়া গেল একটি সমবয়সী বধূর সহিত, বধূটী সুন্দর নয়—কিন্তু বেশ পরিপাটি রুচিসম্পন্না।

সে বলিল অনেক কথা, তার খোকনের দুষ্টামীর গল্প শাশুড়ীর যত্ন আদর।

উত্তরা তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে মেয়েটী যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, বলিল,'তিনি এই দু'বছর আসেন নি। আগে কিন্তু এ রকম ছিলেন না, ছুটী পেলেই ছুটে আসতেন।'

তারপর একটু থামিয়া বলিল, 'এখন তিনি বলেন, আমি অশিক্ষিত বলে আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবধান অনেকখানি। তিনি বি এ অবধি পড়েছেন কিনা?'

উত্তরা জানে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এইরূপ কত ট্র্যাজেডীর অভিনয় হয়, শিক্ষাভিমানী স্বামী স্ত্রীকে উপেক্ষা করে—স্ত্রী সেক্সপীয়ার ও কালিদাসের কোটেশনের অর্থ বোঝে না বলিয়া। পূজাব আনন্দ কলরবের মধ্যে কত অশিক্ষিত বধূ বি. এ পড়া পণ্ডিত স্বামীর উপেক্ষার জন্য সকলের আড়ালে চোখ মোছে। বধূদের এই চোখের জলে মায়ের আগমন নিরর্থক হয়, আনন্দ কলরব যেন নিজেকেই নিজে উপহাস করে!

এই সময় বধূটির খোকা আসিলে উত্তরা তাকে কোলে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার নাম কি খোকা?'

'অলবিন্দ ঘোতন।'

'তোমার মার নাম?'

'থোত বৌ।'

ছোট বৌ বলিল, 'আমার জন্য না হোক —এই ছেলের জন্যও কি তিনি আসতে পারেন?'

উত্তরা নীরব।

এই সময় খাবার আসিল, বাটীতে বাটীতে সাজানো নানা রকমের তরকারী, মাছ, মাংস! পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্ট খাবারগুলি উত্তরা আগ্রহের সহিত খাইল। পাশের ঘরে পাতা হইয়াছিল দীপক ও পল্লবের। ছোট বৌ একবার উঁকি মারিয়া তাহাদের দেখিয়া লইয়া উত্তরাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার স্বামী কে?'

'যায় গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী।'

'ওঃ—'ছোট বৌর এই 'ওঃ' বলার ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল যে, সে খানিকটা আশাহত হইয়াছে।

উত্তরা বলিল, 'আমি বড ভাগ্যবতী ও'কে পেয়ে!' বলিয়াই মনে হইল কথাটা বাহুল্য মাত্র, বিশেষতঃ তার কণ্ঠস্বরে ছিল জিনিষটাকে জোর দিয়া বলিবার অশোভন আগ্রহ।

অশিক্ষিতা পল্লী-বধূ ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'ভগবান করুন, তোমার

এই সৌভাগ্য যেন অটুট থাকে।'

কথাটা কি ভাবিয়া সে বলিয়াছিল ছোট বধূই জানে, কিন্তু উত্তরার কানে তাহা বাজিল।

বিদায় লইবার সময় ছোট-বৌ বলিল, 'চিঠি লিখো ভাই, এই আমাদের ঠিকানা। আর তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে, আমার চিঠি পড়ে হেসোনা কিন্তু।'

উত্তরা হাসিয়া বলিল, 'জুতো-জামার ভড়ং দেখে তুমি ভেবেছ আমি একটা পণ্ডিতলোক। কিন্তু আমারও বিদ্যে ফিফ্‌থ ক্লাশ পর্যন্ত।'

একটা নদীর পর বজরা আর একটা নদীতে গিয়া পড়ে, দীপকরা প্রত্যহই কোন না কোন গ্রামে নামে, গ্রামের লোকদের সঙ্গে আলাপ করে, বেশীর ভাগ যায় হিন্দু ও মুসলমান চাষার বাড়ীতে। বাড়ীগুলি যেন এক-একটি দ্বীপ, আট দশ খানা ঘরে তিন-চারটি গৃহস্থ থাকে, পৃথক্ তাদের গোশালা, ঢেঁকিঘর।

গৃহস্থ মাত্রেরই একখানা ছইবিহীন ছোট নৌকা আছে, বর্ষাকালে নৌকায় করিয়াই সব কাজ করিতে হয়।

এ অঞ্চলে ভদ্রলোকরাও নৌকায় করিয়া জাল দিয়া মাছ ধরে, 'কাছিম' কোপায়। কাছিম যখন নিশ্বাস লইবার জন্য জলের উপর শুঁড় তোলে তখন নৌকা হইতে 'এ্যাওড়া' ছুঁড়িয়া মারিতে হয়। ইহাতে যেমন দরকার অব্যর্থ সন্ধানের, তেমনি প্রয়োজন নৌকা বাহিবার নৈপুণ্যের।

দীপকদের দিন কাটিয়া যায় নূতন সব জিনিষ দেখিতে দেখিতে। সন্ধ্যায় সব আড্ডা বসে গ্রীণ বোটের ছাদে, দাঁড়িরা দাঁড় তুলিয়া রাখে, মাঝি স্রোতে বোট ভাসাইয়া দেয়।

জলের বেগ অনেক জায়গায়ই তীব্র নয়, ঢেউগুলি ধীরে ধীরে নৌকার গায়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে ছল ছল শব্দ করিয়া! এই অপরূপ পল্লী-শ্রীর সঙ্গে ঐ শব্দ যেন একই সুরে গাঁথা।

রাত্রে আলো জ্বালিলে বাড়ীগুলিকে লাইট হাউসের মত দেখায়, কখনও ধূমকেতুর পুচ্ছের মত ষ্টীমারের সার্চ্চলাইটের আলো বিলের উপর দিয়া চলিয়া যায়। সবচেয়ে ভালো লাগে রাত্রে মাঝির গান। সেই গানে ফুটিয়া ওঠে চির-বিরহী মানব মনের অস্ফুট বেদনা! সে গায়—

'ও তুফান তুফান রে—
কইও গিয়া চাঁদমুখেরে
তাহার আলিজান
দখিন দ্যাশে কাটতে গ্যাছে
পাকা পাকা ধান।
ধানের সোনার বরণ দেইখ্যা
পরাণ জ্বলিয়া যায়
মনে পড়ে সোনার বউ তার –
একেলা ঘুমায়।
ও তুফান তুফান রে
ঘাটে গিয়া দ্যাখবা তুমি
চাঁপাবরণ পিয়া
কড়ে মাজে, বদনা মাজে
চম্পক আঙ্গুল দিয়া,
আঙ্গুল দেইখ্যা চেনবা তারে
চেনবা দেইখ্যা চরণ।
চেনবা দেইখ্যা ভাণ্ডো মাজার
সে এক নতুন ধরণ—
একটু ছেরম করলে বিবির
নাকের ডগা ঘামে
তাই ডাহে তারে আর সগলে
মাখন-বধু নামে।
ও তুফান তুফান রে
বাড়ী আসার খুসীর বাগে
কি নাম যেন থাপোয়—
দুই জোয়ারে মেলবেরে গাও
(শ্যাষে)—একটুখানি ভাটায়
কইও গিয়া আলিজানের
চউক্ষে নাইক ঘুম
যতক্ষুণ না বিবির মুখে
খাইতে পারে চুম
ও তুফাম তুফান রে!

দীপক ও পল্বল গানটা শুনিতেছিল বোটের ছাদে বসিয়া, নৌকার ভিতরে ছিল উত্তরা। আজ কয়দিন সে আর আড্ডায় তেমন একটা বসে না, কখনও কাজে ব্যস্ত থাকে, কখনও বলে শরীর খারাপ। দীপক বোঝে উত্তরা তাকে এড়াইয়া চলিতে চায়।

পল্বল বলে, 'ছাদে খোলা হাওয়ায় বসলে শরীর ভাল বোধ হবে, উত্তরা।'

উত্তরা হাসে, বলে, 'খোলা-হাওয়া যে সব রোগেরই ওষুধ, এ তোমায় কে বললে ?'

পল্বল সেদিন জোর করিয়াই তাকে উপরে লইয়া আসিল। চারিদিকে চাঁদের আলো, নদীর বুকে জ্বল-জ্বল করিতেছে শত শত চাঁদ। ঢেউয়ের উপর চাদের রুপালী রশ্মির কম্পন দেখিয়া মনে হয়, সুন্দরীর চম্পক অঙ্গুলী স্পর্শে সেতারের তার কাঁপিতেছে।

দীপক একমনে সেতার বাজাইতেছিল, সে আশা করে নাই—উত্তরা আসিবে। উত্তরাকে দেখিয়া প্রথমে তার আঙ্গুল একটু কাঁপিয়া গেল। সে বাজাইল একটার পর একটা করিয়া অনেকগুলি গৎ। সেই সুরে সম্মোহিত হইয়া লাল-ফুলে ঢাকা হিজলগাছ হইতে একটা শালিক গাহিয়া উঠিল, একটা বিরহী পাখী পাগল হইয়াই যেন উড়িয়া গেল আকাশের মাঝখান দিয়া।

দীপক বলিল, 'এবার তুমি বাজাও উত্তরা।' উত্তরা কোলের উপর সেতারটা তুলিয়া লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

পল্বল শুইয়াছিল বিস্তীর্ণ কার্পেটের উপর। সে একটার পর একটা করিয়া আলাপ শোনে আর বলে আবার বাজাও। উত্তরার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে দীপক গান ধরিল—।

'নিশার দেবতা তোমা প্রণাম করি
চাঁদের আলোয় গেল নয়ন ভরি—'

এ গানটা সে প্রায়ই গায়।

উত্তরাও তার সঙ্গে স্বর মিলাইল—

'নিশার দেবতা তোমা প্রণাম করি
চাঁদের আলোয় গেল নয়ন ভরি।
ছড়ায়ে দিয়েছ সুধা আমার চোখে
দিয়েছ আশার আলো এ ভাঙ্গা বুকে,
আকাশে ছড়ানো তব মধুর শোভা
লুটায়ে পড়িছে মনে আলোক লোভা,

নিশার দেবতা তোমা প্রণাম করি
জীবনে তোমার শত করুণা স্মরি।'

গান শুনিতে শুনিতে পল্বলের চোখ ধীরে ধীরে বুজিয়া আসিল।

রাত্রি গভীর, বিশ্বে যেন কেহ নাই—কিছুই নাই! সত্য তখন বর্তমান, সত্য জলের ছপছপানি, দু'পাশের গাছগুলি; আর সত্য চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল আকাশ।

মানুষের এই আনন্দের অনুভূতি প্রাণে একটা বেদনার সাড়া জাগায়। সেই ব্যথার হাত এড়াইবার জন্যই যেন উত্তরা বলিল, 'ঐ তারায় কি আছে, কে আছে, বলতে পারেন? আমাদের পূর্বপুরুষরা—আপনার বাবা, আমার বাবা বোধহয় ওরাই কোন তারার গিয়ে বিশ্রাম কচ্ছেন?'

দীপক বলিল, 'তাঁরা ওখানে আছেন—এই ভেবেই তৃপ্তি, নেই মনে হলে তখনই ভাবি মৃত্যুর পরে আমরাও থাকবনা! মন তখন একটা অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে।'

উত্তরার মনে হইল, ঐ তারকাগুলি তাদের কত আত্মীয়, তাদের অন্তঃকরণে গভীর রহস্যের মৌন জ্যোতির্ময় সাক্ষী তাহারা। তারার পর তারা সাজানো রহিয়াছে থরে থরে অসংখ্য অগণন। দীপক ও উত্তরা জানে না কোনটার কি নাম, কোনটার দূরত্ব কত! মন অভিভূত হইয়া যায় ওদের বিশালতা ও দূরত্বের কথা ভাবিতে! কে ওদের সৃষ্টি করিল, লক্ষ কোটী মাইল ব্যাপী অনন্ত শূন্যে কে সাজাইল - ঐ পুষ্পস্তবকগুলি? কে দিয়েছে উহাদের গতি? রাত্রি ফুরাইয়া যায়, চাঁদ ও তারাগুলি মলিন হইয়া আসে। সকল অনুভূতিরই পরিসমাপ্তি আছে সেই পরিসমাপ্তির বেদনা প্রাণে নূতন আলো, নূতন আশার সঞ্চার করে।

পল্বল তখনও নিদ্রিত। দীপক উত্তরাকে বলিল, 'তুমি এখানেই একটু ঘুমোও, আমি উঠি।' উত্তরা খানিকক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঘুমিয়া পড়িল।

পরদিন স্বামী স্ত্রী উভয়েরই ঘুম ভাঙ্গিল সূর্যরশ্মি মুখের উপর পড়িবার পর।

উত্তরা ভাবিল, স্বামীকে নিজের দুর্বলতার কথা প্রাণ খুলিয়া বলে, তাকে অনুযোগ করে, কেন সে তার সামনে বন্ধুকে অমন করিয়া বাড়াইয়া তোলে?

বিদ্যা, বুদ্ধি, বংশগৌরব, অর্থসম্পদ কিছুতেই পল্বল কম নয়, তার স্বাস্থ্যও ভাল, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, ধৈর্য্য অপরিসীম, ভদ্রতা অন্যের অনুকরণীয়। সবই ঠিক,

কিন্তু তবুও দীপককে স্বামী অপেক্ষা তার ভালো লাগে। কেন লাগে? এ কেনর উত্তর দেওয়া মুস্কিল।

পল্লবের কতকগুলি অভাব আছে, সে নির্ব্বোধ নয় বটে, কিন্তু সাধারণ জিনিষ বুঝিতেও তার সময় লাগে। এক কথায়, যাকে স্মার্ট বলে—পল্লবের ধরণটা সেরূপ নয়।

আর দীপক যেমন স্মার্ট ছুরীর ফলার মত তেমনি তীক্ষ্ন তার বুদ্ধি। পল্লব দুর্ব্বলপ্রকৃতির লোক এবং নার্ভাস। দীপক বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িবার ক্ষিপ্রতায় ও সাহসে যেন বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী নাইট-এর‍্যাণ্ট, দীপক অসাধারণ সুপুরুষ! পল্লবের চেহারা সাদা-সিধা ধরণের। দীপক সুকণ্ঠ—চাঁদনীরাতে তার গানের ঝঙ্কারে শ্রোতার প্রাণ নাচাইয়া তোলে, আর পল্লব কথা বলে চিবাইয়া চিবাইয়া। কণ্ঠস্বরে তার কোন মাধুর্য্য নাই, গলাটা বরং একটু মোটা।

এক সঙ্গেই যে এই সব কথা উত্তরার মনে হইয়াছে—এরূপ নয়, দিনের পর দিন তুলনামূলক সমালোচনার ফলেই দাঁড়াইয়াছে ইহা! উত্তরা এজন্য নিজের কাছে লজ্জিত—এই লজ্জা তাহাকে বাধা দিয়াছে। স্বামীর নিকট সব কথা খুলিয়া বলিতে পারে নাই—পল্লবের মনের দিকে চাহিয়া। পল্লবকে সে দুঃখ দিতে চায় না! কোন অপরাধই ত' পল্লবের নাই! যদি থাকে, সেটা অকপট বন্ধুত্ব ও পত্নীপ্রেম হইতে সমুদ্ভূত একটা অবিবেচনা মাত্র। সময়ে স্বামীকে সব বলিলে হয়ত ভবিষ্যতে অনেক দুঃখ কষ্টের হাত হইতে তাহারা বাঁচিতে পারিত, কিন্তু পল্লব যে বড় দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক! তার পক্ষে এই ধাক্কা সহ্য করা সম্ভব নয় ভাবিয়াই উত্তরা কিছু বলিল না।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। তারা ঘুরিল আরও অনেক জায়গায়, মাদারীপুরের পর বরিশাল, বরিশাল হইতে চাঁদপুরের পথে—তারপাশা।

দেশটাই নদী-মাতৃক! কেবল জল আর জল, মাঝে মাঝে শ্যামল তৃণ-ভূমি। সামান্য হাওয়ায় পদ্মার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ঢেউ—গ্রীণবোট বরাবর আছাড় খাইয়া পড়ে। পদ্মা ও মেঘনার মোহনার মাঝখানে আসিয়া তাহাদের মনে হয়—সীমাহীন জল রাশি, আকাশেরই মত অনন্ত তার বিস্তার।

পল্লব নদীর পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, উত্তরার চোখে লাগিয়াছে চমক, আর দীপক গাহিয়াছে ভোরের গান ও নদীর গান!

উত্তরার মনে তার সম্বন্ধে যে সঙ্কোচ জাগিয়াছিল, এই সব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহা কাটিয়া গেল। অভ্যাস এমনই জিনিষ যে, অন্যায় ও

অসুন্দর সবই তার প্রসাদে মানুষের চোখে সহিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে এই দুর্ব্বলতার অন্যায় দিকটা উত্তরার মনে আর কোন গ্লানি আনিত না। দীপকের সান্নিধ্য এড়ান ত' দূরের কথা, সে এখন তার সঙ্গে বেশী করিয়াই মেলা-মেশা আরম্ভ করিয়া দিল।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া পল্লব উৎসাহের সহিত তার নাটক 'বিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ'-র রিহার্সাল আরম্ভ করিল। তার উদ্দেশ্য নাট্যকলার সাহায্যে সাধারণকে জড়বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া। 'অ আ ক খ'-য় সে দেখাইয়াছে গ্রহ-বিগ্রহের সঙ্গে সূর্য্যের সম্পর্ক, বিদ্যুৎ, কুয়াসা, ঝড় প্রভৃতির তথ্য। উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুট করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও দীপকের গান বসাইয়াছে।

পূর্ণিমায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ মহলা দিতেছে, সূর্য্য—দীপক। চন্দ্র স্থিতধীর স্ত্রী মায়াতরু। সমুদ্র—ভক্টর ভোস। কুয়াসা—শ্রীমতী বাবলা সেন। ঝড়—উত্তরা। মাটী—অনুরাধা রায় (ব্যারিষ্টার রায়ের স্ত্রী) শীত—হেমচন্দ্র (জগন্নাথের ভাগিনেয়)। বসন্ত—ও. কে. ইত্যাদি।

প্রকাশ্যে সময়াভাব বলিয়া জগন্নাথ কোনও ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। আসল কথা, বইখানা সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত সূর্য্যের ভূমিকা দীপক ছাড়া কেহ বলিতে পারিবে না। সে হইবে নায়ক, আর ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করিবে জগন্নাথ, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে না।

অভিনয় লইয়া পল্লব বেশী উৎসাহী হইয়া পড়ায় পূর্ণিমার সভাগুলি আর সেরূপ জমে না। মাঝে দু'টা সভা হইয়া গিয়াছে, একটায় জগন্নাথ একটা হেঁয়ালি পড়িয়াছে আর একটায়—মায়াতরু পড়িয়াছে 'সিণ্ডিক্যালিজম' নামে একটী প্রবন্ধ।

এই সভাকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য-রচনার সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে পল্লবের বন্ধু-বান্ধবরা প্রায় সকলেই। একমাত্র উত্তরা কিছু লেখে নাই।

পল্লবের বিশ্বাস উত্তরা লিখিলে খুব অল্পেই নাম করিতে পারে। জগন্নাথ বলে, তার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন লেখক আছে। তারা লিখিতে অনুরোধ করিলে উত্তরা হাসিয়া বলে, 'নিছক শ্রোতাও দু'এক জন থাকা দরকার।'

আজ 'বিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ' অভিনয়ের দিন। রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা করিয়াছেন শিল্পী ঋষ্যশৃঙ্গ রায়, পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছে সুরুচি পণ্ডিত কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের উপদেশ অনুসারে, গানে সুর দিয়াছেন সুরসমুদ্র উপাধিধারী জনৈক যুবক সুর-শিল্পী।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সে কী উৎসাহ! সকলেই অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে। মানুষ যে আজও সভ্যতার আদিমস্তরের উপরে উঠিতে পারে নাই, তার অন্যতম প্রধান প্রমাণ এখনও রাজা-উজীরের ধড়া-চূড়া পরিয়া বন্ধুদের সামনে উপস্থিত হইতে শিক্ষিত লোকেরা পর্য্যন্ত উৎসাহ বোধ করে।

গৃহস্বামী ও অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই বিত্তশালী, তাই পল্লবের বাড়ীর দরজায় মোটর জড় হইয়াছে অনেকগুলি! শ্রোতারা অনেকেই সাধ্যানুযায়ী চটকদার পোষাক পরিয়াছে, কিন্তু সকলকে টেক্কা দিয়াছে জগন্নাথ। হলে প্রবেশ করিলে প্রথমেই তাকে চোখে পড়ে। মানুষটী বেঁটে হইলেও একটী তেতলা টুপী পরিয়া উচ্চতায় সে প্রায় সকলকে হারাইয়াছে!

ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিলে জলতরঙ্গের বাজনা থামার সঙ্গে সঙ্গে সকলে দেখিল একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রোগ্রামে ছিল জলবালাগণের সূর্য্যস্তব। মাঝখানটায় সূর্য্য বসিয়া আছেন, দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জলবালাগণ। হঠাৎ এই সময় পর পর তিনটা টুপী মাথায় দিয়া চুরুটের মত কি একটা মুখে করিয়া হনুমানটা দক্ষিণ দিক হইতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। জগন্নাথের ভঙ্গীতে গোঁফে তা' দিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া সে নিজের গায়ে টোকা দিতে আরম্ভ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে একটা হাসির হুল্লোড় উঠিল, জগন্নাথের অপরিচিতদের চেয়ে পরিচিতেরাই ইহাতে খুশী হইল বেশী। জগন্নাথও এই হাসিতে যোগ দিল বটে, কিন্তু সে হাসি ছিল বিরক্তি চাপিবারই উপায়ান্তর মাত্র। খানিকক্ষণ পরে মাথা ধরার নাম করিয়া সে উঠিয়া গেল। বন্ধু মহলে কালচারের মাপকাঠীর নিয়ামক জগন্নাথ অভিনয় না দেখায় পল্লব একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কিন্তু অভিনয়ান্তে সকলের প্রশংসা শুনিয়া তার ক্ষোভ কাটিয়া গেল। অনেকেই তার রচনাশক্তির প্রশংসা করিল। সকলেই বলিল দীপকের পাট হইয়াছে অনবদ্য।

কয়েকদিন পরের কথা।

দীপক কাছারী হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইয়া পল্লবের বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় জগন্নাথ আসিয়া উপস্থিত। দীপক বলিল, 'এই যে এস ভাই, কি মনে করে?'

খানিকক্ষণ গল্প করিয়া জগন্নাথ বলিল, 'চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।'

'কোথায় ?'

'যেখানে ইচ্ছে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে মনে হ'ল, আজ তোমার সঙ্গে খানিকটা গল্প করব, তাই এলাম।'

দীপক বলিল, 'বেশ।'

'তোমার গাড়ী আর না নিলে। আমার গাড়ীতেই চল, তোমাকে রেখে যাব'খন।'

গাড়ী খানিকটা গেলে জগন্নাথ বলিল, 'হয়ত' তোমার জন্য পল্বলরা অপেক্ষা করবে।'

'হ্যাঁ, সেখানে যাবাব কথা ছিল।'

জগন্নাথ এবাব আলোচনা আরম্ভ করিল, পল্বলের সম্বন্ধে। বলিল, 'পল্বল লোক ভাল, যাকে বলে অনারেবল ম্যান, বোকাও নয় কিন্তু নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত, রসকসবিহীন। প্রধান অভাব ওর হিউমার বোধের!'

দীপক কোন মতামত প্রকাশ করিল না। জগন্নাথ বলিয়া যাইতে লাগিল 'তুমি যে কী করে ওর সঙ্গে মেশ—এটা আমার বুদ্ধির অগম্য।'

দীপক বলিল, 'আমার কিন্তু ওরূপ মনে হয় না।'

জগন্নাথ একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, 'বেখাপ্পা ধরণের জন্য জীবনটা ওর মাটী হয়ে যাবে।'

'কেন বেশ ত' কাট্‌ছে।'

'আচ্ছা, প্রথমে ধর দাম্পত্য-জীবনের কথা। পল্বল নিজেই সেদিন বলে' গেল উত্তরার মন সে পায় নি।' বলিয়াই জগন্নাথ দীপকেব মুখের দিকে চাহিল।

দীপক তখন একটা ছাদের আলিসার ওপরে কপোত-কপোতীব মান-অভিমানের পালা দেখিতেছে।

জগন্নাথ বুঝিল, দীপকের মনের কথা বাহির করা ততটা সহজ হইবে না। সে একটু পরে বলিল, 'বিয়ে করা পল্বলের উচিত হয় নি।'

দীপক বলিল, 'তর্কের খাতিরে ধরে' নিলুম যে, পল্বলের বিয়ে করা উচিত হয় নি। বিয়ে করার আগে এটা ত' তার বোঝার উপায় ছিল না! কারুরই থাকে না। আর তাছাড়া ঐ মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে বাংলা দেশের অনেকেরই বিয়ে করা উচিত হয় নি।'

জগন্নাথের মনে হইল, দীপকের এই কথায় তার সম্বন্ধে খানিকটা খোঁচা আছে। প্রথমে সে চেষ্টা করিয়াছিল, দীপকের বিরুদ্ধে পল্বলের মনকে বিষাক্ত করিতে; কিন্তু তাহাতে সুবিধা না হওয়ায় দীপককে একটু বাজাইয়া লইল।

জগন্নাথ ভাবিত, একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করিতেছে, পল্বল এবং ও. কে-কে সে এই ভাবেই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিত কিন্তু সে নিজে জানিত যে, ইহা নিছক মিথ্যা।

দীপক মনে করে, জগন্নাথ মানুষটার ধাতই এই যে, পরের সুখ সে সহ্য করিতে পারে না। এই অসহিষ্ণুতাই তাকে চক্রান্ত করিবার উৎসাহ জোগায়। দীপক দু' একবার ভাবে—জগন্নাথকে কড়া কথা শুনাইয়া দিবে, কিন্তু পারে না ; তার সুরুচি—তার ভদ্রতাবোধ বাধা দেয়।

জগন্নাথ দেখিল, আঘাত করিয়াছে ভুল জায়গায়। প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্যই যেন সে বলিল, 'চল খানিকটা বেড়িয়ে সিনেমায় যাওয়া যাক। পথে ডিনার সেরে নেব—ওয়ালেসে।'

দীপক বলিল, 'আমার নিমন্ত্রণ আছে পল্বলের ওখানে।'

'একদিন না গেলে হয় না ?'

'না।'

জগন্নাথ বলিল, 'সেটা তোমার সাধ্যাতীত তা' জানি। কিন্তু একটা কথা পল্বল তোমার বন্ধু—তা স্বীকার কর ?'

'নিশ্চয়।'

'সে তোমায় ভালোবাসে ?'

'হ্যাঁ খুবই বাসে। তুমি বোধ হয় বলতে চাও পল্বলের মতন বন্ধুর স্ত্রীকে ভালবাসা আমার উচিত নয় কেমন, তাই না ?' বলিয়াই দীপক জগন্নাথের মুখের দিকে চাহিল।

জগন্নাথ আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, তবে—'

'তবে'র কিছু নেই, ভাল না বেসে আমি পারি না, তাই বাসি এবং সে কথা পল্বলকে আমি বলেছি।'

জগন্নাথ বিস্মিতভাবে বলিল, 'কী করে বললে তাকে ?'

'বললুম তার সঙ্গে মিথ্যাচার করব না ব'লে।'

'কিন্তু সে ত' আমায় কিছু বলেনি।'

'বলবার প্রয়োজন মনে করেনি বোধ হয় !'

কথাটা যেন জগন্নাথের মুখের উপর একটা চাবুক মারিল।

কিন্তু জগন্নাথ একটু পরে আবার প্রশ্ন করিল, 'উত্তরাও বোধ হয় তোমাকে খুব ভালবাসে ?'

'তাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো।'

'না, না, এটা একটা আলোচনা মাত্র।'

'আলোচনা অনেকক্ষণ করেছি, তা' ছাড়া তুমি আগেও করেছ।'

'আগে ?'

'হ্যাঁ, ও. কে'র সঙ্গে পল্বলের সঙ্গে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে !'

জগন্নাথ চুপ করিয়া রহিল। দীপক বলিল, 'কথার মারপ্যাঁচ না ক'রে—সরল সহজভাবে আমায় বলতে পারতে যে, আমি অন্যায় করেছি।'

'তুমি রাগ করলে দেখছি !'

'রাগ করি নি, কিন্তু এই কথা বলতে চাই যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে, দাঁড়াতে হয় বীরের মতন।'

সেদিন দোলযাত্রা, বেলা নয়টা আন্দাজ—পল্বল বাহির হইয়া গিয়াছিল কি একটা জরুরী কাজে। উত্তরা একতলার পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া আইভ্যান বুনিনের একখানি উপন্যাস পড়িতেছিল। বইখানি তার খুব ভাল লাগিল। লিখিবার কী অসাধারণ শক্তি, আখ্যানবস্তুকে তিনি ফুটাইয়া তোলেন দু একটা সূক্ষ্ম প্রাণস্পর্শী রেখাপাত করিয়া।

উত্তরা পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে পরম আগ্রহের সহিত। তাব চূর্ণ কুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে সূর্যকিরণ-স্নাত আরক্তিম গণ্ডদেশের উপর বাতাসে চুলগুলি একটু একটু নাড়িতেছে।

এই সময় দীপক আসিয়া পকেট হইতে আতর-গন্ধী আবির বাহির করিয়া তার মুখে মাখাইয়া দিলে উত্তরার যেন চমক ভাঙিল। ফাগের গুড়াগুলি ঝরিয়া পড়িল উত্তরার কণ্ঠদেশে, বক্ষে, সুডোল বাহুতে এবং ধবধবে কাপড়ের উপর। দীপকের মনে হইল, ঊষার অরুণিমা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তার সামনে উপস্থিত হইয়াছে উত্তরা নিজেই জানিত না এই সময় তার ব্রীড়াবনত চোখ দু'টি—মুখের সৌন্দর্য্য কতখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

দীপক বলিল, 'এই দিনের প্রতীক্ষায়ই আমি ছিলাম।'

'তুমি পাগল !' বলিয়া একটু হাসিয়া উত্তরা ভিতরে চলিয়া গেল। তার এই প্রথম অপ্রত্যাশিত 'তুমি' সম্বোধনে দীপক খুবই আনন্দ লাভ করিল।

একটু পরে উত্তরা ফিরিল—এক হাতে এক প্লেট খাবার ও অপর হাতে

খানিকটা আবির লইয়া। সে বলিল, 'এবার আমার পালা।'

দীপক মাথাটা আগাইয়া দিলে উত্তরা তার মুখে আবির মাখাইয়া বলিল, 'মিষ্টি খেতে হয়।'

দীপকও আবার তাকে রং মাখাইল, হোলি খেলার অপূর্ব আনন্দ তার কণ্ঠে দিল স্বর, সে গাহিল—

'আমার রঙ লেগেছে চোখে—
রাঙিয়ে দেছে আকাশ বাতাস
হোলির মায়ালোকে !'

উত্তরা বলিল, 'গানের বই ছাপাওনা কেন তুমি ?'

'বিশ্বের দরবারে এগুলিকে নিয়ে যাওয়ার ভরসা আমার নেই, প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করি না। যার উদ্দেশ্যে লেখা তাকে শুনিয়েই এর সার্থকতা।'

উত্তরা হাসিয়া বলিল, 'যদি তার ভাল না লাগে ?'

দীপক বলিল, 'লেখা তখন আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে।

—ছন্দ তখন বন্ধ হবে
বাজবে না আর স্বর
কণ্ঠ হবে বাষ্পে ভরপুর—
ভাষার তখন নাইক প্রয়োজন,
দেবীর যাতে না হয় পূজা—
সঙ্গীতের সে মিথ্যা আয়োজন।'

ঠিক এই সময় পল্লব পিছন হইতে বলিয়া উঠিল, 'কতক্ষণ এসেছ দীপক ?' তার মাথায় ও মুখে আবির, কাপড় জামা রঙে রঙিন।

দীপক কিছু উত্তর করিবার পূর্বেই উত্তরা বলিল, 'বাড়ী ছেড়ে রং খেলতে অন্য জায়গায় গিছলে, এটা তোমার ভারী অন্যায়, কি বলেন দীপকবাবু ?'

স্ত্রী-বুদ্ধির এই অপূর্ব পটুত্বে দীপক বিস্মিত হয়ে গেল বন্ধুত্ব যতই থাক না কেন, পল্লবের অনুপস্থিতে উত্তরার সঙ্গে সে হোলি খেলিয়াছে পল্লব আসিয়া ইহা দেখায় দীপক কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর উপর উত্তরার দাবী প্রকাশের ভঙ্গীতে,দীপক লজ্জা ও সঙ্কোচের হাত হইতে আশু রক্ষা পাইল। মনে মনে সে ধন্যবাদ দিল উত্তরাকে।

স্বামীর ফাগ-রঙীন চুলে আরও খানিকটা আবির চড়াইয়া উত্তরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় গিছলে রং খেলতে ?'

'ফিরবার পথে জগন্নাথের ওখানে গিছলাম, তার ভাই বোনেরা মাখিয়ে দিলে।

'ভাই-বোনেরা কে কে ? কুন্তলা ছিল ?'

'হ্যাঁ ছিল, সে-ই বেশী দিয়েছে রং, ভারী খাসা মেয়ে। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি পড়াশুনোয়ও ভাল। অনেক চিন্তাশীল বড় বড় লোক তার কছে চিঠি লেখেন।'

'একটা কথা বাদ দিয়েছ, বুদ্ধিমতী যেমন, সুন্দরীও সে তেমনি।'

'জগন্নাথরা যতটা মনে করে তত খারাপ নয়!'

তিনজনে মিলিয়া স্নানের পূর্ব্বে আবার হোলি খেলিল, দীপক সমস্ত দিনটাই কাটাইল বন্ধুগৃহে।

পল্বল জগন্নাথের বাড়ী আসিয়াছিল হোলি-খেলার গল্প করিতে। তার সঙ্গে জগন্নাথের কয়দিন দেখা হয় নাই। দীপক যে উত্তরাকে ভালবাসে তার এই স্বীকারোক্তি পল্বলের নিকট বলিবার সে সুযোগ খুঁজিতেছিল। আজ জগন্নাথ সব কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া পল্বল বলিল, 'আমি জানি, দীপক আমায় বলেছে।'

কথাটা সে বলিল ধীর স্থিরভাবে, কিন্তু সমস্ত মনটা তার তখন তোলপাড় হইয়া উঠিল।

এই খবরটা তার জানা ছিল, কিন্তু স্বামীর পক্ষে অন্যের নিকট ইহা শুনিবার যে একটা লজ্জা আছে তাহার পরিচয় এত দিন সে পায় নাই। আজ সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল যে, অন্য জিনিষ হারানোর মতন স্ত্রীর প্রেম হারানো শুধু তার উপর অধিকার-লোপেই পর্য্যবসিত হয় না, তার সঙ্গে সঙ্গে আসে সামাজিক গ্লানি। কিন্তু দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ সে কোন কিছু প্রতিকারের শক্তি তার নাই। সে ভাবিল সহ্য করিতে তার জন্ম সহ্য করিয়াই সে যাইবে।

জগন্নাথের নিকট বিদায় লইয়া সারা পথটা সে উত্তরার কথাই ভাবিতে লাগিল। যে সব জিনিষ এতদিন তার চোখে পড়ে নাই, আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিল তার প্রত্যেকটী খুটিনাটি।

দীপক আসা-মাত্র উত্তরার মনের আনন্দ চোখের মধ্য দিয়া ঠিকরাইয়া পড়ে, গন্ডদেশ আরক্ত হইয়া ওঠে। তর্ক বাধিলে উত্তরা পক্ষ সমর্থন করে দীপকের, দীপকের প্রত্যেকটি গান তার কণ্ঠস্থ! ছোটখাটো এমন আরও অনেক কথা সে আজ ভাবিল ; যাহা দু'দিন আগে মনে পড়িলে পল্বল নিজেই লজ্জিত হইত।

আজ কয়েকদিন যাবত পল্বল শুধু ভাবে এ অবস্থায় 'কালচারড' লোকেরা কি করে ; নিজের তার কি করা উচিত, উত্তরার সঙ্গে কতখানি দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলা তার পক্ষে শোভন !

বই তার অনেক পড়া আছে, সেই সব বইতে সে দেখিয়াছে—কালচারড নায়কেরা এই ব্যাপারে সাধারণত উপেক্ষার ভাবই দেখায়।

পল্বল স্থির করিল সেইরূপ ঔদার্য্য বজায় রাখিয়া চলিবে, সব ভুলিয়া ডুবিয়া থাকিবে বিজ্ঞানের রহস্যের মধ্যে।

সামনে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত বই, লাল-নীল কালির দোয়াত,নানা রকমের কলম ও পেন্সিল, টেষ্ট-টিউব, ফানেল, প্রভৃতি যন্ত্রপাতি। এই সকলের মধ্যে পল্বল বসিয়া থাকে, পাশে থাকে সেই বানরটা। পল্বল একবার তার গায়ে হাত বুলায়, একবার একটা বইয়ের দু'-চার লাইন পড়ে, আবার জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে, কি যেন ভাবিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে, চুরুটটা নিভিয়া যায়।

কোন কাজেই মন বসে না, শুধু ভাবে দীপক ও উত্তরার কথা। বাহিরে মুক্ত আকাশের তলে বসিয়া তারা গল্প করিতেছে, উপভোগ করিতেছে জীবনের মাধুর্য্যকে ; আর সে কি-না বন্ধঘরে একটা বানর লইয়া বসিয়া আছে—কতকগুলি নিষ্প্রাণ সাজসরঞ্জামের মধ্যে ?

উত্তরা আসিয়া একবার ডাকিয়া যায়, খানিকক্ষণ পরে চাকর আবার তাগিদ দেয়, 'চা'র জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল, বাবু।'

পল্বল তার দিকে চাহিয়া অর্থহীনভাবে বলে, 'তাই ত।

সে ভাবে বিবাহিত জীবনের কথা, তার মনে হয় দাম্পত্যজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিশাপই এই যে, একপক্ষ যত বেশী করিয়া চায়, অপর পক্ষের কৃপণতা তত বাড়ে।

পূর্ব্বে সে ভাবিত,হিন্দুসমাজে দাম্পত্য-জীবনের সমস্যা কম,যুগপরম্পরাগত শিক্ষা ও সংস্কারবশে হিন্দুনারী দিয়াই তৃপ্ত কিন্তু আজ দেখে—সত্যকার প্রেম যেখানে নাই, সমাজের কৃত্রিম বাধা সেখানে সত্যকে রূঢ়ভাবে নিষ্পেষিত করিয়া একটা অনর্থের সৃষ্টি করে মাত্র।

কোন দিন বা সন্ধ্যায় পল্বল একটা 'কিমোনো' গায়ে দিয়া পড়ার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়ায়। চুরুট টানিতে টানিতে উত্তরা ও দীপকের দিকে তাকায়, দেখে তারা বেশ স্বচ্ছন্দেই গল্প করিতেছে। তার অভাব ত' তারা বোধ করে না।

পল্লব ভাবে, যাক, ওদের বিরক্ত করিয়া কাজ নাই।

দীপক সেদিন বলিল, 'প্রায়ই তুমি অজুহাত দাও মাথা ধরার; অথচ সমস্ত সন্ধ্যেটা ঘরে বসে থাক। শরীরের দিকে একটুও নজর দাও না।'

'ব্যস্ত আছি একটা জটিল সমস্যা নিয়ে।'

সে দিনও পল্লবের মাথা ধরিয়াছিল, মুক্ত বাতাসে মাথাটা একটু ছাড়িলে সে দীপককে বলিল, 'একটা গান গাও!'

পূর্বে পল্লব ব্যস্ত থাকিত 'পূর্ণিমা' লইয়া আজকাল সে সম্বন্ধে কোন উৎসাহই তার নাই।

পূর্ণিমা-মিলনে'র অধিবেশন না হওয়ায় ধীরে ধরে সে বন্ধুমহল হইতেও তফাৎ হইয়া পড়িল। তার উপর মাঝে মাঝে কানে আসিতে লাগিল উত্তরা আর দীপকের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে আত্মীয়-বন্ধুদের টিপ্পনী। এইসব নানা কারণে, পল্লবের কেমন যেন অরুচি জন্মিয়া গেল নিজের উপর, সংসারের উপর, সমাজের উপর।

কয়েকদিন পরের কথা। পল্লব একদিন দীপক ও উত্তরাকে বলিল, 'আমি এলাহাবাদ যাব স্থির করেছি।'

উত্তরা বলিল, 'কেন?'

'রিসার্চ সম্বন্ধে কিছু কাজ আছে।'

দীপক বলিল, 'কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদ?'

'হ্যাঁ, ডক্টর সাহা-ই সে সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অথরিটি। তাঁর কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করতে হবে। তাঁকে লিখেছিলাম, তিনি সম্মত হয়েছেন সাহায্য করতে।'

'থাকবে কতদিন?'

'অন্ততঃ মাস ছয়েক।'

উত্তরাকে কি বাপের বাড়ী পাঠাবে?'

'না, এখানেই থাকবে।'

'একা?'

'চাকর-বাকররা রইল, তার উপর তুমি দেখা-শুনা করবে।'

উত্তরা বলিল, 'সেটা কি সুবিধে হবে?'

পল্লব বলিল, 'কেন হবে না?'

সে ভাবিয়াছিল তার এই প্রস্তাবে তারা আপত্তি করিবে দু'একদিন অপেক্ষাও করিল সেই আশায়।

কিন্তু বেচারীকে নিরাশ হইতে হইল। শেষটায় একদিন যাত্রার সব ব্যবস্থা করিয়া সে দীপককে বাড়ীভাড়া ও অন্যান্য টাকা আদায় সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিল। আর দিল তার হইয়া চেক ও অন্যান্য দলিল-পত্র স্বাক্ষর করিবার আমমোক্তারনামা।

প্লাটফরমে বেশ ভিড়, ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী তিন ভাষাতেই কথোপকথন চলিতেছে। সকলেই আসিয়াছে দূরযাত্রী প্রিয়জনের নিকট বিদায় লইতে। পল্লব সাহেবী পোষাক পরিয়া একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে দাঁড়াইয়া পাশেই উত্তরা ও দীপক।

প্রথম বেল বাজিলে একজন পরিচিত লোককে দেখিয়া দীপক বলিল, 'আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।'

পল্লবের গাড়ীতে উঠিয়াছিল একটী বাঙালী যুবক—গলায় তার ফুলের মালা। তাকে তুলিয়া দিতে একদল বন্ধু-বান্ধব আসিয়াছিল, সঙ্গে ছিলেন একটী প্রৌঢ় ও একটী প্রৌঢ়া, সম্ভবতঃ তার পিতা-মাতা।

যুবকটী বন্ধুদের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়ার পদধূলি লইয়া আগাইয়া গেল একটী তরুণীর দিকে।

সুন্দরীর চোখ দুইটি ছল ছল করিতেছিল যুবকটী নিকটে গেলে তরুণীর হিম-শুভ্র গণ্ডের উপর দুইটী মুক্তার দানা গড়াইয়া পড়িল।

যুবক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তার মুখ মুছাইয়া দিলে, মেয়েটীব মনের আবেগ ছাড়া পাইয়া গণ্ডদেশ প্লাবিত কবিল।

যুবকটী বলিল. 'ছিঃ, ডার্লিং!'

মেয়েটীর উত্তর শোনা গেল না।

দাম্পত্য জীবনের ছোট্ট এই ছবিটুকু দেখিয়া পল্লবের মন অভাবের বেদনায় টন টন করিয়া উঠিল। সে উত্তরার দিকে চাহিয়া দেখিল, আসন্ন বিরহের কোন কাতরতার চিহ্নই নাই তার চোখে!

পল্লব ধীরে ধীরে গিয়া গাড়ীতে উঠিল, জানালার পাশে দাঁড়াইযা উত্তরা

স্বামীর প্রসারিত হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল, 'সাবধানে থেকো আর রোজ চিঠি লিখো।'

গার্ডের বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে দীপকও ছুটিয়া আসিল বিদায় লইতে।

মৃদু চলমান গাড়ী হইতে বন্ধুর সঙ্গে কর মর্দ্দন করিয়া পল্বল বলিল, 'আমি চললাম, উত্তরাকে দেখো।'

পল্বল ও তার সঙ্গী যুবকটী যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানালা ও দরজার ফাঁকা দিয়া রুমাল উড়াইল! পল্বলের কম্পার্টমেণ্ট পুলের তলায় পেঁছিলে, দীপক ও উত্তরা পরস্পরের হাত ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

গাড়ী অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলে পল্বল বার্থের উপর বসিয়া পড়িল। তাব মনে হইল বাহিরের এই অন্ধকার তার জীবনেরই প্রতীক! সে ছুটিয়া চলিয়াছে অন্ধকারের অজানা রাজ্যে।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি বিলেত যাচ্ছেন?'

'না, এলাহাবাদ'

যুবক বলিল, 'ওঃ।'

তার অর্থ এই যে, এলাহাবাদ-গামীর আবার এত কাতরতা কেন, এলাহাবাদ ত' ঘরের কোণে!

গাড়ী হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অন্ধকারের মধ্যে। গতিবেগে লোহার লাইন যেন চিরিয়া যায়; মাঝে মাঝে এক একটা প্লাটফরমের বুক কাঁপাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে গোটা কয়েক আলো পিছনে ফেলিয়া ট্রেন ছোটে।

যাত্রীরা দু'জনেই নীরব। পল্বল ভাবিতেছিল উত্তরা ও দীপকের কথা। উত্তরাকে পেঁছাইয়া দিয়া দীপক হয়ত এতক্ষণ বাড়ী গিয়াছে।

উত্তরা হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—হয়ত বা কিছু পড়িতেছে অথবা ভাবিতেছে না তাহা অসম্ভব, উত্তরার মনে যদি তার কোনও স্থান থাকে সেটা বন্ধুত্বের আসন, এক সঙ্গে এক বৎসর জীবন যাপন করিবার ফল। তার বেশী কিছু নয়।

একটা একটা করিয়া কত কথাই তার মনে হইল। জগন্নাথের সাবধান-বাণী, জ্ঞাতিদের চাপা ইঙ্গিত কিন্তু যে যাহাই বলুক না কেন—দীপক ভদ্রলোক।

ট্রেণ বর্দ্ধমান পেঁছিল।

'চা, চাই বাবু, গরম চা', 'বর্দ্ধমানের সীতা-ভোগ, মিহিদানা', 'চাই পান বিড়ী-দেশলাই' প্রভৃতি কলরবে পল্বলের যেন চমক ভাঙ্গিল। সে ইতিমধ্যে দুইটা চুরুট পোড়াইয়াছে, চুরুটের রাশিকৃত ছাই পড়িয়াছে জামা ও কাপড়ের উপর।

কাপড় জামা ঝাড়িয়া সে চাহিল প্লাটফরমের দিকে ; ষ্টেশনগুলি যেন ঘুমন্ত পারিপার্শ্বিকের প্রতিনিধি, তারা জাগিযা আছে নবাগতকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য।

গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিলে শায়িত সহযাত্রী যুবককে পল্বল বলিল. 'আপনি খুব ভাগ্যবান পুরুষ, অমন স্ত্রী আপনার' বলিযা প্রথম আলাপের এই ধরণটা তার নিজের কাছেই বিসদৃশ ঠেকিল।

যুবকটি বলিল, 'আপনি আরও বেশী ভাগ্যবান।'

স্ত্রীকে সুন্দরী বলিলে নববিবাহিত মাত্রেই খুশী হয, আগে পল্বলও হইত। উত্তরার সৌন্দর্য্যে সে গর্ব্ব বোধ করিত। কিন্তু অপহৃত ধনের মালিকানার প্রশংসা শুনিলে মানুষের মনের যে অবস্থা হয়, আজ তার অবস্থা হইল অনেকটা সেইরূপ।

একটু পরে সে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কোথায় যাবেন ?'

'ইংল্যান্ড।'

'কত দিন থাকবেন ?'

'যাচ্ছি ব্যারিষ্টারি পড়তে, ঠিক ঠিক মত পাশ করতে পারলেও তিন বছর, না হলে আরও বেশী।' পল্বল ভাবিল, কেমন করিয়া দয়িতকে ছাড়িয়া মানুষ এতদিন দূরে থাকিতে পারে ?

উত্তরাকে সে ভালবাসে, আজ এই ছাড়াছাড়ির পর যেন সে প্রেম আরও বাড়িয়া গিয়াছে ! হয়ত বাড়িয়াছে প্রতিদান না পাইয়া।

কিন্তু সে জন্যই বা সে এত কাতর কেন ? ব্যর্থ প্রেমে কত মানুষের জীবনই ত' মরুভূমি হইয়াছে—কত সুধীর, কত জ্ঞানীর, কত নরপতির।

তবে এই বিফলতা আর একদিক দিয়া অনেকেরই শক্তি-বিকাশে সহাযতা করিয়াছে। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে মানুষের যত দান, তার অনেকগুলিই ব্যর্থ-প্রেমের ফল। দান্তের বিয়াত্রিচের মত কত নারী হয়ত প্রেরণা জোগাইয়াছে, কত অপূর্ব্ব শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির।

কত ছবিতে - কত গানে - কত মহাকাব্যে ফুটিযা উঠিয়াছে ব্যর্থ প্রেমিকের মনের আকুতি।

ট্রেণ প্লাটফরম ছাড়াইয়া অন্ধকারে মিলাইয়া যাওয়ার পর দীপকের কানে শুধু বাজিতে লাগিল পল্লবের বিদায়-বাণী,

'আমি চললাম, উত্তরাকে দেখো।'

সারাটা পথ সে উত্তরার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথা বলিল না। তাহাকে বাড়ীতে নামাইয়া রাখিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে গাড়ী চালাইয়া দিল। এপথে-ওপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেলেঘাটার পুল পর্যন্ত পেঁছিয়া চলিল সোজা পূর্ব দিকে।

রাসমণির বাজারের পর পল্লীটা বিরল-বসতি, চারিদিক বেশ ফাঁকা, যত আগাইয়া যাওয়া যায় মন ততই পায় মুক্তির আস্বাদ!

গাড়ী থামিল নূতন খালের ধারে। গাড়ী হইতে নামিয়া দীপক খাল-পারে বসিল। উপরের দিকে চাহিয়া তার মনে হইল আকাশ যেন ভরিয়া উঠিয়াছে অসীম বেদনায়!

দীপকের এ দৈন্য কিসের? জীবনের যে অধ্যায় আজ শুরু হইল, তার প্রত্যেকটী ভাবী অনিশ্চিত পদক্ষেপের কথা ভাবিয়াই সে কি কাতর হইয়াছে? অথবা এটা কি একটা সাময়িক অবসাদ? আজ সামান্য কিছুতেই সে চমকিত হয়। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রির পাখীর ডাক, মাছের নিঃশ্বাস হইতে উত্থিত জলের বুদ্বুদের শব্দে তার কানখাড়া হয়।

সে অবসন্ন মনে চাহিয়া থাকে দক্ষিণ-পূর্বের বিলের বিশাল জলরাশির দিকে। তার প্রাণটা ধীরে ধীরে গুঞ্জরিয়া ওঠে। সে গাহিতে আরম্ভ করে—

ব্যথা হয়ে ওঠো তুমি মনের মাঝারে
ও দেব মনের মাঝারে ;
ব্যথার পালে চলে তরী
অকূল পাথারে।
আমার ব্যথার তরী বেয়ে চলি
অকূল পাথারে।
সুর জানে না চলার ধরণ,
রূপ জানে না জীবন মরণ,
ছুটি কেবল ছোটার বেগে
অকূল আঁধারে।
জানে না মন ধায় সে কোথায়—
চায় সে কাহারে।

কয়েকদিন পরে, দীপকের মনের এই দৈন্যটা কাটিয়া গেল। প্রত্যহই বৈকালে সে পল্লবের বাড়ী যায়, ফেরে রাত ন'টা-দশটা করিয়া।

কোন দিন সে ও উত্তরা দু'জনে বসিয়া গল্প করে, কখনও বা গান গায়, কোন দিন বা যায় সিনেমায়। ইতিমধ্যে কয়েকদিন মোটর-ট্রিপও দিয়াছে।

উত্তরার বাপ আসিয়া মাঝে মাঝে তাকে লইয়া যান, অনিচ্ছায় সে পিত্রালয়ে যায়, আবার ফিরিয়া আসে দু'একদিন পরেই! এই দু'টা দিনই দীপকের যেন আর কাটে না!

একটা নেশা তাদের পাইয়া বসিল, যে নেশায় অতীত ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার মানুষের অবকাশ থাকে না, যখন মনে হয় বর্ত্তমানই যেন সব।

দীপকের চরিত্রে আগে লুকোচুরি বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না; সে জানিত না মিথ্যাচার কাহাকে বলে। উত্তরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে অবলম্বন করিয়া লজ্জা ও সঙ্কোচের বশে ক্রমে ক্রমে এই গোপনতা তাকে আশ্রয় করিল। রাত্রে বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইলে, সে জননীর প্রশ্নের উত্তরে সোজাসুজি মিথ্যাকথা না বলিলেও উত্তরটা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করে।

সেদিন ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গার ধারে বাঁধের উপর বসিয়া দীপক গান গাহিতেছিল, উত্তরা বাজাইতেছিল সেতার।

সামনে গঙ্গার বিরাট জলরাশি চাঁদের আলোয় ঝক ঝক করে, ওপারের সীমা-রেখা স্বপ্নরাজ্যের ছায়ার মত অস্পষ্ট মনে হয়।

সমুদ্রগামী একখানা জাহাজ উজান বাহিয়া আসে, জাহাজের ফানেল হইতে সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁযা ওঠে, ফানেল যেন উদ্‌গীরণ করে সভ্যতার বিষ!

খানিকক্ষণ পরে দীপক বলিল, উত্তরা, বলতে পার জীবনের সার্থকতা কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'আমিও জানি না, তাই জিজ্ঞেস করলাম; তবে একটা কথা প্রায়ই মনে হয় কিছুই ত' পাই নি।'

উত্তরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, 'কেন?'

তার হাত চাপিয়া ধরিয়া দীপক বলিল, 'ভুল বুঝো না তুমি আমায়।'

উত্তরা নীরব সে বরাবরই লক্ষ্য করিয়াছে, দীপকের মনে মাঝে মাঝে এইরূপ বিতৃষ্ণার ভাব জেগে ওঠে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন কিছুতেই মন তার বসে না।

কিন্তু এ বিতৃষ্ণা কিসের?

দীপক বলিল, 'বড় ছোট হয়ে যাচ্ছি দিন দিন।'

উত্তরা তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিল।

দীপক বলিল, 'আমি মিথ্যাচারী হয়ে পড়েছি।'

উত্তরা মনে করিল, দীপক তাকে ভালবাসাটাই অন্যায় মনে করে। আর এই অন্যায়ের বোধ তাকে পীড়া দেয়। ইহাতে উত্তরার দুঃখিত হইবার কথা ; কিন্তু সে মুখে কিছুই প্রকাশ করিল না।

দীপক বরাবরই রাত করিয়া বাড়ী ফেরে। এ জিনিষটা রাজেশ্বরীব সহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু পল্বল এলাহাবাদ যাওয়ার পর হইতে. কেমন যেন তাঁর আশঙ্কা হইতে লাগিল। ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করিয়া লইলেন, খানিকটা জানিলেন অনুসন্ধান করিয়া।

সে দিন দীপক বাড়ী ফিরিলে রাজেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় গিছলে ?'

'ডায়মণ্ডহারবার '

'সঙ্গে উত্তরা ছিল ?'

দীপক নিরুত্তর।

মা বলিলেন. 'এটা কি ঠিক হচ্ছে ?'

দীপক কোনও জবাব দিল না।

রাজেশ্বরী পুত্রের আচরণে দিন দিনই ক্ষুব্ধ হন। সে তাঁর একমাত্র সন্তান। দীপকের সম্বন্ধে কত আশাই না তিনি পোষণ করিতেন. আর সে কি-না আজ এই ভাবে ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

উত্তরাকেও রাজেশ্বরী ভালবাসিতেন। সে কয়দিন তাকে রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া শুনাইয়াছিল, রাজেশ্বরী ভাবিতেও পারেন নাই আজকালকার কোন মেয়ে এত সুন্দর করিয়া ঐসব বই পড়িতে পারে। সেই উত্তরার আচার-ব্যবহার আজ তাঁকে মর্ম্মাহত করিল। তিনি ভীত হইলেন তার ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া। পুরুষ মানুষ বলিয়া দীপককে হয়ত সমাজ ক্ষমা করিবে, কিন্তু উত্তরার ত' দুঃখের সীমা থাকিবে না!

তারপর পল্বলটাই বা কি বোকা! স্ত্রীকে কি না রাখিয়া গেল একজন যুবক বন্ধুর রক্ষণায় ? বাপের বাড়ী পাঠাইল না কেন ? এমন মুখ্খুও থাকে!

রাজেশ্বরী একবার ভাবেন, পল্বলকে সব কথা খুলিয়া লেখেন, কিন্তু তার

উপর তিনি আস্থা হারাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এ সম্বন্ধে তাকে লিখিয়া কোনই ফল হইবে না। তার চেয়ে উত্তরাকে সব কথা বুঝাইয়া বলা ভাল। সে বুদ্ধিমতী, নিজের ভাল-মন্দ বিচার করিবার তার ক্ষমতা আছে।

প্রায়ই পল্লবের চিঠি আসে, একই খামে থাকে উত্তরা ও দীপকের চিঠি।

প্রথম কয়েকখানায় ছিল এলাহাবাদের বর্ণনা, যুক্ত-প্রদেশে নেহেরু পিতা-পুত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি, মালব্যের প্রতি আপামর সাধারণের শ্রদ্ধার কথা।

অন্য বড বড় শহরের মতন এখানেও বিশ্ববিদ্যালয় আছে, হাইকোর্ট আছে, সাহেব-পাড়া বা কর্ণেলগঞ্জ আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম, পুরাণকেল্লা এবং নদীতটের বালুসমুদ্র। বালু-সমুদ্রের উপর শুইয়া শুইয়া কত সময় সে কাটাইয়া দেয়! যায় সন্ধ্যায়, ফেরে বেশী রাত্রে।

আর তার ভাল লাগে বাঙ্গালী-পাড়া। এই অঞ্চলটাকে প্রবাসী বাঙ্গালীর কলোনী বলা যায়। পুরুষানুক্রমে তারা এখানে আছে তাদের বাঙ্গালী ধরণ-ধারণের সঙ্গে খানিকটা খোট্টাই ভাব, হিন্দুস্থানী ধরণে বাঙ্গলা উচ্চারণ, হিন্দী-মিশ্রিত বাঙ্গলা ভাষা নবাগত বাঙ্গালীকে বড় আনন্দ দেয়।

পল্লবের সৌভাগ্যক্রমে কি একটা স্নান উপলক্ষ্যে এই সময় বহু সাধু ত্রিবেণী-সঙ্গমে সমবেত হইলেন। কৌপীনবন্ত এই দলের সঙ্গে স্নানার্থে উপস্থিত হইল লক্ষ লক্ষ গৃহী।

পল্লব লিখিল,

'হিন্দুর সত্যকাবস্বরূপ দেখলাম গঙ্গাতীরে যখন কাতারে কাতারে স্নানার্থী এসে জলে ডুব দিল, 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব' 'জবাকুসুমসঙ্কাশং' ব'লে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করল। এইটেই হচ্ছে, আমাদের খাঁটি হিন্দুজাতি। বালীগঞ্জের যে সমাজে আমরা বাস করি, সেটা হিন্দু-সমাজ নয়, সেটা ইউরোপীয় সমাজের অতি নিকৃষ্ট উচ্ছিষ্ট সংস্করণ।

'ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে 'অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ব' বলে আমাদের ঠাট্টা করেন, তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কোন কোন দেশী পণ্ডিতও আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে আরশুলার অস্তিত্বের তুলনা করেছেন; কিন্তু এই পণ্ডিতরা জানেন না যে কি তাঁরা চান!

'সমাজের সংস্কার দরকার, কিন্তু সেটা ইউরোপের অনুকরণে নয়, তাই ইংরেজ-যুগে যতগুলি সংস্কার হয়েছে—কোনটাই জাতির মর্ম্ম স্পর্শ করতে পারে নি।'

প্রথম প্রথম চিঠিতে পল্বল এই সব সাধারণ খবরই দিত, কখনও কখনও বিজ্ঞান আলোচনার খবরও থাকিত।

কিছুদিন হয় পল্বলের পরিচয় হইয়াছে একটী তামিল তরুণীর সহিত। আজকাল প্রায় প্রত্যেক পত্রেই থাকে তার কথা! মেয়েটী একজন ফাইন্যান্স অফিসারের কন্যা। বি-এ পাশ দেখিতে সুশ্রী। এই তরুণীর বাড়িতে মাঝে মাঝে পল্বলের নিমন্ত্রণ হয়। কখনও মেয়েটীর সঙ্গে সে বেড়াইতে যায়।

কয়েকখানা চিঠির পর একখানা চিঠিতে পল্বল লিখিল, 'জগন্নাথ বলত' আমার বিয়ে করা উচিত হয়নি।' তোমরা ভাবতে যে সব গুণ না থাকলে বিয়ে করা উচিত নয়, আমার সে সব গুণ নেই, আমারও সেই ধারণাই ছিল কিন্তু সে ভুল মিস আয়েঙ্গার ভেঙ্গে দিয়েছে। স্ত্রীর ভালবাসা আমি পাইনি শুনে সে বিস্মিত হয়েছে। সে সেদিন বললে, 'You are just the youngman a girl can covet. (তোমার মত যুবককেই মেয়েরা বেশী ক'রে চায়।)।' এই সংবাদে উত্তরা রাগিয়া গেল। একটী বিদেশী মেয়ের কাছে নিজেকে ও স্ত্রীকে এমন করিয়া খাটো করিবার কি প্রয়োজন ছিল? উত্তরা স্থির করিয়াছিল, একটা কড়া জবাব দিবে। কিন্তু দীপক নিষেধ করিল বলিল, 'তাঁর মনের দিকটাও তোমার বিচার করে দেখা উচিত?'

একদিন সকালে উত্তরা টেবিল-হারমনিয়ম বাজাইয়া দীপকের একটা গানের সুর ঠিক করিতেছিল, এমন সময় রাজেশ্বরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে শশব্যস্তে তাঁর পদধূলি লইয়া বলিল, 'শুনেছিলাম আপনার শরীর ভাল নেই, মা?'

রাজেশ্বরী বলিলেন, 'হ্যাঁ, বাতে ধরেছে, তার ওপর নিঃশ্বেসের কষ্ট আছে।'

ঘরে 'ফ্যান' না থাকায় উত্তরা তাড়াতাড়ি একখানা হাত-পাখা আনিয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল।

সে তাঁর আসার কারণ অনুমান করিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল —অপ্রীতিকর কোন আলোচনা হইবে। হইতও হয়ত।

রাজেশ্বরীরও সঙ্কল্প ছিল, তার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিবেন, উপদেশ দিবেন এবং তাকে বুঝিতে দিবেন যে, তার ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

কিন্তু উত্তরার মধুর 'মা' সম্বোধন ও আপ্যায়নে প্রথমেই তাঁর সুর নরম হইল। তিনি বলিলেন, 'অনেক দিন যাও না, তাই দেখা করতে এলুম।'

উত্তরা বলিল, 'মেয়েকে ডেকে পাঠালেই হ'ত!'

রাজেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, 'মেয়ের কাছে আসার সময় মা'র অত কি বাছ-বিচার থাকে?'

উত্তরা তাঁকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত, সে জানিত—রাজেশ্বরীও এক সময়ে তাকে কতটা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই আজকের দেখা শুনার শুভ উদ্বোধনে সে খুশী হইল। সে খানিকটা পরে বলিল, 'আজ না খেয়ে যেতে পারবেন না কিন্তু, আমি বাড়ীতে খবর পাঠাচ্ছি।'

'না, না, আমার এখনও পুজো-আহ্নিক হয় নি, তাছাড়া তিথির বাছ-বিচার করে আমি চলি।'

'পুজার জোগাড় আমি এক্ষুণি করছি; আর পাঁজী এনে দিচ্ছি—আপনি বলে' দিন কি কি খাওয়া আজ আপনার নিষেধ।'

'আর একদিন হবে, আমি এসেছিলাম একটা কথা বলতে।'

'বেশ, কিন্তু আমার ভারী ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে রেঁধে খাওয়াব, যেতে দেব না আপনাকে আমি।'

'না' বলা চলিল না। উত্তরা তাঁর পুজোর জোগাড় করিয়া দিয়া সেদিনকার তিথির নিষিদ্ধ জিনিষগুলির নাম জানিয়া লইয়া রান্নার জোগাড়ে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে রাজেশ্বরী পুজা সারিয়া উঠিতেই উত্তরা তাঁকে জল খাবার দিল।

রান্না শেষ হইল বারোটার পর। রাঁধিল নানা প্রকার ব্যঞ্জন, ছানার ডালনা, পায়েস, রস বড়া।

রাজেশ্বরী বলিলেন, 'বেলা হয়ে গেল, তুমিও পাশে বসে' খাও, ঠাকুর দেবে খন।'

উত্তরা বলিল, 'না মা, আমি নিজে পরিবেশন করব।'

উত্তরার খাওয়ার সময় রাজেশ্বরী সামনে বসিয়া স্বামী ও পুত্রের গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। ছেলে-বেলা হইতেই দীপক খুব সাহসী। অন্য ছেলেরা পুলিশ দেখিলে ভয়ে পালায়, সে চার-পাঁচ বছর বয়সেই পুলিশ দেখিলে তার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিত। স্কুলে সে ছিল সব চেয়ে বলবান, সব চেয়ে সাহসী, আবার পড়াশুনায়ও সকলের সেরা—মাষ্টাররা বলিতেন, ও হবে একটা খুব নাম-জাদা লোক।

জননী একমাত্র পুত্রের প্রশংসা করিতেছিলেন, তরুণী শ্রোতা শুনিতেছিল—প্রেমাস্পদের অপরিচিত জীবনের, বিশেষ করিয়া শৈশবের গল্প। বক্তার বলিবার ও শ্রোতার শুনিবার উৎসাহ উভয়েই সমান, তাই গল্প চলিল দীর্ঘ সময়। তবে পাছে কোনরূপ অশোভন আগ্রহ প্রকাশ পায় তাই উত্তরা কোনও কথা না বলিয়া মাথা নীচু করিয়া খাইতে লাগিল।

রাজেশ্বরী বলিলেন, 'একটী অপরিচিত ছেলেকে বাঁচাবার জন্য ষ্টীমারের দোতলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া—কতটা সাহসের কথা বল দেখি ?'

উত্তরার খাওয়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন, 'আমাকে একটু রামায়ণ পড়ে শোনাও। তোমার পড়া, আমার বেশ মিষ্টি লাগে।'

উত্তরা একটার পর একটা করিয়া এমন ভাবে তাঁকে ব্যাপৃত রাখে যে আসল প্রসঙ্গটাই ঢাকা পড়িয়া যায় !

শেষটায় সন্ধ্যার খানিকটা আগে, গাড়ীতে উঠিবার সময় রাজেশ্বরী বলিলেন, 'আমার যদি মেয়ে থাকত তাকেও তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারতুম না।'

উত্তরা বলিল, 'তা জানি মা।'

'তাই বলছিলাম দীপকের সঙ্গে অতটা মেলামেশা তোমাদের কারও পক্ষে ভাল নয়।'

উত্তরা মাথা নত করিয়া রহিল।

রাজেশ্বরী আবার বলিলেন, 'সে আমার ছেলে. তোমাকেও খুব স্নেহ করি তাই বলছিলাম –'

তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল : চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'বল, অতটা মেলামেশা বন্ধ করবে ?'

উত্তরা ধীরে ধীরে বলিল, 'হ্যাঁ, মা।'

রাজেশ্বরী তার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, 'এই ত' আমার মেয়ের মতন কথা।'

সন্ধ্যার পরেই দীপক আসিয়া বলিল, 'মা বোধ হয় এসেছিলেন আমার সম্বন্ধে তোমাকে সতর্ক করতে।'

'হ্যাঁ।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কি বললে তুমি ?'

বললুম, 'তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমিয়ে দেব।'

'ওঃ' বলিয়া দীপক চুপ করিল।

উত্তরা যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যই বলিল, 'অমন দেবতার মত মানুষ তিনি, তাঁর আদেশ—'

রাজেশ্বরীর এই আগমনের খানিকটা ফল হইল। আজ-কাল তাহারা বড় একটা সিনেমায় যায় না, লম্বা মোটর-ট্রিপও বন্ধ! রাত নয়টা বাজিলেই উত্তরা বলে, 'এইবার বাড়ী যাও, মা ভাবছেন।'

দীপক বলে, 'তুমি যে দেখছি, আমার চেয়েও তাঁর বেশী বাধ্য হয়ে উঠলে।'

উত্তরা ও দীপকের প্রথম পরিচয়ের এক বৎসর পূর্ণ হইতে আর দুই দিন বাকী। দীপক বলিল, 'আমাদের আলাপের একটা বার্ষিক উৎসব করতে চাই। ঠিক গত বৎসরের প্রোগ্রামের পুনরাবৃত্তি।'

উত্তরা বলিল, 'বেশ।'

দু'জনে প্রোগ্রাম করিতে বসিল।

স্থির হইল, রাত্রি নয়টার শো'তে উভয়ে গত বৎসরের সেই সিনেমায় যাইবে, ইনটারভ্যালে লাউঞ্জে বসিয়া চা খাইবে, তারপর যাইবে বজবজ।

কিন্তু প্রোগ্রামের সবটাই মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রথমে তারা হতাশ হইল ছবি দেখিয়া,গত বৎসরের বইখানা ছিল অনবদ্য। এবার দেখিল বহুল বিজ্ঞাপিত খেলো একখানা বাঙ্গালা বই।

ইণ্টারভ্যালে লাউঞ্জে বসিয়া দীপক বয়কে এক কাপ চা ও কাটলেট দিতে বলিলে, উত্তরা বলিল, 'এক কাপ কেন?'

'আমি খাব না।'

'কেন গত বছর খাওনি বলে? কিন্তু তার সঙ্গে সবটা মেলানো ত' অসম্ভব, গত বছর আমি ছিলাম তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আর আজ?'

দীপক বলিল, 'আজও তাই।'

উত্তরা বলিল, 'তা বেশ, কিন্তু চা তোমাকে খেতেই হবে।'

উত্তরা এই এক বৎসরে ছুরি-কাঁটা ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেও দীপক কিন্তু নিয়ম রক্ষার জন্য গতবারের মতন তার কাটলেট কাটিয়া দিল।

বায়স্কোপের পর তারা চলিল বজবজ।

সেবার চাঁদের আলোয় মাঠ ঘাট সব রূপার পাতের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

আজ সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে অল্প বৃষ্টি ও হইয়া গিয়াছে। আকাশে একটিও তারা নাই।

রাত দশটার পর হইতেই বাতাস বন্ধ, কেমন যেন একটা জমাট ভাব। যে কোনও সময়ে দুর্যোগ আরম্ভ হইতে পারে।

কিন্তু অনাগত দুর্যোগকে ভয় করিলে ত' য়্যানিভার্সারি করা চলে না। এমন একটা দিন দীপক কিছুতেই নষ্ট হইতে দিবে না।

এবারও ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে পল্লীগ্রামের নীরব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দু' একখানা সব্জী-বোঝাই গরুর গাড়ী কলিকাতার দিকে চলিয়াছে, দীপকের গাড়ী তাদের পাশ কাটাইয়া ছোটে।

এবারও একটা গান শোনা গেল, তবে গানটা সব্জীর গাড়ীর উপর হইতে নয়, একটা ভাঙ্গা ঘরের সামনে গাঁজার কলিকা টানিতে টানিতে কে একজন গাহিতে-ছিল, কালোয়াতি গান।

বেহালা হইতে প্রায় দশ মাইল যাওয়ার পর হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া ছাড়িল। গাছপালার মধ্য দিয়া দ্রুতগামী ইঞ্জিনের মত বাতাসের শব্দ হয়। ডালপালাগুলি একটা অপরটায় গায়ে আছাড় খায়, পথের ধারের বাঁশগাছ রাস্তার উপর নুইয়া পড়ে। দীপক ঝঞ্ঝার তালে তালে শিস দেয়। ঝড়ের বেগকে উপহাস করিবার জন্যেই যেন তারপর গলা ছাড়িয়া গাহিতে আরম্ভ করে—

বাতাস ছোটে পাগল পারা
মানুষ ছোটে আপন হারা,
নেশার এ যে কেমন ধারা
ছোটে সবাই ছোটেবে।

হঠাৎ এই সময় চড় চড় শব্দে গাড়ীর হুডটা ছিঁড়িয়া গেল। উত্তরা ভয়ে দীপকের গা ঘেঁসিয়া বসিল, বলিল, 'চল বাড়ী ফিরে।'

দীপক বলিল, 'না, চল, দেখে আসি বজবজের গঙ্গায় কেমন ঢেউ উঠছে।' বলিয়া সে আবার গান ধরিল—

'চন্দ্র ছোটে, সূর্য্য ছোটে
গতিতে আনন্দ লোটে—'

কিন্তু তাদের ছোটার পথে সামান্য একটা অনিয়ম সমস্ত ওলট পালট করিয়া দিল।

সেখানে রাস্তা সরু, গাড়ী ঘুরাইবার উপায় নাই, অথচ সামনেই পথের উপর পড়িয়া বিরাট একটা গাছ, তার এই পতনের বেদনায়ই যেন পাতাগুলি কাঁপিতেছে।

দীপকের মত উৎসাহী পুরুষও এবার দমিয়া গেল। সে ড্রাইভারকে বলিল, 'দেখ নেমে গাড়ী ব্যাক করা যায় কি না।'

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে বাদল ধারার মধ্যে ড্রাইভার নামিল। ব্যাক লাইটের আলোয় পথের সামান্যই দেখা যায়; এ অবস্থায় গাড়ী পিছু হটানো নিরাপদ নয়।

ভাগ্য-দেবতার সামনে অনেক সময়ই মানুষকে খেলার পুতুলের মত নিরুপায়-ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় কিন্তু দীপকের উপর আজ পর্যন্ত তিনি বরাবরই প্রসন্নতা দেখাইয়াছেন। তাই ছেঁড়া হুড গাড়ীতে বসিয়া ভিজিতে ভিজিতে এই ভাগ্যবান যুবক অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। কিন্তু নিরুপায়—। ভিজিতে ভিজিতে উত্তরা কাঁপিতে আরম্ভ করায় দীপক তার বর্ষাতিটা উত্তরার গায়ে জড়াইয়া দিল।

বাড়ীতে অনেকগুলি ঘরেই আলো জ্বলিতেছে—তারা যেন অভ্যর্থনা করিতেছে রাত্রি শেষে প্রত্যাগত গৃহকর্ত্রীকে। এই আলো দেখিয়া উত্তরা বলিল. 'চাকরগুলো কি কেয়ারলেস দেখেছ।'

দীপক বলিল, 'একটু ধমক দিতে হবে.'

সে গাড়ী হইতে নামিয়া উত্তরার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। উত্তরা তার হাতের উপর ভর দিয়া নামিল। সে বলিল, 'কাপড় ছেড়ে যাও, খুব ভিজেছ।'

বালবের উপর একটা সবুজ শেড থাকায়—পল্লবের ঘরটা প্রায়ান্ধকার। উত্তরা আর একটা আলো জ্বালিয়া দিলে প্রথমেই তাদের চোখে পড়িল ইজি চেয়ারের উপর শায়িত শীর্ণ, রোগ-পাণ্ডুর পল্লবের মূর্ত্তি।

পল্লব একবার প্রশান্ত-দৃষ্টিতে উত্তরা ও দীপকের দিকে চাহিল। দীপক চোখ নীচু করিল। উত্তরাকে লইয়া সিক্ত-বসনে রাত্রিশেষে সে বাটী ফিরিয়াছে, দু'জনেরই মুখে উত্তেজনা ও ক্লান্তির ছাপ, উত্তরার কেশ গুচ্ছ অবিন্যস্ত। চুরি করিয়া বমাল ধরা পড়িলে চোরের যে অবস্থা হয়—দীপকের অবস্থা তার চেয়েও করুণ। তার একবার ইচ্ছা হইল। ছুটিয়া পলাইয়া যায়, রিভলবার থাকিলে হয়ত তখন সে আত্মহত্যা করিত; হয়ত বা হত্যা করিত তার এই করুণ অবস্থার সাক্ষী নিরপরাধ বাল্যবন্ধুকে। বন্ধুর প্রশান্ত ভাব যেন তাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল।

উত্তরা স্বামীকে বলিল, 'তোমার এতটা অসুখ, অথচ ঘূণাক্ষরেও আমাদের জানাও নি।'

পল্লব সে কথার কোন উত্তর না করিয়া বলিল, 'তোমাদের পরিচয়ের য়্যানি-ভার্সারি করতে গিছলে বুঝি ?'

কথার মধ্যে কোনও উষ্মা ছিল না, তাই ইহার বিদ্রূপটা শ্রোতাদের কানে আরও বেশী করিয়া বাজিল।

উত্তরারও আর কোন কথা জোগাইল না।

মিনিট দুই কাটিয়া গেল উত্তরা ও দীপক দাঁড়াইয়া সিক্ত-বসনে, পল্লব চাহিয়া ছাদের কড়িকাঠের দিকে। হঠাৎ এই সময় তার কাশির একটা বেগ হওয়ায় অভাবনীয় ভাবে দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইযা গেল।

কাশিতে কাশিতে পল্লবের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠে, দম যেন আটকাইয়া যায়। উত্তরা ছুটিয়া গিয়া বিছানায় বসিয়া তার বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল, দীপক টিপিয়া দিল পাখার সুইচটা। পল্লব ইসারা করিল ফ্যান বন্ধ করিতে। দীপক তাড়াতাড়ি একখানি আনন্দবাজার ভাজ করিয়া বন্ধুর মাথায় বাতাস করিতে আরম্ভ করিল।

কাশির বেগটা একটু কমিলে পল্লব বলিল, 'রোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই, কাপড় ছেড়ে নাও তোমরা।'

উত্তরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কখন এলে ?'

'তুফান মেলে।'

'কিছু খেয়েছ ?'

বাত্রে খেলে কাশি বাড়ে, এর মধ্যেই উঠেছে তিনবার।'

'কমলবাবুকে খবর দাওনি কেন ?'

'তোমাদের ফেরার অপেক্ষা করছিলাম।

পল্লব কমলাপতি রায়ের মতন অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তারকেও খবর দেয় নাই এই ভাবিয়া যে, তিনি থাকিতে থাকিতে দীপক-উত্তরা ফিরিলে ব্যাপারটা নিতান্তই দৃষ্টিকটু হইবে।

কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া উত্তরা বলিল, 'এখন ফোন ক'রে দি কমলবাবুকে ?'

'না থাক, একটা কাশির মিকশ্চার আছে। দীপক তুমি এখন বাড়ী যাও। ভোর হয়ে এল, মা হয়ত ভাবছেন। কাল তুমি এলে পরামর্শ ক'রে যা হয় স্থির করব।'

এলাহাবাদে যাওয়ার কয়দিন পরেই পল্লবের শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, কিন্তু সে উত্তরা ও দীপককে কিছু জানায় নাই অভিমান করিয়া। সামান্য দুঃখকষ্টেই সে পরের সহানুভূতি চাহিবে? এই না জানানোর জন্যও তাকে মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে অনেকখানি। কিন্তু সে জানে সব চেয়ে বড় দাবী তার যেখানে—আজ সেখানে সব অধিকারই সে হারাইয়াছে।

নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্যই সে মিস আয়েঙ্গারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিল, খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভের জন্যই, দীপক ও উত্তরার নিকট ঐ মেয়েটার কথা লিখিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখিল এই সব অভিনয় শুধু নিরর্থক নয়, তার স্বভাবেরও বিরোধী।

প্রথমে তার অজীর্ণ ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইয়াছিল, পরে হইল জ্বর সঙ্গে-কাশি। রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। শেষটায় যখন দেখিল বিদেশে বিভূয়ে আর থাকা চলে না, তখন কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

ধনীর যেরূপ সাড়ম্বর চিকিৎসা হওয়া উচিত, কলিকাতায় পল্লবের সে চিকিৎসার ত্রুটী হইল না, পরীক্ষা হইল নানা রকম রক্ত, মল মূত্র, থু-থু সবই।

দাঁতের ডাক্তার দাঁত পরিষ্কার করিলেন, এক্স রে প্লেট নেওয়া হইল বার কয়েক কিন্তু রোগ নির্ণীত হইল না। দীপক বলিল, 'অল হামবাগস।'

ডাক্তাররা রোগ ধরিতে না পারিলেও চিকিৎসা চালাইলেন।

বেতনভোগী নার্সরা দরদ দিয়া সেবা করে না বলিয়া দীপক নার্স রাখিতে দেয় নাই। সে রোগীর সেবা করে উত্তরার সঙ্গে পালা করিয়া, বেশীর ভাগ রাত্রি জাগে নিজে।

মন ভাল থাকিলে রোগের উপশম হইবে এই আশায় পল্লবকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য সে মধ্যে মধ্যে মাসিক ও সাপ্তাহিকের ছোট গল্প পড়িয়া শোনায়, খেলার খবর বলে কখনও বা বাজায় গ্রামোফোনের নূতন ভাল ভাল রেকর্ড। পল্লব প্রায়ই তাকে গান গাহিতে বলে, দীপক গায় আশার গান, জয়ের গান, সৌন্দর্য্যের গান।

বিজয়া দশমীর রাত্রি। দীপকের ভাসান দেখিতে যাওয়া হয় নাই: প্রণাম করিতেও সে বাহির হয় নাই। সন্ধ্যা হইতেই রোগীর পাশে বসিয়া আছে।

রাত নয়টা আন্দাজ উত্তরার বাবা ও মা আসিলেন মেয়ে জামাইকে আশীর্বাদ করিতে। তাঁরা জামাতার জন্য কালীঘাটের মায়ের মন্দিরের সিঁদুর ও চরণামৃত আনিয়াছিলেন। উত্তরার মা জামাইকে চরণামৃত খাওয়াইয়া তার কপালে আশীর্বাদী ফোঁটা দিয়া কন্যার সিঁথিতে সিঁদুর ছোয়াইলেন। মার স্নেহ ও আশঙ্কা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তরার চোখ ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল। মা মেয়েকে আশ্বাস দিলেন. 'কিছু ভয় নাই, ও সেরে উঠবে।'

উত্তরার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এই সময় পল্লবের চোখের দিকে চাহিয়া দীপকের বুকখানা ছ্যাঁক করিয়া উঠিল। কেনই যেন তার মনে হইল, বন্ধুর এই রোগের জন্য সে নিজেই দায়ী।

বেশ ত' ছিল সুস্থ সবল মানুষ। রোগও কিছু নির্ণ'ত হইল না, অথচ দিনের পর দিন পল্লব মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। ব্যাধিটা মানসিক, একথা দীপক পূর্বেও দু'একবার ভাবিয়াছে বটে, কিন্তু সেই মনের দৈন্যের কারণ যে তার ও উত্তরার ব্যবহার ইহা একবারও মনে হয় নাই।

আজ একটী একটী করিয়া অনেক কথাই দীপকের স্মৃতি-পথে উদিত হইতে লাগিল. তার ও উত্তরার মধ্যে ঘনিষ্ঠতার পর হইতে প্রায়ই পল্লব অনামনস্ক ও বিমর্ষ থাকিত। কখনও বলিত, 'কিছুই ভাল লাগে না।'

উত্তরার মা ও বাবা চলিয়া গিয়াছেন রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। ভাসানের বাজনা ও বিজয়ার কোলাহল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না, তারই খানিকটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে পল্লবের বিছানার উপর। অনেকক্ষণ বাহিরের এই আলোর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। অন্যদিন পল্লব একটু নড়িলেই দীপক তার গায়ের চাদর ঠিক করিয়া দিত, মধ্যে মধ্যে অডিকোলনের জল দিয়া মাথার পটিটা ভিজাইত। কিন্তু আজ সে কিছুই করে নাই। শুশ্রূষাকারীর কর্ত্তব্য সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

রোগশীর্ণ কাঙ্গালসার পল্লবের দিকে চাহিলেই তার মনে হয়, একটু একটু করিয়া প্রতিদিনের বেদনা ঝাঁজরা করিয়া দিয়াছে তার হৃদযন্ত্র, তার ফুসফুস। অথচ বেচারী টুঁ শব্দটি পর্যন্ত না করিয়া সব সহ্য করিয়াছে, লজ্জায়, সঙ্কোচে, বন্ধু প্রীতিতে ও প্রেমে।

শুধু তাহাই নয় ; যখন সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে, তখনই লক্ষ্য করে উত্তরা ও দীপকের কোনও অসুবিধা হইতেছে কি না! একটু বেলা হইলে বলে. 'যাও তোমরা খেয়ে নাওগে।'

রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে অনুযোগ করে, 'কী মুস্কিলেই পড়লুম তোমাদের নিয়ে ? নার্স কিছুতেই রাখবে না, কিন্তু রাত জেগে যদি তোমাদের অসুখ করে তখন দেখবে কে ?'

আর এই মানুষটার বন্ধুপ্রীতির কী প্রতিদানই না সে দিল। ইহা ভাবিয়া দীপকের লজ্জা হয়, ঘৃণা হয় নিজের উপর।

রাত্রি তিনটার পর উত্তরার সেবা করিবার পালা, সে আসিয়া দেখিল দীপক চুপ করিয়া বসিয়া আছে। উত্তরা ঘরে ঢুকিলে দীপক তার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। একটু পরে কি যেন ভাবিয়া উত্তরাকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিল, 'ডায়েগনোসিস্ ক্লিয়ার।'

উত্তরা বলিল, 'তার মানে ?

'পল্বলের অসুখের কারণ তুমি আর আমি।'

এই রূঢ় উত্তর শুনিবার জন্য উত্তরা প্রস্তুত ছিল না, তার মুখখানা সাদা হইয়া গেল। দীপকের কণ্ঠস্বরে পল্বলের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, দীপক তাহাকে বলিল, 'তুমি সেরে উঠবে পল্বল।'

পল্বল নিজের কপালে একবার হাত ছোঁয়াইল।

রোজই শেষ রাত্রে দীপক বাড়ী চলিয়া যায়, ফেরে পরদিন প্রাতে ন'টা আন্দাজ। সে আসিলে উত্তরা চা খায়।

সেদিন দীপক আসিল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া উত্তরা দারোয়ানকে পাঠাইল। সে আসিয়া খবর দিল দীপক সমস্ত দিন বাড়ীতে ছিল, সন্ধ্যার একটু আগে বাহির হইয়া গিয়াছে।

উত্তরা আশা করিল সে হয়ত রাত্রে আসিবে।

পল্বল বলিল, 'রাত্রে যখনই ঘুম ভেঙ্গেছে দেখেছি দীপকের কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ভাব। কি যেন ভাবছে, ভাবতে ভাবতে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।'

পরদিন প্রাতের ডাকে উত্তরা একখানা চিঠি পাইল। দীপক লিখিয়াছে,'আমার মন ভেঙ্গে পড়েছে। আমি কয়েকদিন বিশ্রাম চাই।'

উত্তরা চিঠিখানা পল্বলের হাতে দিলে সে কাগজের ঐ টুকরাখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, 'হ্যাঁ, বড্ড খেটেছে আমার জন্য।'

উত্তরা আশা করিয়াছিল পল্বল বন্ধুকে অন্ততঃ একবার আসিয়া দেখা করিবার জন্য চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে ঐরূপ কোন আভাষ পর্যন্ত না দেওয়ায় উত্তরা মনে মনে দুঃখিত হইল, সে বুঝিল, দীপক তার সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করিতে চায়

এবং তার স্বামীও ইহাতে মনে মনে খুশী বই অখুশী নয়।

দীপক না আসায় সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থার অদল বদল হইল। বাহিরের সমস্ত ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হইল উত্তরার ভাইদের এবং স্থিতধীর সাহায্য।

উত্তরা দীপকের উপর রাগ করিল, অভিমান করিল সে কী-না একবারও চাহিল না তার মনের দিকে! সব কথা খুলিয়া বলিলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত!

দিন কুড়ি পরের কথা! দীপক সাধারণতঃ আসিয়া উত্তরার খোঁজ করে, কিন্তু সেদিন সোজাসুজি চলিয়া গেল পল্লবের ঘরে।

পল্লব বলিল, 'কেমন আছ? অসুখ টসুখ করে নি ত'?'

'না, ব্যস্ত ছিলুম তাই আসতে পারি নি। তুমি কেমন?'

'একই রকম।'

দীপক জানিত পল্লবের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া বন্ধ হইয়াছে, পরন্তু কোন কোন বিষয়ে যেন একটু ভালই এখন দেখিল। সে বলিল, তুমি সেরে উঠবে।'

এই সময়ে উত্তরা আসিল।

সে প্রথমেই লক্ষ্য করিল দীপকের চেহারার পরিবর্তন, দুই চোখের নীচেই কালো দাগ, মুখশ্রী পান্ডুর! এই কয় দিনের দ্বন্দ্ব মুখের উপর একটা গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

পল্লবের চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও অন্য দু'একটা সাধারণ কথাবার্ত্তার পর দীপক বলিল, 'আমি বিলেত যাচ্ছি।'

উত্তরা বলিল, 'বিলেত?'

'হ্যাঁ, ব্যারিষ্টারী পড়তে, পাশপোর্ট পেয়ে গেছি।'

পল্লব বলিল, 'ভালই করলে ওকালতীর চেয়ে ব্যারিষ্টারীর ভবিষ্যৎ অনেক ভাল।'

দীপক বলিল, 'কিন্তু ব্রিফলেস ব্যারিষ্টারের দুঃখ বা বাসনা সব চেয়ে বেশী।'

'তুমি ত' আর সে পর্যায়ে পড়বে না।'

বিলাত যাওয়ার সম্বন্ধে দীপক একবারও তাকে কিছু বলে নাই, সমস্ত স্থির করিয়া আজ কি না আসিয়াছে সংবাদ দিতে? এই উপেক্ষার জন্য ক্ষোভে

অভিমানে উত্তরা যেন কাটিয়া পড়িল। দীপকের সঙ্গে একটিও কথা বলিল না।

ঘণ্টা খানেক পরে পল্লবের নিকট বিদায় লইয়া দীপক উত্তরাকে বলিল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ডাইনিং রুমে টেবিলের পাশে দু'খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তারা বসিল। টেবিলের উপর দু'টি ফুলদানিতে কতকগুলি ফুল, কয়েকটা হলুদরংয়ের—কয়েকটা লাল। উত্তরা একটা হলুদ ফুল তুলিয়া লইয়া নখে করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। তার পিছনে দেওয়ালে দীপকের একখানা ছবি, সামনের দিকে পল্লবের। টেবিলের নীচে গোটা-তিনেক সদ্যজাত বিড়াল ছানা ঘুট্-ঘুট্ করিতেছে, তাদির চোখ ফুটিয়াছে সবে মাত্র দু'দিন আগে।

দীপক কি ভাবে যে প্রসঙ্গটার উত্থাপন করিবে ঠিক বুঝিয়া পাইল না। উত্তরার দিকে চাহিয়া তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। খানিকটা পরে সে বলিল, 'অনেক ভেবে চিন্তেই এই পথ নিয়েছি, এতে তোমার মঙ্গল, আমার মঙ্গল, পল্লবের মঙ্গল।'

উত্তরা নিরুত্তর।

আস্তে আস্তে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া দীপক বলিল, 'আমায় ভুল বুঝো না তুমি।'

উত্তরা একবার স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি দুঃখের সকল কবিতার চেয়ে ভাবনিবিড় প্রাণস্পর্শী। এই ট্র্যাজেডি মুহূর্তের জন্য দীপককে বিহ্বল করিয়া রাখিল।

তিন মাস পরে বিলাতে বসিয়া ও. কে-র পত্রে দীপক জানিতে পারিল পল্লব সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।

ছোট গল্প

মুক্তির কাঁটা

আজ ত্রিশ বছর বংশী এই বাজারে বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সকল ঋতুতেই ঐ একই বটগাছের তলায় সে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে। তার মাথার উপর ঝুলানো থাকে একটা ছাতা। ছাতাটা বটগাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা, ছোট এক খানা তালপাতার ছাউনি বলিলেও অন্যায় হয় না, আকারে সেটা এত বৃহৎ। ছাতাটা বৃদ্ধেরই মত জীর্ণ, তার চালায় অনেকগুলি ছেঁদা, কোন জায়গায় পাতা পচিয়া ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

বংশীর শরীর শীর্ণ, চামড়া শিথিল, চুলগুলি সব সাদা। চোখে সে এখন ভাল দেখিতে পায় না, কিন্তু ত্রিশ বছরের অভ্যাসের বশে প্রথমে সে চায় মানুষের পায়ের দিকে। ছেঁড়া জুতা দেখিলেই ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'সেলাই বুরুশ'। কাতর ভাবে মুখের দিকে চায়। কাজ জুটিলে তার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া ওঠে একটা ক্ষীণ-হাসি, বিফল হইলে বাহির হয় শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস।

জীবনে কোন দিনই অভাব তার ঘোচে নাই, দারিদ্র্য যেন দুরারোগ্য 'ক্রণিক' ব্যাধির মত তার জীবনের চিরসঙ্গী। তবু যা'হোক এতদিন দু'বেলা দু'মুঠো জুটিয়াছে কিন্তু এখন একেবারেই অচল। কাজ আগে যা ছিল এখন তার অর্দ্ধেক ও নাই, অথচ জিনিষ পত্রের দাম ডবলেরও বেশী। জুতা সেলাই করিতেও কষ্ট হয়। অনেক সময় ছোট ছোট ছেঁদা গুলি চোখে পড়ে না।

শরীরে রক্ত ছিল, মনে বল ছিল, তাই এত দিন দারিদ্র্যের বোঝা বহন করিতে পারিয়াছে। বংশী ভাবিত সুদিন আসিবে। বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

কিন্তু ভাগ্য দেবতা এই সময় তার শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন করিয়াছিলেন। কন্যা পণ যোগাড় না হওয়ায় বংশী বিবাহ করিতে পারে নাই। একজন জ্ঞাতি ভায়ের অনাথ বিধবা কন্যাকে সে আশ্রয় দিয়াছিল, নিজের সন্তানের মতই তাকে পালন করিয়াছিল। সেই মেয়েটী বংশীকে রাঁধিয়া দিত, তার সেবা করিত। আজ ক'দিন হইল কলেরায় তার মৃত্যু হইয়াছে!

সেই হইতে বংশীর হাঁড়ী চড়ে নাই। রান্নার হাঙ্গামা আর ছাই ভাল লাগে না, তাই ক'দিন সে চিড়া ও ছাতু খাইয়াই কাটাইয়া দিয়াছে। ঘরে ঘটী, বাটী, ঘড়া যা' কিছু ছিল, একে একে সব বেচিয়া ফেলিয়াছে। এখন সম্বলের মধ্যে একটা ভাঙ্গা কাঁসার থালা আর জুতা সেলাইয়ের পুরানো যন্ত্রগুলি।

সেদিন সকাল হইতেই মন খারাপ, কাজ নাই, পয়সা নাই। গাছতলায় ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া সময় আর কাটে না। কেবলই তার মনে হইতেছিল গরীবের জীবন একটা বিড়ম্বনা, একটা অভিশাপ।

সকালে জমিদার নিশিবাবু ধমকাইয়া গিয়াছেন, খাজনা না দিলে বংশীকে ভিটা হইতে উৎখাত করিয়া দিবেন। টুনু ফৌজদার গালাগালি করিয়াছে, 'জুতো যদি নাই সারাতে পারবি 'ত কাজ নিস কেন? জোচ্চুরীর আর জায়গা পাস নি?'

মাস খানেক আগে বংশী তার পালিতা কন্যার জন্য 'কুইনাইন মিক্শ্চার' আনিয়াছিল। ডাক্তার আজ দামের তাগিদ দিয়াছে। বংশী অতিষ্ঠ হইয়া বাজার হইতে উঠিয়া গেল।

বাড়ী যাইয়া সে রান্না চড়াইয়া দিয়াছিল। ভাত নামাইবার সময় হাড়ীটা হাত হইতে পড়িয়া গেল।

তাগাদা ধমক,গালাগালিতেই তার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তার উপর মুখের গ্রাস হইতে বঞ্চিত হওয়ায় বংশী ভাবিল, এ জীবনে আর প্রয়োজন কি! বন্ধন ত' কিছুই নাই। যত জ্বালা শুধু একটা পেটের জন্য। সে ঠিক করিল মরিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবে।

থালা খানা লইয়া বংশী যদু সাহার দোকানে গেল। থালা রাখিয়া যদু আট আনা পয়সা দিল।

আট আনায় মোটে সিকিতোলা আফিং পাওয়া যায়। এক সিকি আফিং খাইয়া মানুষ মরে না। গলায় দড়ি দিতেও বংশীর ভয় করে। আরও অন্ততঃ আট আনা চাই, তাহা হইলে আধভরি আফিং কিনিতে পারে।

বংশী তার জাত ভাই ছেদীলালের কাছে যাইয়া আট আনায় জুতা সেলাইয়ের যন্ত্রপাতি সব বেচিয়া ফেলিল।

বংশী দরজা বন্ধ করিয়া মাটীর ভাঁড়ে আফিং গুলিতেছিল। তার মনে পড়িতেছিল এই দীর্ঘ জীবনের বিফলতার কথা। ভাগ্য তার এতই খারাপ যে এক মুঠা ভাতের জন্য তাকে খাটিতে হয় তিনজন চামারের সমান অথচ তার নিপুণতা তাদের কারও চেয়ে কম নয়। খরিদ্দারের সঙ্গে বেশী দর দস্তুর করে না, একাগ্রতার সহিত নিজের কাজ করিয়া যায়। কিন্তু তার রন্ধ্রগত শনি এ জীবনে তাকে একদিনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দেয় নাই। আজ সব চেয়ে তার বেশী রাগ হইল ঠাকুরের উপর, তিনি যদি দয়ারই আধার তবে গরীবের এত দুঃখ কেন?

মাটীর ভাঁড়টা মুখের কাছে তুলিয়া বংশী একবার বাহিরের দিকে চাহিল। আকাশে তখন গভীর নীলিমা, সমস্ত প্রকৃতির বুকে সূর্য্যের আলো জড়োয়ার গহনার মত ঝিকমিক করিতেছে। সমস্ত জগতটা যেন হাসিতেছে। বংশী ভাবিল দুঃখটা শুধু তার নিজের। তার দুঃখে আকাশ, আলো, গাছপালা, লতাপাতা এদের কিছু আসে যায় না।

ভাঁড়ের দুধটা সব কালো হইয়া গিয়াছে। দুধের দিকে চাহিয়া বংশী বলিয়া উঠিল, 'আজ সব জ্বালা জুড়াবে।' চির-পরিচিতের সঙ্গে ভাবী বিচ্ছেদের দুঃখে নিজের অজান্তেই তার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। সে ভাঁড়টা হাতে তুলিয়া লইল।

এমন সময় বাহির হইতে গ্রামের মাতবব্র আশু দাস মশাই ডাকিয়া বলিলেন, 'বংশী সহরে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি জুতোটা সেলাই করে দে, আট আনা পাবি।'

আশুবাবুর ডাক শুনিয়া বংশীর হাত কাঁপিয়া উঠিল, মাথাটা ঘুরিয়া গেল। আ–ট—আ—না! এক জোড়া জুতা সেলায়ের জন্য আ–ট—আনা!

সে মাটীর ভাঁড়টা মেঝেয় রাখিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। তারপর হাসিমুখে বলিল, 'একটু দাঁড়াও বাবু, যন্তোর নিয়ে আসচি।'

ছেদীর কাছে গিয়া বংশী বলিল, 'তোকে চারটে পয়সা দিচ্ছি বাবা, যন্তোর-গুলো আমায় দে। বড় জরুরী কাজ।'

ছেদী বলিল, 'তুমি না বললে কাশী যাবে?'

বংশী বলিল, 'তা বটে, কিন্তু রোজগার করে খেতে হবে ত।'

ফিরিয়া আসিয়া সে আবার জুতা সেলাই করিতে বসিয়া গেল।

অমাবস্যার ভাষা

গৌরমেহন একদিন গ্রামের সকলকে বিস্মিত করিয়া পাশের বাড়ির বিভাবতীকে বিবাহ করিল। তার পিতার এই বিবাহে সম্মতি ছিল না বলিয়া তাদের অবস্থার অনুরূপ কোন ধুমধামই হইল না; না আসিল জেলার শহর হইতে যাত্রার দল, না পুড়িল আতসবাজী। যারা আশা করিয়াছিল জমিদার পুত্রের বিবাহে ভুরীভোজন হইবে, টাকাটা সিকেটা কাপড় জামা বখ্শিস্ পাইবে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাশ হইতে হইল।

বিভাবতীর বাবা একজন দরিদ্র গ্রাম্য পুরোহিত, অবস্থানুযায়ী উৎসবের সামান্য ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাছে জমিদার হরিপ্রসাদ বিরক্ত হন এই ভয়ে গ্রামের কেহ বড় একটা যোগদান করিল না। শীতের ম্লান জ্যোৎস্নায় একটি মাত্র সানাই করুণ সুর তুলিয়া রাত্রির কুয়াশাকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

গৌরমোহনের মাতার আপত্তি ছিল আরও তীব্র। বিবাহের পরের দিন বর-কনের আসিবার সময় তাঁর মাথা ধরিল, তাই বধূবরণের ভার পড়িল এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার পর।

নব-বধূকে জল মিশানো দুধের পাত্রে দাঁড় করাইয়া সেই মহিলা বিভাবতীর চিবুক তুলিয়া বলিলেন, একবার মুখ তুলে চাও লক্ষ্মীটি।

লক্ষ্মীটি মুখ তুলিয়া চাহিলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইস্—

ছোট এই শব্দটুকু শুনিয়া বিভা শিহরিয়া উঠিল। তার মনে হইল ঐ 'ইস' এর পিছনে যেন যত রাজ্যের অমঙ্গল লুকাইয়া আছে।

একদিন এই বিভাবতী ছিল অপূর্ব সুন্দরী, তার ছিল ঢলঢল আয়ত দুটি চোখ, তপ্ত কাঞ্চনের মতন বর্ণ, শান্ত উজ্জ্বল মুখশ্রী, সুগঠিত নিটোল গড়ন। লোকে বলিত, গরীবের ঘরে যেন রাজকন্যার জন্ম।

সে আজ এক যুগ আগের কথা, পাশের বাড়ির দুটি কিশোর কিশোরী গৌর ও বিভা, গৌরদের নাটমন্দিরে খেলা করিতেছিল। নিজের হাতে বাঁশের ধনুক বানাইয়া হোগলা চাঁছিয়া তীর তৈয়ারী করিয়া গৌর বিভাকে বলিল, দেখি কে ভাল তীরন্দাজ, তুমি না আমি।

একে অপরকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছোঁড়ে, বিভাবতীর তীরগুলি প্রায়ই মাঝ পথে পড়িয়া যায় আর গৌরের কোনটা যাইয়া লাগে বিভার হাতে, কোনটা বা বুকে। সুন্দরী বিভা খিল খিল করিয়া হাসে। হঠাৎ সে বাঁ চোখটা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বাবা রে।

গৌর রাগিয়া গেল, বলিল, এক চড় মারবো, শুধু শুধু চেঁচাচ্ছিস্।

কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল বিভার আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে রক্তের রেখা। তীরটা যাইয়া চোখের মণির পাশে বিঁধিয়াছিল।

গৌর ভয়ে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। পিতা তার পিঠে কয়েক ঘা চাবুক বসাইয়া দিলেন। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করিল, ছেলেটার দুষ্টুমি হাড়ে হাড়ে, কেহ বা বলিল, বড়লোকের ছেলে, ওরা কি আর মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে?

কিন্তু অনুযোগ করিল না শুধু একজন।

বিভাবতী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিল, কয়েকদিন তাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইল। কিন্তু কেহ যদি বলিত, ছেলেটা কি দুষ্টু, মেয়ের চোখ প্রায় নষ্ট করেছিল আর কি, তখনই বিভাবতী বলিত ও ইচ্ছে করে করে নি, খেলতে খেলতে লেগে গেছে।

ঠিক এই সময় গৌরমোহন গ্রামের মন্দিরে মন্দিরে দেবতার জাগ্রত খোলায় যাইয়া মানত করিল, বিভার চোখ সারিয়ে দাও ঠাকুর।

কোন জায়গায় দুধ কলা মানিল, কোন জায়গায় পয়সা, কোথাও বা পাঁঠা। কিন্তু দেবতা প্রার্থনা শুনিলেন না, বিভা চোখ হারাইল, মুখখানা দেখিতে বিকৃত হইয়া গেল। পুরানো হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটার আলোচনাও ক্রমে চাপা পড়িল।

গৌরমোহন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতায় আই এ, বি-এ, এম-এ পাশ করিল। চারিদিক হইতে প্রস্তাব আসিতে লাগিল বিবাহ সম্বন্ধের। সুন্দরী শিক্ষিত পাত্রী, অভিজাত বংশ, লোভনীয় বরপণ। তার পিতা দেশ দেশান্তরে মেয়ে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, মার নিকট আসিল পাত্রীদের ফটো।

এই সময় গৌরমোহন একদিন মাতার নিকট বলিয়া বসিল, সে বিভাকে বিবাহ করিতে চায়।

ঘরের মধ্যে একটা তাজা বোমা পড়িলেও মা হয়ত অতটা চমকিয়া উঠিতেন না। তিনি কহিলেন, এ্যাঁ, তুই পাগল হয়েছিস্, গৌর?

তার চোখ খারাপ করেছে কে মা ?

তুমি ত' ইচ্ছে করে করনি। দৈবি চক্করে হয়ে গেছে।

গৌরমোহনের পিতা হরিপ্রসাদ স্ত্রীর নিকট সব শুনিয়া বলিলেন, বে'তে আবার ছেলের মতামত কি ? ওসব চলে আপস্টার্ট ফ্যামিলিতে। গৌরকে বলে দিও রায় পরিবারে কোন বাঁদরামো চলবে না।

ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় শেষটায় বলিলেন, বেটাকে ত্যাজ্য পুত্তুর করব।

জননী পুত্রকে অনেক কিছু বুঝাইলেন, চোখের জল ফেলিলেন।

বিভাবতীর পিতার সম্মতি লইতেও গৌরমোহনকে বেগ পাইতে হইল অনেকখানি।

তিনি বলিলেন, একি বলছ বাবা, একি কখনও সম্ভব ?

গৌরমোহন বলিল, আপনি বিভার চোখের কথা বলছেন ? সে ত আমি জানি, আর তার জন্যই এসেছি এই প্রস্তাব নিয়ে।

বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও, তোমার মন খুব উঁচু, কিন্তু—

এই কিন্তুর মধ্যে ছিল যত রাজ্যের সমস্যা।

হরিপ্রসাদ ধনী, দোর্দণ্ড তাঁর প্রতাপ। তাঁর নিকট এই প্রস্তাব লইয়া গেলে তিনি যে শুধু ক্ষমা করিবেন না তাহাই নয় হয়ত গ্রামে বাস করাই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে অসম্ভব হইবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গৌরমোহনেরই জয় হইল, তার পিতা বলিলেন, আমার ছেলে, ও বেটা' ত একগুঁয়ে হবেই, যা ইচ্ছে করুক।

কিন্তু জয়ের যে একটা আত্মপ্রসাদ আছে গৌরমোহন তাহা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারিল না।

শুভ দৃষ্টির মুহূর্তে বিভাবতীর আনত চোখের যতটুকু সে দেখিয়াছিল তাহাতেই নিজের অজ্ঞাতে তার ভ্রূ-কুঞ্চিত হইল। বিভাবতী যে দেখিতে এতটা খারাপ হইয়াছে তাহা সে এতদিন লক্ষ্য করে নাই। বাঙালীর ঘরের মেয়ে বিভাবতী তার কাছে স্বামীর মনের কথাটা সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়িল।

আরম্ভ হইল এক অপূর্ব দাম্পত্য জীবন।

বিভাবতীর ফুলশয্যার রাত্রি—

কুয়াসায় ঢাকা চাঁদের মতন বিভাবতী বালিশে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া আছে ; তার পিতার প্রেরিত সামান্য তত্ত্বের দু'একখানা পাত্র ও বিছানায় ছড়ানো ইতস্তত দুচারটা ফুল ভিন্ন উৎসবের আর কোন চিহ্নই নাই।

পাশেই স্বামী শুইয়া, কিন্তু বিভাবতীর তার দিকে চাইতে সাহসে কুলায় না। তার চোখ দেখিলে হয়ত সে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইবে।

বিভাবতী ভাবে বিনা অধিকারে সে এই বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। এ সুখের লোভ তার সম্বরণ করা উচিত ছিল, উচিত ছিল আমরণ কুমারী অবস্থায় কাটাইয়া দেওয়া। কেন সে আর একজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পথের কাঁটা হইল ?

তার এই অবিমৃষ্যকারিতা, এই যে লোভ ইহার ফল চিরদিন তাকে ভুগিতে হইবেই, আর এই বিশাল পুরীর নিস্তব্ধতা যেন তারই পূর্বাভাস।

তার বাঁ চোখের উপরের সাদা দাগ আর মনির পাশের ডিম্বাকৃতি পদার্থটা যে সত্যই বড় কুৎসিৎ। আয়নায় দেখিলে যে তার নিজের ভয় করে। লোকে তাকে শুনাইয়া বলাবলি করে, এমন রাজার ছেলে তার কিনা হল একটা কানা বউ—

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়।

বাহিরে শোনা যায় ঝিঁ ঝিঁ শব্দ, খোলা জানালার ভিতর ঝির ঝির করিয়া বাতাস আসে। বাহিরের দিকে চাহিলে মনে হয় কুয়াসায় ঢাকা ঐ যে আকাশ ওখানে যাইয়া জমাট বাঁধিয়াছে তার বুকের শত বেদনা।

ক্রমে ক্রমে ভাবিয়া ভাবিয়া মন আচ্ছন্ন হইয়া আসে। ছেলেবেলা এই বাড়িতে সে কত খেলাধুলা করিয়াছে, কিন্তু আজ মনে হয় এ এক অচিন পুরী, আর তার পাশে শায়িত স্বপ্নের এক রাজকুমার।

পাছে তার স্পর্শে গৌরমোহনের ঘুম ভাঙিয়া যায় এই আশঙ্কায় বিস্তৃত শয্যার এক পাশে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিল, জোরে নিশ্বাস নিতেও তার সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। ফুলশয্যার রাত্রে নববধূর পক্ষে এ এক অপূর্ব অনুভূতি। তার আর পাঁচজন সখী সহচরীর নিকট সে এই রাত্রির যে বিবরণ শুনিয়াছে তার সঙ্গে নিজের এই অনুভূতির মিল নাই কোথায়ও। কিন্তু সে জানে তার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

শেষ রাত্রের দিকে গৌরমোহনের ঘুম ভাঙিয়া গেলে সে কহিল, তুমি যে এখনও ঘুমোওনি বিভা।

ঘুম আসছে না।

গৌরমোহন বিভাবতীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কহিল, চেষ্টা করলেই আসবে।

স্বামীর স্পর্শে বিভাবতীর মনে একটা পুলকের সাড়া জাগিল কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। গৌরমোহন আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

কর্তব্য পালনের আত্মপ্রসাদেই গৌরমোহন কয়েকদিন মশগুল হইয়া রহিল।

সে মহৎ, সে বড়, বড় না হইলে কানাকে কেহ কখনও বিবাহ করে ?

বিভাও তার সঙ্গে ঠিক সেইভাবেই ব্যবহার করিত। তার চাল-চলন, কথাবার্তা প্রত্যেক ভাবভঙ্গীতেই প্রকাশ পাইত যে সে অতি দীন, অন্তত অনুপযুক্ত তার স্বামীর দাসী হইবার।

গ্রামের পাঁচজনে, বিশেষ করিয়া বন্ধুবান্ধবরাও বাহবা দিত, বলিত, এমন যুবক এ যুগে দুর্লভ।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মপ্রসাদের নেশাও কাটিতে লাগিল।

আর বিভাবতী ?

স্বামীর সামনে সে বড় একটা আসে না। চোরের মতন লুকাইয়া বেড়ায়। মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করে। কিন্তু তার যে নারীর মন, সে যে সত্য সত্যই স্বামীকে ভালবাসিয়াছে— এ ভালবাসাত আজকের নয়।

সে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে এই দুর্ঘটনার দিন হইতে, যেদিন গৌরমোহনের নিক্ষিপ্ত হোগলার তীর যাইয়া তার চোখে বিঁধিয়াছিল। আজ সে পতিরূপেই তাকে পাইয়াছে কিন্তু এ পাওয়ার পিছনে আছে শুধু একটা বিরাট ফাঁকি। দোষ তার নয়, গৌরমোহনের নয়, অপরাধ ঘটনা-চক্রের।

ভাবিতে ভাবিতে নিজের অজ্ঞাতসারে তার দুই গণ্ড বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়ে, কখনও বা চোখের পাতা ফুলিয়া যায়।

মাস দুয়েক পরের কথা।

একদিন বিভাবতীর ঘরের বারান্দা হইতে শাশুড়ী ডাকিলেন, বৌমা। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল একটা অপরিচিত কোমলতা।

বিভাবতীর উত্তর করার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধা ঘরে আসিয়া তার নিকটে বসিলেন। তারপর তার চুলের গোছা ধরিয়া বলিলেন, একী, চুলটাও বাঁধনি যে! নিজের উপর এতটা অযত্ন কেন, কিসের জন্য ? দুঃখ তোমার কিসের ? এই বাড়িঘর দাসদাসী সবইত তোমার!

ঝিকে দিয়া জল আনাইয়া বধূর চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বৃদ্ধা অনেক প্রসঙ্গেরই অবতারণা করিলেন, বলিলেন, তোমার বাবার শরীর কেমন ? তিনি অনেক দিন এ বাড়িতে আসেন নি।

শুনেছি ভাল আছেন।

খাসা লোক, অমন ভদ্দর লোক গাঁয়ে আর একটিও নেই, অবশ্য রায়দের বাদ দিয়ে, রায়েরা হল দেশের রাজা।

বৃদ্ধা আসলে যে কথাটা বলিতে চান তাহা উত্থাপন করিতে কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। খানিকক্ষণ পরে সমস্ত বাধা এড়াইয়া বলিলেন, গৌর জীবনে সুখী হতে পারল না, কি বল ?

এর উত্তর বিভাবতী কি করিবে ?

শাশুড়ী বলিলেন, আমি মা কিনা তাই বুঝি, তোমারও বোঝা উচিত।

বিভাবতী কোন উত্তর করিল না।

তুমি আমার মেয়ের মতন, ছেলেবেলা থেকে তোমায় দেখছি, তোমার অমন সুন্দর স্বভাব, একদিন অত রূপ ছিল, অমন কুন্দকান্তি কিন্তু আমার বরাতে— বলিয়া বৃদ্ধা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তারপর একটু পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমাকে পেয়েও সুখী হতে পারেনি।

বিভাবতী বলিল, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

তুমি ওকে খুব ভালবাসো তা জানি, তা বলছিলাম – আমিত' অনেক বলে কয়েও রাজী করাতে পারছি না তুমি যদি একবার -

বিভাবতী বলিল, ও'র বিয়ের কথা বলছেন, বেশ, আমি বলে দেখব।

শাশুড়ী পরম উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, তাইত সবার সঙ্গে তর্ক করি, খাসা বউ আমার, ভদ্দর লোকের মেয়ে নইলে অমন হয়।

তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, ওর মেজাজ বুঝে বোলো। আর আমার নাম কর না, কবে বলবে বল দেখি।

কাঠের উপর কাঠ দিয়া আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শুষ্ক কণ্ঠে বিভাবতী বলিল, আজই বলব।

তারপর দু'জনেই খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন। বলিবার আর কিছু নাই, কাছে বসিয়া থাকিতেও সঙ্কোচ বোধ হয় অথচ কথাটা সারিয়াই উঠিয়া আসা চলে না। তাই বৃদ্ধা অগত্যা ডিবা খুলিয়া দাঁতে মিশি দিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই রাত্রেই বিভাবতী গৌরমোহনকে বলিল, তুমি আর একটা বিয়ে কর—

গৌরমোহন উত্তর করিল, মা বলেছেন, বুঝি ?

আমার অনুরোধ।

তুমিও পাগল হয়েছ দেখছি।

স্ত্রীকে গৌরমোহন ভালবাসিতে পারে নাই, কিন্তু স্ত্রী বর্তমানে আবার বিবাহকে সে মন করিত চরম নিষ্ঠুরতা। যে সমাজে পতি বর্তমান থাকিতে স্ত্রী কিছুতেই আবার বিবাহ করিতে পারে না সেখানে স্ত্রী বর্তমানে পুরুষের আবার বিবাহ করার মতন অপরাধ আর কিছু নাই।

সে একটু পরে বলিল, তুমি আর কখনও আমায় এ অনুরোধ করবে না।

গৌরমোহনের বিবাহের প্রসঙ্গটা চাপা পড়িল বটে, কিন্তু শাশুড়ী বিভার উপর চটিয়া গেলেন, পাঁচজনের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কানিটা ছেলেকে আমার মন্তর করেছে।

একদিকে অনাদর ও উপেক্ষা, অন্যদিকে নিজের প্রতি অযত্ন এর মধ্যেই দিনগুলি কোন রকমে কাটিতেছিল। কিন্তু এবার আরম্ভ হইল শাশুড়ীর অত্যাচার, কথায় কথায় টিটকারী। বিভাবতীর উঠিতে দেরী না হইলেও বলেন, কী গো বড় মানুষের ঝি, এতক্ষণে ঘুম ভাঙল। কখনও জিজ্ঞাসা করেন, পাথরের চোখ বসাবার জন্য তোমরা কলকাতায় যাবে শুনেছিলাম কিন্তু তারও বোধ হয় আর দরকার নেই, কি বল ?

বিভাবতী নীরবে সব সহ্য করে।

নিজের প্রতি কোন মমতাই যেন আর তার নাই। এ অধ্যায়ের যত শীঘ্র পরিসমাপ্তি হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু তার দুঃখ হয় স্বামীর জন্য। নিজেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিলেন তার জন্য বিবাহ করিলেন না তারই মুখ চাহিয়া।

এত হতভাগিনী সে যে একদিনের জন্য তাঁকে সুখী করিতে পারিল না।

সে সেদিন স্বামীকে বলিল, মা বলছিলেন পাথরের চোখের কথা, ওতে নাকি দেখতে বেশ দেখায়।

গৌরমোহন বলিল, আচ্ছা দেখি, আমার ওতে খুব মত নেই।

কেন ?

কলকাতায় একজনকে দেখেছি যখন সে নকল চোখটা খোলে তখন চোখের ফাঁকা গর্তটা দেখতে আরও ভয়ঙ্কর হয়।

আমার চোখের চেয়েও খারাপ ?

হ্যাঁ।

আমি যদি তোমার সামনে কখনো না খুলি ?

কিন্তু প্রস্তাবটা আর কার্যে পরিণত হইল না।

কিছুদিন হইতেই বিভাবতীর ভাল চোখ দিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিরাছিল, যন্ত্রনাও ছিল অল্পবিস্তর। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে স্বামীকে বলে নাই। তাকে বিব্রত করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে রোগটা বাড়িয়া চলিল। শেষটায় একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

সে একদিন শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় উঃ আঃ করিতেছে এমন সময় গৌরমোহন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, কি হয়েছে?

বিভাবতী বলিল, ভাল চোখটা ব্যথা কচ্ছে।

এ্যাঁ, ডান চোখটা?

বিভাবতী দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিল। গৌরমোহন তার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, এ্যাঁ, একী—

দু'টো চোখেই রক্ত জমাট বাঁধিয়াছে, বিভাবতী রোধ করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পাড়তেছে।

গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করিল, কতদিন হয়েছে?

বিভাবতী চুপ করিয়া রহিল।

দু'একদিনে ত' এমন হতে পারে না, তুমি এতদিন বলনি কেন—বলিয়া সে রুমাল দিয়া স্ত্রীর চোখের দু'টি গর্ত মুছাইয়া দিতে লাগিল।

স্বামীর এইটুকু আদরেই বিভাবতীর সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ জাগিল, হতভাগিনী দুঃখ ভুলিল যন্ত্রণা ভুলিল।

গৌরমোহন বিভাবতীকে কলিকাতায় আনিল। নামজাদা প্রায় সকল ডাক্তারই দেখিলেন, রক্ত পরীক্ষা ও ইন্‌জেকসন্‌ হইল নানারকম, ধুমধামের কোন ত্রুটীই হইল না।

একজন বিশেষজ্ঞ বলিলেন, টু লেট্‌। ভাল চোখও থাকবে না।

আর একজন কহিলেন, দেখা যাক্‌ কি হয়।

তারপর অস্ত্রোপচার, কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সুচিকিৎসক দু'টা চোখই অপারেশন করিলেন। বাঁ চোখের মণির নিকট হইতে হোগলার সেই কুচিটা বাহির হইল। জিনিসটা জমিয়া পাথরের কুচির মতন শক্ত হইয়া গিয়াছিল। সেটাকে চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া ডাক্তার বলিলেন, root of all evils this nasty thing.

চিকিৎসা শেষ হইল। রোগিনী আশা ও নিরাশার মধ্যে অনেকদিন

কাটাইয়াছে। ফুলা, যন্ত্রণা, রক্তাক্ত এমন কি বাঁ চোখের সাদা সেই গ্যাঁজটাও আর নাই। বেশ দু'টা স্বাভাবিক চোখ।

কিন্তু বিভাবতীর সামনে জগৎ তখন একেবারে অন্ধকার।

কোথায় আলো কোথায় আকাশ—তার এ জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা ঐ অন্ধকারে পূর্ণতা লাভ করিবে বলিয়াই কি সে এতদিন বাঁচিয়াছিল ?

একটু একটু করিয়া সে যখন ভাল চোখের দৃষ্টি শক্তি হারাইতেছিল তখনও ডাক্তার তাকে আশ্বাস দিতেন।

আজ ব্যাণ্ডেজ খোলার পর সব অন্ধকার দেখিয়া বিভাবতী ডাকিল, ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার অপরাধীর মত নীরব রহিলেন।

গৌরমোহন বলিল, কিছুই দেখতে পারছো না। এই আমাকে—বলিয়া সে স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

বিভাবতী শূন্যে হাতড়াইতে আরম্ভ করিল।

গৌরমোহন কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, ও ভগবান!

ডাক্তার বাহির হইয়া গেলেন।

গৌরমোহন বিভাবতীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া ডাকিল—বিভু—

বিভাবতী স্বামীর চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ছিঃ ওকি কচ্ছ—

গৌরমোহনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল. সে এবার বিভাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, তুমি আমায় ক্ষমা কর—বিভা—আমায় ক্ষমা কর।

অপ্রত্যাশিত এই যত্নের আনন্দে স্বামীর বুকে মাথা লুকাইয়া অন্ধ বিভাবতী ভাবিতেছিল, চোখ থাকতে যদি একদিনও এ সুখের অধিকারিণী হতে পারতাম।

পথের কাঁটা

আর কতটা পথ বাবা ? যাদবের কণ্ঠে কাতর প্রশ্ন। স্বর পাখীর ছানার চিঁ চিঁ-র মতন করুণ।

এগার-বার বছরের ছেলে, শ্যামবর্ণ, সরু-সরু হাত পা। পেটটা বড়। চোখ কটা। হাঁটিয়া হাঁটিয়া পা ভারী হইয়াছে, আর পারে না। কিছুটা পথ চলিয়াই নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য দাঁড়ায়। বাপ অমনি ধমক দেয়, এই হারামজাদা হইছে পথের কাঁটা। চল চল।

যাদবের মা বলে, রোগা ছাওয়ালরে অত ধমকাও কেন ? তুমি যখন ছিলা না, ওই ত আমাগো রক্ষা করছে।

রক্ষা করছে না হাতী, যাদবের বাপ পরাশর রাগে গসগস করে। শক্তিমান পুরুষ, শ্যামবর্ণ, দেখিতে সুশ্রী—বয়স ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, কিন্তু এই কয়দিনের দুর্দৈবে, অনাহার ও অনিদ্রায় তার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এক হাতে টিনের তোরঙ্গ, পিঠে বোঁচকা আর এক হাতে যাদব। এই ভাবে চলিতে তার কষ্ট হয়। সে এক-এক বার বলে, কী পাপই যে করছিলাম। শেষটায় দেশছাড়া, ভিটাছাড়া হইলাম।

তার স্ত্রী মোহিনী বলিল, পাপ পুণ্য বলিয়া কিছুই নাই। সেদিন গাঙ্গুলী ঠাকুররে খাওয়াইলাম, বামুন ভোজনের ফল ত হইল এই।

তার গায়ের রং কালো, দাঁতের উপরের পাটি ও কপাল উঁচু। চোখ দুটা বড়। বয়স অনুমান করা যায় না—তবে দেখিতে স্বামীর চেয়ে বড় দেখায়।

তার বাঁ হাতে বোঁচকা, ডান হাতে ভাঙা বালতির ভিতর ময়লা জীর্ণ একটা লণ্ঠন, নুনের মালা, তেলের শিশি, দু' একটা ঘটি-বাটি, গরিব সংসারের সামান্য তৈজস পত্র।

চলিয়াছে কাতারে কাতারে মানুষ—পঙ্গু, অন্ধ, খঞ্জ, সুস্থ, বলবান, যুবা, শিশু, বৃদ্ধ, নর ও নারী। পূব হইতে পশ্চিমে বাক্স-পেঁটরা হাঁড়ি-কুড়ি বিছানার যোজনব্যাপী বিরাট কিন্তু বিচ্ছিন্ন মিছিল। কোনো দল আগে গিয়াছে, কাহারাও বা পিছনে আসিতেছে। মানুষগুলার চোখে মুখে অদ্ভুত

ভীতি, সামান্য শব্দেই আঁতকাইয়া ওঠে। মাঝে মাঝে পিছু তাকায়। দূরে অস্পষ্ট কিছু দেখিলেই বলে, ঐ—ঐ—

শুধু রুগ্ন যাদবের নয়, সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, পথ আর কতটা। পশ্চিম বাঙলা কত দূর?

বৃদ্ধরা অশক্তরা এক-একবার পথের উপরই বসিয়া পড়ে। সঙ্গীরা ভয় দেখায়, ঐ ঐ আনসার।

ভয়ত্রস্ত মানুষগুলো আবার চলে।

আজ কয়দিন যাবৎ এই একই দৃশ্য। দলে দলে মানুষ পূব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে। দলে দলে আসিতেছে পশ্চিম হইতে পূবে।

কিছুটা পথ যাইয়াই যাদব আবার বসিয়া পড়ে।

তোর জন্য মরব না কি হারামজাদা? বলিয়া পরাশর ছেলেকে রুখিয়া গেল।

মোহিনী বলিল, তুমি কি পাগল হইলা নাকি?

হইছি ত, পাগল করছে বাবুরা। দেশ ভাগ লইয়া তা'রা যখন মাতিয়া উঠছিল ও তখন নিশান লইয়া তারগো পিছু পিছু ছোটছে। তখন মানা করি নাই?

ও কি বুঝিয়া চেঁচাইছে, না বাবুরাই তখন বুঝছিল?

বোঝে নাই কেন? যত সব আহাম্মক!

এই সময় পিছন হইতে আর একটি দল আসিয়া তাদের সহিত মিলিত হইল। সকলের আগে বিশ-বাইশ বছরের এক তরুণ, তার পিছনে দুইটি তরুণী। তিন জনের মুখের আদল একই রকম, দেখিলে মনে হয় ভাই বোন। তার পর তাদের বাপ-মা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। বাপের হাত ধরা পাঁচ বছরের একটি ছেলে পরাশরের উদ্দেশে বলিল, থিঃ লাগে না। (ছিঃ রাগে না)।

পরাশর হাসিয়া ফেলিল।

ধমক খাইয়া যাদব তখনও কাঁদিতেছিল। মোহিনী তার গায়ে হাত দিয়া বলিল, এ্যাঁ, গা-গতর একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে।

পরাশর বলিল, যাউক, পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক। আঙার।

মোহিনী মনে মনে ঠাকুরকে ডাকে, ওকথা শুনিও না ঠাকুর। আমি তোমারে সিন্নি দেব। কলকাতায় যাইয়া দুধ-কলার সিন্নি।

যাদব জল চায়। তার মা প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কাছে জল আছে?

প্রৌঢ়া বলিল, জল নাই, দুধ আছে। দেব?

দেন, ভালই হবে। দুধে শক্তি হয়।

দু'তিন ঢোক দুধ গিলিয়াই যাদবের পিপাসা বাড়িয়া যায়। সে জল-জল বলিয়া কান্না শুরু করে।

পরাশর বলে, এই ছাওয়ালই হইছে আমার পথের কাঁটা। মরতে হবে অর জন্য। কখন আনসাররা আসিয়া পড়ে।

আনসার শুনিয়া তরুণী দুটির মুখ শুকাইয়া যায়। তারা এদিক-ওদিক তাকায়; তাদের ছোট ভাইটি কিন্তু আনথাল বলিয়া হাসিয়া ওঠে।

পরাশর বলে, হাসিও না খোকা। আনসার হাসির জিনিস না।

যুবকটি তাকে বলিল, চলেন, আমরা আউগাইয়া যাই। জল নিশ্চয়ই মেলবে। আপনার ছাওয়ালরে আমরা ভাগাভাগি করিয়া নেব খন।

আবার পথ চলা শুরু হয়। যুবকটির কাঁধের উপরে যাদব, পিছনে তার দু'টি বোন, তার পরে তাদের বাপ-মা—প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া; প্রৌঢ়ের হাত ধরা তার ছোট্ট ছেলে। সকলের পশ্চাতে মোহিনী ও পরাশর।

তরুণীদের একজনের হাতে টিনের সুটকেশ, অপরটির হাতে বোঁচকা; তাদের মা মোটা মানুষ, চলিতে কষ্ট হয়, তার হাতে বেশি কোনো জিনিস নাই, শুধু একটা পুঁটলিতে কয়েকখানি কাঁথা-কাপড়।

রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠের শেষ প্রান্তে দেখা যায় গাছের সারি। হলুদ রঙা শাড়ির প্রান্তে যেন স্নিগ্ধ সবুজ একটা পাড়। মোহিনীর মনে পড়ে নিজের গ্রাম সারাতলির কথা। সেখানে নিজেদের সবুজ বাগান ছিল, ছিল টিনের ঘর, ধানের গোলা, হাল, গরু, লাঙ্গল। বাগানে আম লেবু তাল নারিকেলের সারি, নিচে ছোট্ট খাল। খাল যেমন ছোট-ছোট ঢেউ বুকে করিয়া চলে, ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা লইয়া তাদের জীবনও তেমনি চলিত।

সেই গ্রাম ছাড়িয়া আসিতে হইল।

তার আগে মোহিনী ও যাদব তিনদিন জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল। পরাশর বাড়ি ছিল না। ছেলের হাত ধরিয়া মোহিনী পশুর মতন এ জঙ্গল হইতে ও জঙ্গলে লুকাইয়াছে।

মাঝে মাঝে চিৎকার শোনা যাইত, গেলাম রে গেলাম, মরলাম। রক্ষা কর, রক্ষা কর।

সব চেয়ে করুণ রূপী নাপতানির আর্তনাদ। মানুষ-পশুর হাতে লাঞ্ছিতা

মেয়েটির সেই কাতরানি মোহিনী কখনও ভুলিতে পারিবে না। ভোলা অসম্ভব।

একদিকে কাতরানি আর একদিকে হিংস্র উল্লাস।

আকাশ এক-একবার লাল হইয়া যায়। ওঠে আগুনের বড় বড় গোলা, মনে হয় শয়তান আগুন লইয়া ফুটবল খেলিতেছে।

তিন-তিনটা দিন সে কী নরক যন্ত্রণা! সেই জঙ্গলেই যাদবের জ্বর হয়, ম্যালেরিয়া। তিনদিন পরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সেরাজুল হক তাদের রক্ষা করে। কার্যোপলক্ষে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। গ্রামে ফিরিয়া মহকুমা হাকিমের নিকট লোক পাঠাইয়া সশস্ত্র পুলিস আনাইলেন। হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি খোঁজ করা হইল, জঙ্গলে জঙ্গলে নিজে গিয়া ডাকিলেন, কে লুকাইয়া আছ? বাইর হইয়া আইস, ভয় নাই।

তাঁর কথা শুনিয়া ভীত মানুষগুলা বাহির হইয়া আসে। তাদের মূর্তি দেখিয়া তিনি ভয় পান, এ কী! তিন দিনে মানুষ এমন করিয়া বদলায়? তাদের তিনি মহকুমায় পাঠাইয়া দেন। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পরাশরের দেখা হয় সেইখানে।

কয়লার অভাবে স্টীমার বন্ধ। মহকুমা হইতে তা'রা রওনা হয় হাঁটা পথে।

তাদের দলে এক সারাতলি গ্রামেরই ছিল সাত-সাতটা পরিবার।

পথে খাল বিল অনেক, দুইটা বড় নদী। রাস্তায় খেয়াঘাটে স্বেচ্ছাসেবীরা, আনসাররা ধরিল, গহনা নিয়া চললা কোথায়?

পাকিস্তানের সোনা-রূপা চুরি করিয়া পালাবা ভাবছ?

মাথা প্রতি দশ টাকার বেশি নিতে দেব না। বাড়তি টাকা থুইয়া যাও।

একে একে অনেক জিনিসই ছাড়িয়া আসিতে হইল। কারও সঙ্গে রহিল শুধু পরনের কাপড়। যাদবের অসুস্থতার জন্য পরাশররা পিছনে পড়িয়া গেল। তারা যখন রেল স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল তখন হাতে ট্রেনের মাশুল দেওয়ার মত পয়সাও ছিল না।

পথে একদল আনসার ধরিল, একি, করাত কেন? করাত ছেনি বাটুল, এ সব নিতে পারবা না।

পরাশর বলিল, এ আমার রোজগারের হাতিয়ার। এই দিয়া ছাওয়াল বউরে খাওয়াইয়া রাখি। দোহাই আপনাগো, এগুলো রাখবেন না।

তার আবেদনে কোন ফল হইল না। তবে একটা জিনিস রক্ষা পাইল –

শুধু ছোট্ট একখানা শৌখিন করাত। কালো কুচকুচে হাতল, মনে হয় মেহগনির তৈরি।

পরাশর একজন ভাল মিস্ত্রী। শুধু অন্নের জন্যই সে কাজ করে না, করে শিল্প সৃষ্টির আনন্দে। তাদের আশে পাশে অনেক গ্রামে তার হাতের সুন্দর বহু কাজ আছে। সেরাজুল হকের বাড়িতে কাঠের মস্ত বড় একটা মূর্তি তার অন্যতম। দেখিলে মনে হয় জীবন্ত কোনো মানুষ উবু হইয়া পায়ের কাঁটা তুলিতেছে।

হক সাহেব খুশি হইয়া নিজের নামাঙ্কিত এই করাতখানি উপহার দেন আর দেন একখানি প্রশংসাপত্র।

জিনিসটা কোনো কাজে লাগিবে না বলিয়াই হয়ত আনসাররা ছোট্ট এই করাতখানি তাকে ফিরাইয়া দিল।

বেলা বাড়ে। পথের ধারে আগে তবু দু'চারটা গাছ ছিল, এখন তাহাও নাই। এ যেন ধূসর মরু, রোদ গায়ে ছুঁচের মতন বেঁধে, পায়ে বেঁধে রোদে পোড়া ঘাসের ডগা। পথ ধুলায় ঢাকা, কোথায়ও যাত্রীদের গোড়ালি পর্যন্ত ধুলায় ডুবিয়া যায়। বাস্তুহারাদের পিছু পিছু চলে ধুলির ওড়না, তাতে সূর্যও যেন ঢাকা পড়ে। মলিন দেখায়। ধুলায় যাদবের গলা আটকাইয়া আসে, সে কাশে খুকখুক করিয়া।

তবে তাদের নূতন প্রৌঢ় সঙ্গীটি পথের কষ্টকে অনেকটা হালকা করিয়া দিল। বলিল, এ আর এমন কি কেলেশ? এর চাইয়াও অনেক বেশি বিপদে পড়ছি।

পরাশর বলে, এর থাও বিপদ! এ আপনি কন কি?

হ'মশয়, প্রৌঢ় বিপদের কয়েকটি গল্প করে, সবই তার নিজের জীবন-কাহিনী। গল্পগুলি রোমাঞ্চকর, দিনের বেলায়ও গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয় মিথ্যা, তবু শ্রোতারা অবাক হইয়া শোনে।

এর পর সে দেয় নিজের পরিচয়। নাম তার পতিতপাবন। লোকে ডাকে ঘাতক বলিয়া। এক কোপে সে বড়-বড় মহিষ কাটিতে পারে, তাই এই নামকরণ হইযাছে।

লোকটি তাদের নিজের দেশের কথা বলে। তাদের দেশ কাছেই, এখান হইতে বিশ-পঁচিশ মাইল দূর। সেখানে কোন উপদ্রব হয় নাই। হিন্দু-

মুসলমানরা এখনও সদ্ভাবে পাশাপাশি বাস করে। তবে ভদ্রলোকরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। দেখাদেখি চাষী-মজুররাও যাইতেছে। তার বাড়ির সিকি মাইলের মধ্যে কোনো লোক নাই; স্বজাতি এমন একজনও নাই যে মরার সময় মুখে এক ফোঁটা জল দেয়, মরার পর দেহ কাঁধে করে। দেশে থাকিবে কিসের ভরসায়? কার উপর নির্ভর করিয়া? তাই দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছে।

সঙ্গে টাকা-কড়িও কিছু আছে, জমি কেনার মতন কিছু টাকা আর কলসীতে বীজ ধান। হিন্দুস্থানে পেঁছিয়াই সে ধানের জমি কিনবে, চাষ করিবে।

টাকার কথা বলায় তার স্ত্রী গলা খাঁকারি দিল। ঘাতক বলিল, কাশ কেন? আমি লোক চিনি। এনারে বিশ্বাস করা যায়। ইনি অতি মহাশয় লোক। তার পরই পরাশরকে বলে, ইনি আমার গোরিনী কুমুদিনী, লোকে ডাকে কুমুদ। আমার বাপ আর অর জ্যাঠা ছিল মিতা। লোকে কয়, আমি অরে পছন্দ করিয়া বিয়া করছি।

আর কুমুদ কয়, আমারে দেইখ্যা অর পছন্দ হইছিল। হইতেও পারে। এগার-বার বছরের মাইয়ার মনে হয়ত একটু কাঁচা রং ধরছিল—বলিয়াই হাসে – ভারি প্রাণখোলা হাসি।

আবার শুরু করে, আমার ছোট-ছাওয়ালটির নাম হাবীর—ভারি বুদ্ধিমন্ত। পাঁচজনে কয়, বাপকো বেটা। মাইয়া দুইটি ছায়া আর কায়া। রোগাটি কায়া আর স্থূলটি ছায়া। ছায়া মায়ের মতন।

ছায়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়ে। কুমুদিনী স্বামীর উদ্দেশে আরও জোরে গলা খাঁকারি দেয়।

ঘাতক বলে, বড় ছাওয়াল পেরতাপ মায়ের মতন হইলে আরও ভাল হইত।

ফুলা গাল, তার মধ্যে চোখ যেন বসিয়া গেছে।

প্রতাপ বলে, তুমি থাম বাবা।

এই সময় দূরে দেখা যায়, কালো একটা রেখা। ঘাতক ঐদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাদবও চোখ মেলে। কিন্তু তার চোখ ছিল পূব দিকে, রেখাটা পশ্চিমে। সে ধূলায় ঢাকা আকাশ ছাড়া কিছুই দেখিতে পায় না।

একটুক্ষণ চাহিয়া পরাশর বলে, একদল মানুষ নাকি?

ছায়া বলিল, যদি মোছলমান হয়?

মোছলমান ? কুমুদিনীর গলায় ধূলা আটকাইয়া গেল। মোহিনী চোখ বুজিয়া ঠাকুরের নাম আওড়াইল।

পরাশর বলিয়া উঠিল, দেশ ভাগ করছে ! যত সব—

কালো রেখা স্পষ্ট হয়, আরও বড় হয়। দেখা যায় সত্য সত্যই একদল মানুষ আসিতেছে।

ধ্বনি ওঠে, আল্লা হো—

নির্মেঘ আকাশে বজ্রনির্ঘোষ হইলেও পরাশররা এতটা আঁতকাইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। প্রতাপ ছাড়া সকলেরই মুখ কালো হইয়া গেল। ছায়া ও কায়া সমস্বরে ডাকিল, বাবা।

আল্লা হো, আল্লা—আওয়াজ ক্রমেই জোরে হ '

প্রতাপও পালটা আওয়াজ করে, বন্দে—

হাম্বীর হাসিয়া বলে, আনথাল—

পরাশর বলে, এই কি হাসির সময় খোকা ?

ঘাতক বলে, হাসিস কেন রে হাম্বীর ?

সমাজের এই আলোড়ন ও বিপ্লব, বড়দের ভীতি হাম্বীরের শিশু মনে শুধু হাসিরই খোরাক জোগায়। সে আবার হাসিয়া বলে, আনথাল।

মুসলমানদের দলে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েই বেশি, আর বোরকাপরা কয়েকটি স্ত্রীলোক। পুরুষ ছিল দশ-বারটি।

প্রতাপ বলিল, মাইয়া লোক আর কাঁচ কাঁচা লইয়া কেউ লড়তে আসে না। তোমাদের কোনো ভয় নাই, মা।

ঘাতক বলিল, অরাও হয়ত ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পূব দিকে চলছে।

পরাশর বলিল, গুনতিতে অরা বেশি। যদি প্রতিশোধ নেয় ?

প্রতাপ বলিল, ঐ কয়জনরে আমি আর ব াবাই কিছুক্ষণ রোখতে পারব, কি কও বাবা ?

ঘাতক বাহুর গুলি ফুলাইয়া বলে, তা পারব, গতরে সে জোর এখনও আছে।

তাদের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় আর একদল হতভাগ্য মানুষ, চোখে সমান হতাশা, চেহারায় একই রূপ রিক্ততার ছাপ। পুরুষের কাঁধে গাঁটরি-বোঁচকা, বগলে বিছানা, নারীর কোলে শিশু, হাতে বদনা। এরাও ঘর-বাড়ি হারাইয়াছে, সর্বস্ব খুয়াইয়াছে। কারও বাপ মরিয়াছে, কারও ভাই, কারও স্ত্রী। মায়ের চোখের সামনে দুর্বৃত্তরা ছেলেকে মারিয়াছে।

দূর হইতে মানুষ দেখিয়া তারাও ভয়ে আওয়াজ করিয়াছিল, আল্লা হো।

মাথায় ফেট্টি বাঁধা একটি যুবককে দেখিয়া মোহিনীর মনে পড়িল তার জ্ঞাতি দেবর জয়ানের কথা। তার মাথায়ও ছিল ঐ রকম ফেট্টি। মহকুমায় আসিয়া ছেলেটি ধনুষ্টংকারে মরিয়া গেল।

সামনে আসিয়া একদল আর একদলের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দু'দলের দৃষ্টিই শান্ত, স্থির, তাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই। তাদের চোখে শুধু একটি প্রশ্ন, তোমাদেরও এই দশা ভাই? এ করল কে? কা'রা?

প্রশ্নের সঙ্গে ছিল সহানুভূতি, মানুষে মানুষে দরদ। বোরকার আড়াল হইতে নারীর মৌন চাহনিতেও সেই সহানুভূতি ফুটিয়া বাহির হইল।

উভয় দলই আবার চলিতে আরম্ভ করে, চলে বিপরীত দিকে। এবার কেহ আর আল্লা হো আকবর বলিয়া আওয়াজ করে না, বন্দে মাতরমও নয়। তাদের সহানুভূতি ধ্বনির জগৎ ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

একটু পরে মোহিনী বলিল, অদের কাছে জল আছে কিনা দেখলে হইত।

ঘাতক বলিল, মাইয়াদের বুদ্ধিই ঐ রকম। সাধে কি কইছে, পথে নারী বিবর্জিতা।

আরও খানিকটা পথের পর রাস্তার পাশেই ছায়া-আশ্রয় মিলিল। টলটলে জলে ভরা বড় একটা দিঘি; চার পারে শাল, শিমুল, অশোক, অর্জুন গাছ। পূব পারে ধ্যানমগ্ন মুনির মতন জটাজুটলম্বিত এক বট।

চার পারে মানুষের অসম্ভব ভিড়। পূব দিকে অপেক্ষাকৃত কিছু কম। অনেকে স্নান করিতেছে। যুবারা সাঁতার কাটে; তাদের পায়ের আঘাতে জলের উপর যেন কতগুলি সাদা ফুলের তোড়া ফুটিয়া ওঠে।

মেয়েরাও জলে নামিয়াছে, তারা পারের কাছে দাঁড়াইয়া কুলকুচা করে, মুখ ধোয়, গা মাজে।

ছোট-ছোট কতগুলি চুল্লীর উপর হাঁড়ি কড়াইয়ে চাল-ডাল সিদ্ধ হয়। পাশেই কেহ ভাত খায়, কেহ চিড়ামুড়ি। আর একদল শুধু খাওয়া দেখে, জিভ দিয়া ঠোঁটের দুই কোণ চাটে।

ছেলেকে ছায়ায় শোয়াইবার জন্য মোহিনী জায়গা খোঁজে। চলে অতি সন্তর্পণে, হাঁড়ি-কুড়ি বাক্স-পেঁটরা এড়াইয়া। কিন্তু কথাটা কারও কাছে তুলিতে ভরসা করে না।

শেষটায় সুন্দরী এক তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার রোগা ছাওয়ালটার জন্য একটু জায়গা হবে? আজ কয়দিন অর জ্বর।

তরুণী বলিল, জায়গা ত আমার কেনা না। কিন্তু এখানে কি বসবেন?

আমার ছাওয়ালের ঘন ঘন দাস্ত হইতেছে।

মোহিনী বলিল, না, না—তা হইলে থাউক।

শেষটায় আশ্রয় দিল এক বৈষ্ণবী। শ্যামবর্ণ, টিকলো নাক, গলায় তুলসীর মালা, নাকে রসকলি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গঠন ঋজু ও সুঠাম। সে নিজে রৌদ্রে সরিয়া বসিয়া গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় যাদবকে শোয়াইয়া দিল। কমণ্ডলু হইতে জল ঢালিয়া খাওয়াইল। যাদব দুই-এক ঢোক খাইয়াই মুখ ঘুরাইয়া নিল।

বৈষ্ণবী বলিল, জল ফুটাইয়া নিছি। তাই একটু গন্ধ আসে।

একটু পরে যাদব ঘুমাইয়া পড়িল।

বৈষ্ণবী বলিল, তোমাদের দেশে কি অত্যাহিত কিছু ঘটছে?

মোহিনী তাঁদের গ্রামের হত্যা ও অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা দিয়া বলিল, আপনাদের গাঁয়ে?

বৈষ্ণবী উত্তর করে, আমার গাঁ বলিয়া কিছু নাই। আমার রাধাবল্লভরে নিয়া নবদ্বীপ চললাম।

এখানে নাকি পেটের পীড়া হইতেছে?

সোজা পেটের পীড়া না, একেবারে বিসূচী।

কলোরে!

কলেরা কথাটা কেউ মুখে আনে না। কয় দাস্ত হইতেছে।

মরছে কেউ?

আমি কাল আইছি, তারপর দুইজন মরছে।

মোহিনী বলিল, এখন কী করি কন দেখি? রোগা ছাওয়ালরে রোদ্দুরে নিয়া গেলে মাথায় রক্ত উঠিয়া মরবে। এখানেই বা থাকি কি করিয়া?

ভয় নাই। রাধাবল্লভ ওরে বাঁচাবেন।

বৈষ্ণবীর কাছে ছেলেকে রাখিয়া মোহিনী স্নান করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুমুদ দু'খানা ইঁট দিয়া উনান বানাইয়া তার উপর হাঁড়ি চড়াইয়া দিয়াছে।

সে মোহিনীকে বলিল, তোমাদের দুজনের চাউলও চড়াইয়া দি? তুমি ছাওয়াল নিয়া থাক।

মোহিনী বলে, দরকার নাই। চারটি চিড়া আছে।

চাউলের জন্য ভাবিও না। বাড়তি চাউল আমাগো আছে। আজ দুইদিন তোমরা ভাত খাও নাই।

মোহিনী ইতস্ততঃ করে। স্বামীর দিকে তাকায়। সে বলে, আমরা বাঘা ক্ষেত্রি। আপনারা কি জাত?

ঘাতক বলিল, আমরা তে'তুলে বিছা।

সে কি! তে'তুলে বিছা ত শুনি নাই!

আপনাদের পালটা ঘর। আমাদের ছোঁয়া আপনারা খাইতে পারেন।

পরাশর বলে, পরিহাস করলেন বুঝি?

প্রতাপ ধমক দিয়া উঠিল, তুমি চুপ কর বাবা। এখনও জাত আর জাত। আমাগো লজ্জা আর হবে কবে?

ফুটন্ত ভাতের গন্ধ বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারধারে ছোট-ছোট অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আসিয়া জড় হয়। কেহ উলঙ্গ, কেহ নেংটি পরা, গায়ে ময়লা, চোখ বসিয়া গিয়াছে। তা'রা হাঁড়ির ভিতরের শাদা জলের দিকে তাকায়। ক্ষুধায় কারও কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, কারও চোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

কুমুদিনী একটা থালায় ভাত ঢালিলে বুভুক্ষুর দল তার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। সে বলিল, আমার সোয়ামী আর ছাওয়ালরে আগে খাওয়াইয়া লই। তারপর তোমরা পাবা। এখন একটু সরিয়া যাও দেখি।

কেহ কেহ অনিচ্ছায় দু'চার পা পিছাইয়া যায় বটে কিন্তু কে আগে পিছাইবে ইহা লইয়াও নিজেরা থাক্কাধাক্কি করে। কুমুদিনী ধমকায়, এ রকম করলে একটা কণাও দেব না।

গরম ভাতে হাত দিয়া হামুর আঙ্গুল পোড়াইয়া ফেলিল। কুমুদিনী ধৈর্য হারাইয়া বুভুক্ষু ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকাইয়া বলিল, তোরা দিষ্টি না দিলে হামুর হাত পোড়ত না। যা মড়ারা, দূর হ।

একজনের মা কাছেই ছিল। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, কেন রে, পোড়ামুখী লক্ষীছাড়া? এক মুঠা চাউলের এত দেমাক! চাউল কি আমরা দেখি নাই? অমন কত চাউল হাঁসরে কাউয়ারে খাওয়াইছি।

কুমুদিনীর আর খাওয়া হয় না। সে গ্রাস দুই-তিন ভাত মুখে তুলিয়াছে, এই সময় বুভুক্ষুরা আবার তাকে ঘিরিয়া ধরে। সে নিজের খাবার বিলাইয়া দেয়। সময় কাটে। সন্ধ্যার একটু আগে দিঘির ওপারে ওঠে কান্নার রোল, তোরে শেষে এইখানে ছাড়িয়া গেলাম, এই মড়ার দিঘিতে?

পরাশর ঘাতককে জিজ্ঞাসা করিল, আর একজন গেল বুঝি?

ঘাতক ইতিমধ্যেই দু'তিনবার দিঘির চার পাশ ঘুরিয়া আসিয়াছে। অনেকের

সঙ্গে আলাপ জমাইয়াছে। সে বলিল, হ, আমরা আসার আগেও নাকি গেছে।

পরাশর বলিল, এ কন কি ?

ঘাতক বলিল, রোজই দুই-একজন মরে। ফেলে পূব দিকের মাঠে, দিঘির নিচে। আমি হাড়গোড় দেখছি। যাবেন নাকি দেখতে ?

পরাশর বলিল, রক্ষা করেন।

সন্ধ্যার আঁধার নামে। চারদিকের আর কিছুই দেখা যায় না, এমন কি পাশের লোককেও নয়, এ যেন ব্ল্যাক আউটের রাত। লোকে ভয়ে আলো জ্বালে না। বিড়িখোরেরা হাতের তেলোয় আড়াল করিয়া বিড়ি ধরায়। বিশেষ প্রয়োজনে আলো জ্বালিতে হইলে তার উপর ঠুলি পরাইয়া লয়।

আঁধার-গম্ভীর এই পারিপার্শ্বিকের মাঝে গেরুয়া রংয়ের থলের ভিতর হইতে একতারা বাহির করিয়া বৈষ্ণবী গান ধরে,

একতারা তোর বাজা—
আসবে সোনার রথে চড়ি
তোর হৃদয়ের রাজা।
নাই বা থাকল শঙ্খ-ঘণ্টা
নাই বা মালসাভোগ—
হিসাব নিকাশ কিসের ওরে,
কিসের দুঃখশোক ?

চমৎকার কণ্ঠ। তরুণীর কণ্ঠের মতন কোমল অথচ চড়া, একতারার বোলের মতন মিষ্টি। গান আঁধারের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করে, বাতাস মূর্ছনায় ভরিয়া যায়।

সে থামিলে একটি তরুণী আসিয়া বলিল, আর এক খানা গাও দিদি। আমার ছাওয়াল শোনতে চায়।

মোহিনী এই মেয়েটির কাছেই আশ্রয় চাহিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ছাওয়াল আছে কেমন ?

তরুণী বলিল, ভাল না। সে ওনার গান শোনতে চায়।

বৈষ্ণবী আবার ধরে,

আমার গৌরী হবেন রাধা
তার সুরেতে এ বীণ আমার
থাকবে সদাই সাধা।

শেষরাত্রে মোহিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভোরে উঠিয়া দেখে, বৈষ্ণবী যাদবের শিয়রে বসিয়া গুনগুন করিতেছে।

পাশে কুমুদিনীদের জায়গাটা ফাঁকা। সেখানে কতগুলি ভিজা চিড়া পড়িয়া আছে। এক চড়ুই দম্পতী খুঁটিয়া খুঁটিয়া উহা খায়। একটু দূরে সারি বাঁধিয়া পিঁপড়ারা চিড়া মুখে করিয়া বাসার দিকে চলে। কুমুদিনীদের জন্য মোহিনী দুঃখ করে, বিশেষ করিয়া হামুবীরের জন্য।

স্নানান্তে বৈষ্ণবী জল লইয়া ফিরিল। সেই জলে রাধাবল্লভকে স্নান করাইয়া তাঁর পূজা করিল। ঠাকুরকে পিতলের কৌটার ভিতর মখমলের তোশকে শোয়াইবার সময় বলিল, ঠাকুর ছাওয়ালটিরে সারাইয়া তোল।

পরাশর উঠিল বেলা করিয়া। দিঘির পাড়টা তখন আরও ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, পেরতাপ, ঘাতকদা, এরা গেল কোথায় ?

মোহিনী বলিল, আমি ওঠার আগেই তারা চলিয়া গেছে।

পরাশর বলে, গেছে ত দেখতেছি সবাই। খালি আমাগো কপালেই যাওয়া হবে না।

বৈষ্ণবী বলিল, সবই রাধাবল্লভের লীলা।

পরাশর বলিল, থুইয়া দেন আপনার লীলা। ভারী ক্ষ্যামতার গোঁসাই তিনি।

বৈষ্ণবী ধীরে ধীরে রাধাবল্লভের নাম আওড়ায়।

সারাদিনে আসিল মাত্র দুইটি নূতন দল। পরাশর বলিল, পাকিস্তান শেতল হইয়া গেল নাকি ?

যাদবের অবস্থা একই রকম। আগের দিন কুমুদিনী বার্লি দিয়াছিল। আজ বার্লি নাই, যাত্রীদের কাছে চাহিয়া সাবু, বার্লি এমন কি একটু চিনিও পাওয়া গেল না। মিলিল শুধু মুড়ি।

জলে ভিজানো সেই মুড়ি খাইতেও যাদবের কষ্ট হয়। কণ্ঠনালীতে আটকাইয়া যায়। পরাশর হাল ছাড়িয়া দেয়। ভিজা মুড়ি গিলিতে যার কষ্ট হয়, হাঁটার কষ্ট সে সহ্য করিবে কেমন করিয়া ?

পরদিন আরও তিন-চারটি দল চলিয়া গেল। নতুন একটিও আসিল না। জায়গাটা ফাঁকা হইয়া গেল। যাদব চাহিল বৈষ্ণবীর গান শুনিতে—গাও না গৌরীর গানটা।

বৈষ্ণবী শুনাইল—

গৌরী হবেন রাধা—

বার-বার গাহিল।

পরাশর বৈকালের দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে দিঘির পূবপারে আসে। চারটা পারের মধ্যে এইটাই সুন্দর। দেবদারু অশোক পলাশের ছাওয়ায় ঘেরা, মাঝে মাঝে ছোট ঝোপ।

হঠাৎ পূবের মাঠের দিকে চোখ পড়ায় দেখে কতগুলি মড়ার খুলি, হাড়-গোড়। শবের উপর শকুনি বসিয়া। কাকে চিলে শবের চোখ ঠোকরায়, নাড়িভুঁড়ি টানিয়া বাহির করে।

পরাশরের মনে প্রশ্ন জাগে, সবই কি বাস্তুহারাদের হাড়গোড়, না আগেও এখানে শ্মশান ছিল. লোকে শব সৎকার করিত ?

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। ধীরে ধীরে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে চলিয়া আসিল।

নির্জন জায়গা। কোণে শেওড়া ঝোপের পাশে ছেলে কোলে একটি নারী ঘুমাইয়া আছে। তার কোমরের নিচের দিক রোদ, উপরের দিকটা ছায়া। অন্ধকার মুখের উপরই বেশি, মনে হয় কে যেন একটা কালির পোঁচ টানিয়া দিয়াছে।

পরাশরের পায়ের তলায় শুকনা পাতার মর্‌মর্‌ শব্দে শিশুটির ঘুম-ভাঙিয়া যায়। সে মায়ের ডান স্তনটাকে কুলপি মালাইয়ের মতন ধরিয়া চুষিতে আরম্ভ করে। দুধ না পাইয়া কাঁদে, মাথা দিয়া মায়ের বুকে ঢুঁ মারে, চেঁচায়। মা সাড়া দেয় না। ছেলের কচি হাতের আঘাতে তার একখানা হাত বুকের উপর হইতে নিচে গড়াইয়া যায়। হাত পা মাথা কলের পুতুলের মতন কাঁপে।

পরাশর এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দৃশ্যটা তার মনে দোলা দেয়। সে ভাবে, এই যে কাতারে কাতারে মানুষ মরণকে এড়াইবার জন্য ভিটাবাড়ি ছাড়িয়া অচিন দেশে চলিল, মৃত্যুকে তা'রা এড়াইতে পারিল কই ? বরং পথে পথে নূতন শ্মশানের সৃষ্টি করিল।

শিশুটি পরাশরের দিকে কচি দু'খানা হাত বাড়াইয়া দেয়, হাত পা বাড়াইয়া যেন কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়।

পরাশর আর থাকিতে পারে না, তাকে কোলে তুলিয়া নেয়। শিশুটি সঙ্গে সঙ্গেই চুপ করে।

তাকে কোলে করিয়া সে অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘোরে। ভাবে শিশুটির মায়ের কথা। আহা, বেচারী ওখানে একা পড়িয়া আছে। পূবের

ঐ মাঠই ত ওর যোগ্য স্থান। সেখানে আর পাঁচটা শবের সঙ্গে তাকে রাখিতে পারিলে কী ভালই না হইত!

অন্ততঃ পরাশরের আত্মা তাহাতে তৃপ্তি পাইত সন্দেহ নাই।

এই সময় বৈষ্ণবী আসিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি চলেন, আমাগো আস্তানা গুটাইতে হবে।

কেন? এত রাত্তিরে—বলিয়াই পরাশর অদূরে বাস্তুহারাদের দিকে তাকায়। তাদের মধ্যে দেখে একটা ত্রস্ত চাঞ্চল্য। তারা সলা-পরামর্শ করে, গুজুর গুজুর করে, গাঁটরি-বোঁচকা বাঁধে। মনে হয় এখনই রওনা হইবে।

বৈষ্ণবী বলিল, দুইজন লোক শুনিয়া আইছে, বেশি রাত্রে মুসলমানেরা এখানে চড়াও হবে।

পরাশর বলিল, ওঃ!

বৈষ্ণবীর পিছু পিছু সে স্ত্রীপুত্রের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মোহিনী জিনিস গুছাইতেছিল। পাশে যাদব শুইয়া। সে বাপের দিকে মিটমিট করিয়া তাকাইল। তার চাহনি প্রশ্ন করিতেছিল, তোমার কোলে কে ও?

মোহিনী যেন রাগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। একটু পরে সে বলিল, ফেলাইয়া দেও ওটারে। অর মা কলোরেতে মরছে, সর্বাঙ্গে অর বিষ।

পরাশর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

মোহিনী বলিল, নিজের ছাওয়ালেরে পথের কাঁটা কইয়া গাল দিছ। এদিকে কুড়াইয়া আনছ আর একটা বিষ-কাঁটা।

কাঁটাই ত, একশো বার কাঁটা—পরাশর কথাটা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করে বটে কিন্তু গলার পর্দা নামিয়া যায়। নিজের কাজের সমর্থন পাওয়ার জন্য সে বৈষ্ণবীর দিকে তাকায়। বৈষ্ণবীও কোন কথা বলে না।

পরাশরের রাগ হয়, মনে হয়, কী বিচিত্র এই মানুষের মন! পরশু দিন পর্যন্ত এখানে অনেক লোক ছিল, কলেরার রোগীই ছিল কয়েকটি। সবাই ঠাসাঠাসি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বাস করিয়াছে।

আজ মানুষ কম, রোগী মোটেই নাই, আছে শুধু শেষ রোগিণীর স্মৃতি চিহ্ন, তার বুকের মাংসের এই দলাটুকু। সে টুকুকে এরা ভয় করে, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে চায়!

মোহিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। এবার বলিল, বেশ আরে লইয়াই থাক।

পরাশর নীরব।

একটু পরে মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি শোন নাই কিছু?

শুনেছি ত, কিন্তু এত রাত্তিরে অন্ধকারের মধ্যে—

মোহিনী বাধা দিয়া বলিল, আর সবাই গেলে আমরাই বা থাকব কি করিয়া?

পরাশর বলিল, তাও ত ঠিক।

সন্ধ্যার আগে দুইজন বাস্তুহারা দক্ষিণের মাঠে বেড়াইতে যাইয়া শুনিয়া আসিয়াছে যে মুসলমানেরা আজ গভীর রাত্রে দীঘির পারে চড়াও হইবে। বয়স্কদের জেরায় তা'রা পরস্পর বিরোধী কথা বলে বটে কিন্তু বাস্তুহারারা সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এখনই এ জায়গা ছাড়িয়া যাইবে।

স্ত্রীর কাছে সব শুনিয়া পরাশর একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা চললেন কোথায়?

লোকটি উত্তর করিল, ভগবান যেখানে নেন। কেন, আপনি যাবেন না?

যাব ত। কিন্তু এই আঁধারে, অচেনা পথে কোন ভরসায় যাব?

থাকবেনই বা কিসের ভরসায়? বরং কিছু দূরে গেলে গ্রাম পাইতে পারি, হিন্দুর গাঁ।

পরাশর বলিল, গাঁ-টা যদি মোছলমানের হয়?

দয়ালু মোছলমান থাকলে তাঁরা আমাগো বাঁচাবেন। সবাই ত আর কাঠ মোল্লা না।

কিন্তু এখানে যে ঝামেলা হবে তারই বা বিশ্বাস কি?

আমাগো নিজের লোক শুনিয়া আইছে, বামুনের পায়ে হাত দিয়া তারা কইছে।

পরাশর বলিল, ওঃ।

প্রায় সবাই তখন তৈরি। বাকি শুধু পরাশরের মালপত্র গোছানো। মোহিনী সব বাঁধিয়া লইতে পারে নাই। পরাশর শিশুটিকে মাটিতে রাখিয়া গাটরি-বোঁচকা বাঁধিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি কান্না জুড়িয়া দিল।

মোহিনী বলে, কী উৎপাতই না জোটাইছ!

পরাশর কোনো উত্তর করে না। পাশের লোকটি বলে, একটু তাড়াতাড়ি করেন, মশাই।

মিনিট খানেক যাইতে না যাইতেই অপর একজন বলিল, আপনার জন্য

সবাই শেষটায় এইখানেই মরব দেখছি। তাছাড়া জোটাইছেন একটা জ্যান্ত বিষ।

পরাশরের ভারি রাগ হয়।

এই সময় মোহিনী বলিল, মালের বোঝার উপর আমি আর বোঝা বাড়াইতে পারব না কিন্তু।

যাত্রা শুরু হয়। পরাশর কাঁধের উপর তোরঙ্গ তুলিয়া নেয়, পিঠে বোঁচকা। এক কোলে নেয় যাদবকে আর এক কোলে শিশুটিকে। ছোট ছোট দশ-বারটি দল অন্ধকার ভেদ করিয়া চলে। পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে আলো জ্বালে না। তারা নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলে না, পা ফেলে আলতো ভাবে।

পরাশরের বোঝা বেশি, তাই তার চলিতে কষ্ট হয়। সে পিছাইয়া পড়ে।

সামনের লোকেরা ডাকে,পা চালাইয়া আসেন মশায়।

তাদের সঙ্গে দূরত্ব যতই বাড়ে, এই তাগিদও ততই কমিতে থাকে। শেষপর্যন্ত আর শোনা যায় না।

বৈষ্ণবীও আগের লোকদের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। পরাশররা মাত্র চারজন, তা'রা স্বামী-স্ত্রী, যাদব ও নূতন শিশুটি।

পরাশর বরাবরই চুপ করিয়াছিল। সে শুধু একবার বলিল, এমন রাধা-বল্লভের জীবটাও চলিয়া গেল। এরই নাম বরাত।

মাঝে মাঝে বাজ চিল শকুনি ডানা ঝাপটা দেয়, হুতুম পেঁচা ডাকে শিয়াল হুকা হুয়া করিয়া ওঠে। মোহিনীর মনে হয় এই সমস্ত অলক্ষণ কুলক্ষণের কারণ নূতন পথের কাঁটা মা-বাপ হারা ঐ ছেলেটা। শক্তি থাকলে সে হয়ত তাকে দিঘির পূবদিকের মাঠে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত।

দূরে শব্দ হয়, অস্পষ্ট শব্দ—অনেকটা আল্লাহোর মতন।

মোহিনী বলে, ঐ ঐ—

পরাশর ধমক দেয় অত ভয় কিসের? যা হবার হবে।

হওয়ার আর বাকী রাখছ নাকি কিছু? পথের ঐ কাঁটা জোটাইয়া এখন—

পরাশর গর্জন করিয়া উঠিল, বেশি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিস ত সবাইরে ফেলিয়া একদিকে ছুটিয়া যাব—তোরে, যাদবরে, এই হারামজাদারে। পথের কাঁটা আর একটাও রাখব না।

মোহিনী ভয়ে ভয়ে চুপ করে। তার স্বামীর পক্ষে আজ তাদের এখানে ফেলিয়া যাওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়, যেমন বিচিত্র নয় ঐ হতভাগাটাকে কুড়াইয়া আনা। সে যাদবকে ছুঁইয়া নীরবে স্বামীর পাশে পাশে চলিতে থাকে।

অবলম্বন

রামকুমার অনাথ আশ্রমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভবভূতি বাবুর দুর্নাম ছিল অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া। লোকে বলিত, দীর্ঘকাল তামাক টানিবার ফলে রবারের নলের ভিতরটা যেরূপ কড়া হইয়া যায়, অনেকদিন ছেলে পিটাইতে পিটাইতে ভবভূতির অন্তরটাও সেইরূপ শুষ্ক কঠোর হইয়া গিয়াছে।

তাই রবিবার স্কুলে আসিয়া তিনি যখন পঞ্চম মানের নবেন্দুকে ডাকিয়া পাঠান এবং সে আফিস-ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্রই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ হইয়া যায়, তখন ছেলেরা ভাবিল ভবভূতিবাবু নবেন্দুর পিঠের চামড়া এক জায়গায় আর মাংস এক জায়গায় করিয়া তবে ছাড়িবেন। কোন ছেলেকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস-ঘরে ডাকিয়া পাঠাইবার যে আর কিছু অর্থ থাকিতে পারে, ইহা ছিল তাদের কল্পনারও অতীত।

কিন্তু নবেন্দু খানিকক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিল এক বাক্স চকোলেট লইয়া।

ছেলেরা ত' অবাক, তাদের বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখের সামনে সে দু'খানা চকোলেট শেষ করিবার পর তারা তাকে ঘিরিয়া ধরিল চকোলেটে ভাগ বসাইবার জন্য। মণ্টেগু একখানা চকোলেট মুখে পুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'স্যার তোকে ডেকে-ছিলেন কেন ?'

নবেন্দু উত্তর করিল, 'উনি জিজ্ঞসা করলেন ছেলেবেলার কথা আমার কিছু মনে পড়ে কি না ?'

'তুই কি বললি ?'

'বললাম, কিছু মনে নেই।'

যাদব বলিল, 'তোকে চকোলেট দিলেন কেন ?'

নবেন্দু এ প্রশ্নের কোন উত্তর করিতে পারিল না।

সোমবার প্রাতে আবার তার ডাক পড়িলে ছেলের দল পিছু পিছু যাইয়া জানালার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিল। তারা জানে—ধরা পড়িলে মার খাইতে হইবে, কিন্তু কৌতূহল তখন তাদের ভীতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

নিজেরা ধাক্কাধাক্কি করায় সমস্ত ব্যাপারটা কোন একজনের চোখে পড়ে নাই। এক এক জনে খানিকটা করিয়া দেখিয়াছে মাত্র।

মণ্টেগু কহিল, 'নবেন টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে আর স্যার দাঁড়িয়ে তার পাশে মেজেয়।'

গোবিন্দ বলিল, 'দু'জনেই হাঁ ক'রে চেয়ে আছে আয়নার দিকে।'

দৌলতরাম দেখিয়াছে স্যারকে নবেন্দুর সঙ্গে হাতের আঙুল মিলাইতে। আর সকলের শেষে দেখিয়াছে যাদব, স্যার তখন নবেন্দুর মুখে হাত বুলাইতেছিলেন।

নবেন্দু বাহিরে আসিয়া প্রায় অনুরূপ বিবরণই দিল।

ভবভূতিবাবুকে ছেলেরা ভয় করিত যমের মতন। কাহাকেও আদর করা দূরে থাক কেউ কখনও তাঁর মুখে মিষ্টি কথাও শোনে নাই। তাই ভবভূতির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সকলে বিস্মিত হইল!

ব্যাপারটা রহস্যময়, ইহার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। নোটিশের অপেক্ষা না করিয়াই বিভিন্ন স্থানে ছেলেদের বৈঠক বসিল। কয়েকজন আলোচনা আরম্ভ করিল পিছনে পিয়ারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া, এক দলের সভা বসিল কমনরুমে, আর এক দলের ছাদের উপর।

ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারে সর্ব্বদল সম্মেলনে যেমন নানা প্রকার সম্ভব ও অসম্ভব সমস্যা উঠে, ছেলেদের কল্পনাও সেইরূপ নানামুখে ধাওয়া করিল। মীমাংসা কিছুই হইল না। তবে, একটু বড় এবং বিজ্ঞেরা ভবিষ্যদ্বাণী করিল যে, স্যারের শীঘ্রই অসুখ করিবে।

আট বছর আগে ভবভূতিবাবুর একমাত্র পুত্র হারাইয়া যায়। পুত্রশোকে তাঁর স্ত্রী মহামায়ার মানসিক বিকৃতি ঘটে এবং বছর খানেক ভুগিয়া তিনি পরলোকগমন করেন।

সেই হইতেই ভবভূতিবাবুর সংসারের উপর কোন আসক্তি নাই, সর্ব্বদাই একটা সংসার-বিরক্তির ভাব।

প্রথমে তিনি যখন আশ্রমে যোগদান করেন, তখন মনে করিয়াছিলেন, ছেলেদের সংস্পর্শে দুঃখের অনেকটা লাঘব হইবে; চেষ্টাও করিয়াছিলেন দুএকটি শিশুকে আপনার করিয়া লইতে।

কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর মনে হইল, ঐরূপ কোনও আকর্ষণে বাঁধা পড়িলে

হারানো ছেলের স্মৃতির অমর্য্যাদা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথিত হইবেন তাঁর পরলোকগতা স্ত্রী।

আজকাল তাই ছেলেদের তিনি এড়াইয়া চলেন। এক এক বার এই অবৈতনিক কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার কথাও তাঁর মনে হয়।

ঠিক এই সময় ভবভূতি একখানা উড়ো চিঠি পাইলেন, চিঠির খবর প্রৌঢ়ের সমস্ত অস্তিত্বটার উপরই একটা নাড়া দিয়া গেল, বদলাইয়া দিল তাঁর জীবনের ধারা।

চিঠিখানায় ছিল যে, তাঁর হারানো ছেলে বরুণ বাঁচিয়া আছে এবং আশ্রয় পাইয়াছে তাঁরই পরিচালিত আতুরআশ্রমে।

প্রথমে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন খবরটা উপেক্ষা করিতে। উড়ো চিঠির আবার মূল্য কি? বিশেষতঃ, যার সাহায্যে ছেলেকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কোন উপায় নাই।

কিন্তু যতই উপেক্ষা করিতে চান তাঁর সুপ্ত সন্তান-স্নেহের ক্ষুধা ততই বাড়িয়া যায়। ভাবেন, কি স্বার্থ পত্র-প্রেরকের ঐরূপ খবর জানাইয়া? পুত্র যাহাতে পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত না হয়, পিতা যাহাতে হারানো পুত্রকে পাইয়া তৃপ্ত হন—হয় ত' এই সাধু উদ্দেশ্যেই সে এই চিঠিখানা লিখিয়াছে।

কিন্তু কে বরুণ, তাহা জানায় নাই কেন?

ছেলেদের গায়ে নিজের প্রহারের দাগ দেখিয়া ভবভূতির মনটা চঞ্চল হইয়া উঠে। বরুণ এই আশ্রমে আশ্রয় পাইয়া থাকিলে তাঁর কঠোর যষ্টি ত' বরুণের উপরও পড়িয়াছে—যার শরীরের প্রত্যেক রেণু তাঁরই রক্ত মাংসে গঠিত।

মনে মনে তিনি হিসাব করিয়া দেখেন এতগুলি ছেলের মধ্যে কে তাঁর বরুণ।

বরুণ থাকিলে এখন তার বয়স হইত বার।

বার বছর যাদের বয়স তাদের অনেকেরই পিতৃ-পরিচয় আশ্রমের রেজেষ্টারীতে লেখা আছে। যাদের নাই, তার মধ্যে ষড়ানন 'ল'কে বলে 'ন' লাউকে বলে 'নাউ'; কৃত্তিবাস বাতাসাকে বলে 'বাছাথা,' দশকে 'ধছ'। তারা যে বরুণ নয় এই কুৎসিত উচ্চারণই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

আর কয়জনের চেহারা ও ধরণ ধারণ ভদ্রসন্তানের মত নয়, বুদ্ধিবৃত্তিও অতি নিম্নস্তরের। বার বছরের একটী মাত্র ছেলে আছে নবেন্দু, যার শান্ত শ্রী, তীক্ষ্ন বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল চোখ দু'টী দেখিলে মনে হয়, পরিচয়-বিহীন এই তরুণ নিশ্চয়ই ভদ্রসন্তান।

কিন্তু সে-ই যে বরুণ, তার প্রমাণ কোথায়?

কথাটা নিজের মনে মনে আলোচনা করিয়া প্রথমে ভবভূতি লক্ষ্য করিলেন যে, নবেন্দুর সঙ্গে নিজের মুখের খানিকটা সাদৃশ্য আছে ! এই সাদৃশ্যটা ক্রমে তাঁর চোখে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় একদিন নবেন্দুকে মাথা নোয়াইতে দেখিয়া ভবভূতির মনে হইল মহামায়ার মাথা নোয়াইবার ভঙ্গীও ছিল এইরূপ। শুধু তাই নয়, পাশে দাঁড়াইয়া দেখিলে আনত-শির নবেন্দুর মুখের সঙ্গে মহামায়ার মুখের আদর্শও অনেকটা মিলিয়া যায়।

শেষটায় একদিন তিনি নবেন্দুকে আফিসে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, শৈশবের কোনও কথা তার মনে পড়ে কি না।

শৈশবের কথা নবেন্দু কিছুই বলিতে পারিল না। বলিবেই বা কেমন করিয়া ? নিজের চার বছর বয়সের কথা ত' ভবভূতিরও কিছু মনে নাই। আরও কয়েকজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছেন, তারাও বলিতে পারে না।

ভবভূতি তারপর আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেদের চেহারা মিলাইলেন, মুখের গড়ন ছাড়া এবার ধরা পড়িল আরও দুইটা সাদৃশ্য, চোখের ও আঙুলের। চোখের ভাব দু'জনেরই গভীর অথচ উদার। কল্পনাপ্রবণ লোকের আঙুলের মতন দু'জনেরই আঙুল সূক্ষ্মাগ্র।

প্রমাণগুলি ক্রমে ক্রমেই ভবভূতির চোখে অকাট্য মনে হইতে লাগিল, তাঁর স্থির-বিশ্বাস জন্মিল নবেন্দুই তাঁর হারানো বরুণ।

একদিন নবেন্দুকে নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া মহামায়ার ফটোর সামনে দাঁড় করাইয়া ভবভূতি কহিলেন, 'এঁকে চিনলে ?'

নবেন্দু চাহিয়া দেখিল সুন্দরী একটি মহিলার প্রতিকৃতি, মুখে একটা শান্ত উদার ভাব।

ভবভূতি বলিলেন, 'বরুণ, ইনি তোমার মা, এঁকে প্রণাম কর।'

নবেন্দু কিছুই বুঝিতে পারিল না, কে বরুণ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাহাকে তার মা বলিতেছেন !

ভবভূতি সব কথা খুলিয়া বলিলেন।

চির অনশন-ক্লিষ্ট একজন দরিদ্রকে যদি প্রভূত ধনৈশ্বর্য্যের সামনেআনিয়া বলা হয়, এসব তোমার—তাহা হইলে সেই সৌভাগ্যকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে তার যেমন ভয় মিশ্রিত সঙ্কোচ বোধ হয়, চির স্নেহ-বঞ্চিত নবেন্দুর অবস্থাও হইল সেইরূপ।

এই তার মা, এই সুসজ্জিত কক্ষে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধান তার মার প্রতিকৃতি ?

এই বড় বাড়ী, চারিদিকে ঐশ্বর্যের চিহ্ন—এসবের মালিক বলিতেছেন, সে তাঁর পুত্র।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বড মানুষ—সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু এতটা যে বড় সে-ধারণা ত' তার ছিল না।

সে যে এই সংসারের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, ইহা বিশ্বাস করিতে নবেন্দুর ভাল লাগে বটে; কিন্তু সাহসে কুলায় না।

গতবার বিজয়ার দিন একটু বেশী সিদ্ধি খাওয়ায় যেরূপ ভাব হইয়াছিল, আজ ঠিক সেইরূপ তার মাথা টলিতে লাগিল, বুকের ভিতর সে অনুভব করিল একটা দ্রুত স্পন্দন।

বাষ্প-ভারাকুল কণ্ঠে ভবভূতি কহিলেন, 'তোমার মা ছিলেন এক জন—'

কথা শেষ হইল না, কিন্তু বিপত্নীক প্রৌঢ়ের রুদ্ধকণ্ঠ ভাষার চেয়ে অনেক কিছু বেশী প্রকাশ করিল।

সে রাত্রে ভবভূতি নবেন্দুকে নিজের বাটীতেই রাখিলেন।

নিজের বাড়ীতে নানারূপ অসুবিধা থাকায় ভবভূতি নবেন্দুকে আশ্রমেই রাখিয়াছেন। জামা, কাপড়, জুতা—সবই তার জুটিয়াছে ধনীর সন্তানের মতো। ভবভূতির রুদ্ধ পুত্র-স্নেহে ভাদ্রের বান ডাকিয়াছে।

নবেন্দুর সঙ্গে অন্য ছেলেরাও তার স্নেহের ভাগ পাইল, আশ্রমের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভাল হইতে লাগিল; প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগের প্রতি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিজে নজর দিতে লাগিলেন।

তিনি মার-ধর বন্ধ করায় অন্য মাষ্টারদের ব্যবহারও নরম হইল, দূরে হইল আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার সম্পর্কের ব্যবধান।

দীর্ঘকাল পরে ভবভূতিও পায়ের তলায় যেন শক্ত মাটির সন্ধান পাইলেন। এতদিন তাঁর মনে হইত যে, সংসারে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন চোরাবালির উপর!

কয় মাস পরের কথা।

বিছানায় শুইয়া ভবভূতির মনে পড়িতেছিল অতীত যৌবনের স্মৃতি, তাঁর বিবাহ-রাত্রি, প্রথম প্রেম। বয়স তখন কম, হৃদয়ে ছিল অনন্ত আশা, অফুরন্ত আকাঙ্খা জীবনকে ভোগ করিবার, প্রত্যেক আনন্দকে প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিবার সেদিন যে শক্তি ছিল, আজ আর তা নাই।

স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিলে, একমাত্র সন্তান হারাইয়া না গেলে, হয়ত সেই সরসতা

আরও কিছুদিন থাকিত। আজ বরুণকে ফিরিয়া পাইয়াও কিন্তু সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিলেন না মহামায়ার অভাবের জন্য। যখনই নবেন্দুকে আদর করেন তখনই মনে হয় মহামায়ার কথা। কী কষ্ট পাইয়াই না তিনি মারা গিয়াছেন!

আজ তিনি থাকিলে কত আনন্দই না হইত, মুখে তাঁর ফুটিয়া উঠিত একটা মধুর হাসি।

ভবভূতি স্ত্রীর ছবির দিকে চাহিলেন, তাঁর চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল মহামায়ার মুখের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, হাসির সময় তাঁর দুই গালেই টোল পড়িত ডান ভ্রূর উপরে ছিল একটা কালো কুচকুচে তিল।

ভবভূতির অন্তরঙ্গ বন্ধু জলদ দাশগুপ্ত বলিতেন, 'পণকুঁচের উপর কালো ফোঁটাটির মতন ঐ তিলটিতে মুখের শ্রী বাড়িয়াছে।'

মহামায়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিতেন।

নগেন গুপ্ত বলিয়াছিলেন, উহা সৌভাগ্যের লক্ষণ। আরও বলিয়াছিলেন, বরুণের তিলের কথা। কথাটা স্পষ্ট মনে পড়ে না। কিন্তু এটা ঠিক যে, বরুণের একদিকে বগলের নীচে একটা তিল ছিল। আর নগেন গুপ্ত সেই লক্ষণটা ভাল কি মন্দ বিচাব করিবার জন্য অনেক পাঁজিপুঁথি ঘাটিয়াছিলেন।

এতদিন একথাটা ভবভূতির মনে পড়ে নাই, অথচ কত সহজ উপায়ই না ছিল পুত্রকে চিনিয়া লইবার।

তার ভয় হইল যদি নবেন্দুর তিল না থাকে। ঐরূপ সম্ভাবনাও তাঁকে পীড়া দিতে লাগিল, একটি ছোট তিলের কথা কাড়িয়া নিল তাঁর ঘুম, মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ আলোড়িত করিয়া তুলিল।

খুব ভোরেই তিনি আতুর আশ্রমে যাইয়া নবেন্দুকে ডাকিয়া তুলিলেন, তাকে বলিলেন, গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিতে।

তাঁর চোখ ও মুখের ভাব দেখিয়া নবেন্দু কেমন যেন ভয় পাইয়া গেল।

সে জামাটা খুলিয়া ফেলিলে ভবভূতি প্রথমে তার ডান ও পরে বাঁ হাত তুলিয়া দেখিলেন। কোন দিকেই তিল এমন কি একটা ছোট দাগ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

ভবভূতির চোখের উপর আকাশটা যেন একরাশ বাষ্পে ছাইয়া গেল। নিকটেই একটা চেয়ারে বসিয়া চোখ বুজিয়া নিজের কপালের উপর তিনি দু'টি আঙুল বুলাইতে লাগিলেন।

নবেন্দুর সাহস হইল না কোন প্রশ্ন করিবার, সে দাঁড়াইয়া রহিল ভূতাবিষ্টের

মতো। খানিকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল,' আমি কি একটু বাইরে যেতে পারি?'

ভবভূতি মাথা না তুলিয়াই শব্দ করিলেন—'হুঁ'

প্রবঞ্চকের পাল্লায় পড়িয়া পিতলকে সোনা বলিয়া কেনার পর মানুষের নিজের উপর যেমন ধিক্কার জন্মে, ভবভূতিরও সেইরূপ রাগ হয় নিজের উপর। তিনি মনে করিলেন যে, চিঠিটা একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ফল, তাঁর রাগ হইল পত্র-লেখকের উপর এবং সেই ষড়যন্ত্র যাকে অবলম্বন করিয়া সফল হইয়াছে, সেই হতভাগ্যের উপর। তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে নবেন্দুর দায়িত্ব ইহাতে কতখানি।

সেই দিন হইতেই নবেন্দু হারাইল ভবভূতির স্নেহ, ভবভূতি হারাইলেন মানসিক শান্তি।

তাঁর মনে হইত সকলে তাঁকে উপহাস করে, মনে করে একখানা উড়ো চিঠিতেই মানুষটা কত বড় বোকা বনিয়া গিয়াছে।

নবেন্দুর মূর্ত্তি তাঁকে স্মরণ করাইয়া দেয় এই সব কথা, তাই তার প্রতি কথায়, প্রত্যেক কাজে ভবভূতি ত্রুটী ধরেন। কোনও অপরাধ না করিয়াও সে ধমক খায়, অন্যে যেখানে পায় ভর্ৎসনা, সে পায় গুরুতর শাস্তি।

ক্রমে ক্রমে তার অবস্থা দাঁড়াইল পল্লীগ্রামের দাগী আসামীর মতো। আশ্রমের জীবনটাই নবেন্দুর অসহনীয় মনে হইল! একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের কাপড়, জামা, বাক্স, বই—সব ফেলিয়া রাখিয়া সে আশ্রম হইতে চলিয়া গেল।

ভবভূতি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন। মনে হইল আপদ চুকিয়াছে, নবেন্দুর অনুপস্থিতিতে আর সকলে ধীরে ধীরে তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টা ভুলিয়া যাইবে।

কিন্তু এই ব্যাপারেও মনের হিসাব-নিকাশ করিতে তিনি ভুল করিলেন অনেকখানি। নানা কাজের মধ্যে তার মনে পড়ে নবেন্দুর প্রতি নিজের অত্যাচারের কথা। ভবভূতি দেখিলেন মহামায়ার স্বামীর পক্ষে নবেন্দুর সেই প্রণামের ভঙ্গী ভুলিয়া যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

দিন যায়। কালের দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে আয়নার উপর ধূলার সূক্ষ্ম পর্দ্দার মতো নবেন্দুর স্মৃতির উপরও একটা আবছায়া পড়িয়াছে বটে, ভবভূতি ভাবেন হৃদয়ের ক্ষতও শুকাইয়াছে। কিন্তু তিনি নিজেও জানেন না স্পর্শমাত্রেই সেই কোমল ক্ষত হইতে রক্তধারা ছুটিয়া বাহির হইতে পারে।

তিনি ব্যস্ত থাকিতে চেষ্টা করেন ছেলেদের লইয়া। কিসে তাদের পড়াশুনার উন্নতি হয়, নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়, ইহা দেখাই এখন তাঁর প্রধান কাজ।

শীতকালে, চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়াইয়া ছেলেরা স্নান করিতেছিল, শীতের কনকনানি কাটাইবার জন্য সকলেই চেঁচাইতেছে, কেহ গান গাহিতেছে, কেহ ইংরেজী কবিতা আওড়াইতেছে, কেহ দিতেছে শিস।

হঠাৎ তারা থামিয়া গেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখিয়া। তিনি রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিলেন এই সময় দেবেশের ডান হাতের বগলের নীচে একটা তিল দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

দেবেশ ছেলেটিও বুদ্ধিমান; ভদ্রলোকের ছেলের মত তার চেহারা কিন্তু দেখিতে বড় সড়, বয়স বছর পনের হইবে; তাই ছেলের খোঁজ করিতে করিতে কোন দিন দেবেশের কথা ভবভূতির মনে হয় নাই। কল্পনাও করেন নাই যে, সেও হইতে পারে তাঁর হারানো বরুণ।

তিনি অফিস ঘরে আসিয়া দেবেশের রেকর্ড দেখিলেন; তারও পরিচয় অজ্ঞাত, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অসুস্থ অবস্থায় তাকে চিংড়িপোতায় পাওয়া গিয়াছিল। আশ্রমের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রায় বাহাদুর হরিচরণ সেন ছেলেটীকে এখানে লইয়া আসেন। তখন দেবেশের বয়স ছিল আনুমানিক ছয় কি সাত; ছয় হইলে—এখন বয়স দাঁড়ায় চৌদ্দ।

হয়ত তাকে বরাবরই বড় দেখায়, বয়স তাই বেশী করিয়া লেখা আছে। বড় দেখাইত বরুণকেও, পাছে কারও নজর লাগিয়া ছেলে রোগা হইয়া যায়, সেই ভয়ে মহামায়া তাকে বড় একটা কারও সামনে আনিতেন না।

রায় বাহাদুর হরিচরণ সেন পরলোকে, দেবেশের সম্বন্ধে সংবাদ লওয়ার প্রধান পথটাই রুদ্ধ। তবে ভবভূতি আশ্রমের পুরাতন কর্ম্মচারী ব্রজকান্ত বাবুর নিকট দুই-একটা সংবাদ পাইলেন।

ভর্ত্তি হওয়ার দিন ছেলেটী তার নাম বলে কুড়ানচন্দ্র। কুড়ানো ছেলে বলিয়া লোকে তাকে ঐ নামে ডাকিত। তার দেবেশ নামকরণ করেন ব্রজকান্ত।

ভর্ত্তি হওয়ার পর দিনই দেবেশকে হাসপাতালে পাঠানো হয়. সেখান হইতে মাসখানেক পরে সে যখন ফিরিয়া আসে তখন তার পূর্ব্বের স্মৃতি একেবারেই লোপ পাইয়াছিল।

তবে দুই-একবার সে বলিয়াছিল যে, শৈশবে তার বাবাকে ডাকিত 'বাবু' বলিয়া।

ভবভূতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার ঠিক মনে আছে ?'

'হ্যাঁ।'

আশ্চর্য্য মিল। মহামায়া স্বামীর সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার সময় বলিতেন, 'বাবু বেরিয়ে গেছেন।' 'বাবুকে বিরক্ত ক'র না বরুণ।' তাঁর দেখা-দেখি বরুণও পিতাকে বাবু বলিয়া ডাকিত।

দেবেশকে প্রশ্ন করায় সেও কহিল, বাবাকে সে বাবু ডাকিত বলিয়া মনে পড়ে।

কিন্তু ভবভূতির প্রধান সন্দেহ রহিল বয়স লইয়া, বারো আর পনেরর তফাৎ যে অনেক!

তিনি ডাক্তার দিয়া দেবেশকে পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তাররা অনুমান করিলেন বয়স চৌদ্দ কি পনেরই হইবে।

তারপর উঠিল উভয়ের রক্ত পরীক্ষার কথা। হয়ত রক্তের ধারা লক্ষ্য করিয়া বোঝা যাইবে দেবেশ ভবভূতির পুত্র কিনা।

ডাক্তারবা বলিলেন, 'ঐরূপ পরীক্ষা ইউরোপে কিছু কিছু চলিতেছে বটে; কিন্তু তাহাও অনুমানমূলক। এদেশে ঐ সম্বন্ধে কোন বিশেষজ্ঞই নাই।'

এইরূপ সংশয়ের মধ্যেই দু'টা সপ্তাহ কাটিয়া গেল, চিংড়িপোতায় যাইযাও ভবভূতি কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

কয়েকদিন পরে তাঁর সন্দেহ-দোদুল চিত্তে স্থিরতা আনয়ন করিলেন এক জ্যোতিষী। তিনি ভবভূতির কোণ্ঠী বিচার করিয়া কহিলেন, 'গ্রহাদির সন্নিবেশ হইতে মনে হয় যে, হারানো পুত্র প্রাপ্তির সময় তাঁর উপস্থিত হইয়াছে।'

এইবার ভবভূতির বিশ্বাস হইল যে, দেবেশই তাঁর পুত্র।

তারপর দিনই তিনি তাকে নিজেব বাড়ীতে লইয়া গেলেন, মহামায়ার ছবি দেখাইয়া বলিলেন, 'তুমি হারিযে যাওযায সে আঘাত আর তোমার মা সহ্য করতে পারেন নি। তোমাকে ফিরে পাব বলেই বোধ হয় আমি বেঁচে ছিলাম।'

ইহা বলিয়া দেবেশের দিকে ফিরিতেই চোখে পড়িল—তার কপালের উপর একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন। বছব খানেক আগে ভবভূতির বেত্রাঘাতে বেচারীর কপালটা কাটিয়া গিযাছিল, রক্ত পড়িযাছিল দরদর করিয়া। সেই চিহ্ন বহন করিয়া তাঁরই মাতৃহীন পুত্র আসিযা সম্মুখে দাঁড়াইযাছে; এ দাগ মুছিবে না তাঁর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত।

সঙ্গে সঙ্গে ভবভূতির চোখে ভাসিয়া উঠিল আশ্রমের অনেকগুলি ছেলের মূর্ত্তি। তারা কেহ মুখে, কেহ নাকে, কেহ পিঠে তাঁরই নিষ্ঠুরতার স্মৃতি বহন

করিতেছে। তিনি দেবেশের কপালের দাগটার উপর হইতে চোখ ফিরাইলেন।

একটু পরে কহিলেন, 'তোমার মা তোমাকে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিতেন, তুমি তখন খিল খিল ক'রে হাসতে। মায়া বলতেন, এই হাসিমুখের একখানা ছবি রাখলে ভাল হয়।'

দেবেশের কল্পনায় এই অপরিচিত জগতের আনন্দোজ্জ্বল একখানি ছবি ভাসিয়া উঠিল। তার স্নেহময়ী মা ছিলেন, বাবা ছিলেন, একটা সংসার ছিল। এ জগতে স্রোতের তৃণের মত নিতান্তই নিরলম্বভাবে সে ভাসিয়া আসে নাই?

ছোট বড় যাহা কিছু পায় তাহা অবলম্বন করিয়াই মানুষ নিজের একটা স্বতন্ত্র জগত সৃষ্টি করিয়া ফেলে, আর নিজে তার চারদিকে ঘুরিতে থাকে— কক্ষস্থ গ্রহের মতো। সকলের জীবনেই এইরূপ একটা ভার-কেন্দ্র থাকে।

এতদিন ভবভূতির জীবনে ইহারই ছিল অভাব; মাঝে নবেন্দু তাহা মিটাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে অতি অল্পকালের জন্য। এবার প্রৌঢ়ের মনটা বাঁধা পড়িল দেবেশকে কেন্দ্র করিয়া।

দেবেশ থাকে ভবভূতির বাড়িতে, তার পড়াশুনা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিতেই তাঁকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। আশ্রমের উপর লক্ষ্য রাখিবার ভবভূতির মোটেই সময় নাই, সেখানে সকল বিষয়েই চলিতেছে একটা বিশৃঙ্খলা।

পড়াশুনার ব্যাঘাতে ছেলেরা অবশ্য অসুখী হইল না—কিন্তু গোলমাল বাধিল খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধার জন্য। নবেন্দু থাকিতে ছেলেরা ভাল খাবারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন মাছ, ডাল, তেল এমন কি চাউল পর্য্যন্ত, সকল জিনিষেই চুরি আরম্ভ হওয়ায় ছেলেরা পেট-পুরিয়া খাইতে পায় না, অথচ অভিযোগ করিবারও তাদের ভরসা নাই।

আর একটা ব্যাপারেও তারা উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। ভবভূতি দেবেশের সঙ্গে কথায় কথায় তাদের তুলনা করেন। কেহ একটা অন্যায় করিলে বলেন, 'আমার দেবেশ হ'লে এ কাজ করতো না।' কাহাকেও একবারেরও বেশী দুইবার পড়া বুঝাইয়া দিতে হইলেই ভবভূতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন বলেন, 'দেবু এটা চট ক'রে বুঝে নিত, তোরা পারিসনে? আর হবেই-বা-না কেন, সে ত'—'

এই ইঙ্গিত ছেলেদের মর্ম্মস্থলে যাইয়া বেঁধে! তারা শুধু যে, ভবভূতির

উপরই অসন্তুষ্ট হয় এরূপ নয়, দেবেশকেও ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে উপহাস করতে ছাড়ে না।

দু'টা বৎসর ভবভূতির স্নেহ পাইয়া স্বাস্থ্য ও মনের দিক দিয়া দেবেশের বিস্ময়কর পরিবর্তন হইল, চোখ দুইটা দেখিলেই মনে হয় বুদ্ধি-শ্রী জ্বল জ্বল করিতেছে। যেরূপ ছেলে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের আনন্দের কারণ হয়, দেবেশ হইয়াছে ঠিক তেমনটী।

দু'বছরের মধ্যেই প্রাইভেট পড়িয়া সে ম্যাট্রিকুলেশনের উপযোগী হইয়াছে ; শুধু উপযোগী নয় তার গৃহ-শিক্ষক পুলিনবাবু বলেন, 'অনেক ছেলেই তিনি পড়াইয়াছেন, কিন্তু এরূপ তীক্ষ্ণধী দেখিয়াছেন খুব কম। প্রাইভেট না দিলে নিশ্চয় সে বৃত্তি পাইত।'

ভবভূতি বলেন, 'আচ্ছা, আই এ'তে দেখা যাবে।'

দেবেশকে লইয়া তাঁর অপরিসীম আনন্দ, তা'কে বড় করিবেন, তার বিবাহ দিবেন, আবার নূতন সংসার হইবে, এই কামনায়ই তিনি বিভোর হইয়া থাকেন। তবে এই সকল সুখের মধ্যে মাঝে মাঝে মহামায়ার অভাব তাঁকে পীড়িত করিয়া তোলে—এমন ছেলেকে মায়া দেখিলেন না।

ইনস্পেক্টর আফিসে টেষ্ট পরীক্ষা দেওয়ার কয়েকদিন পরে দেবেশ জ্বরে পড়িল এবং জ্বরের দ্বিতীয় দিনেই প্রকাশ পাইল নিউমোনিয়ার লক্ষণ।

ভবভূতি জলের মত টাকা খরচ করিলেন। প্রত্যহ বত্রিশ টাকা ফি'র ডাক্তার আসিতে লাগিলেন।

রোগের সপ্তম দিনে সন্ধ্যাব সময় ভবভূতির সকল স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেবেশ অজানা লোকের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

মৃত্যুর খানিকক্ষণ পূর্বে সে একবার অস্ফুট স্বরে ডাকিল, 'বাবা।'

ভবভূতি ইহার পূর্বে দেবেশের মুখে এই ডাক শুনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবেশের কেমন লজ্জা করিত,সে কখনও তাঁকে বাবা ডাকিতে পারে নাই।

আজ মৃত্যুর পূর্বে সে কাতরস্বরে একবার 'বাবা' ডাকিয়া নিজের পূর্বকৃত অপরাধের জন্য যেন ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া গেল।

অশ্রুহীন চক্ষে, স্থির পদক্ষেপে প্রৌঢ় একাই তাঁর পুত্রের দেহ খাটিয়ায় তুলিয়া দিয়া বন্ধুদের বলিলেন, 'তোমরা দেবুকে নিয়ে যাও; আমি একটু পরে আসছি।'

শ্মশানে দেবেশের দেহ পোড়াইয়া ফিরিবার পথে ভবভূতি কারও সঙ্গে একটা কথা বলিলেন না। গাড়ীর বাহিরে তিনি চাহিয়াছিলেন আকাশের দিকে। সেখানে অসংখ্য তারকা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। দেবেশ উহার মধ্যে কোনটায় চলিয়া গেল, সেখানে কি মহামায়া আছেন, উভয়ের কি আবার দেখা হইবে ?

গাড়ী হইতে নামিয়াই তিনি ডাকিলেন, 'দেবু. শুনে যাও।'

তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল, ভবভূতি ইহার মধ্যে একবারও বাটীর বাহির হ'ন নাই। কখনও মহামায়ার, কখনও বা দেবেশের ছবির দিকে চাহিয়া আপনমনে কি যেন বলেন।

বন্ধু বান্ধবদের আশঙ্কা হইল, ভদ্রলোক পাগল হইয়া যাইবেন। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বায়ু পরিবর্তন করিতে।
কিছুদিন পরে টেস্টের খবর বাহির হইল, গণিত ভিন্ন দেবেশ সকল বিষয়েই প্রথম হইয়াছে। অঙ্কেও পাইয়াছে আশীর উপর।

ভবভূতি এবার সকলকে এই খবর জানাইতে আরম্ভ করিলেন। ইনস্পেক্টর আফিসে টেস্ট পরীক্ষায় যে এত নম্বর পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়ও সে প্রথম দশজনের মধ্যে হইতে পারে কি না, এই বিষয়ে মতামত সংগ্রহই তাঁর উদ্দেশ্য। অনেকেই বলিলেন, 'দেবেশ বাঁচিয়া থাকিলে কম্পিট করিত।'

কয়েকদিন পরে ভবভূতি আশ্রমে খবর পাঠাইলেন, তিনি দুপুরে সেখানে যাইবেন এবং রীতিমত ক্লাশ নিবেন।

তাঁর স্থির পদক্ষেপ ও প্রশান্ত উদার দৃষ্টি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। একটা মানুষ যখন আত্মস্থ হইতে পারে—তখনই তার পক্ষে এই সৌম্য মূর্ত্তি সম্ভব।

ভবভূতি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে Wordsworth-এর 'We are seven' পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন, 'ভাই-বোনে তারা ছিল সাত জন, এই গণনায় মৃতেরা বাদ পড়ে নাই। কবি বলতে চান, যারা মরেছে তারাও আমাদের সঙ্গে আছে। বাস্তব চক্ষে আমরা তা'দের দেখতে পাই না, মেয়েটিও দেখতে পেত না। কিন্তু তার অনুভূতিতে তার মৃত ভাই-বোনগুলিও ছিল—তারই আশে-পাশে।'

বলিতে বলিতে প্রৌঢ়ের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

এই সময় ক্লাশে এক নোটিশ আসিল, ভবভূতি ছেলেদের তাহা পড়িয়া

শুনাইলেন, 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছেলেদের লইয়া সন্ধ্যার শো'তে সিনেমায় যাইবেন, পাঁচটায় বাস আসিবে, ছেলেরা যেন প্রস্তুত থাকে।'

বেলা পাঁচটায় বাস আসিলে ছোটদের ধরিয়া ভবভূতি গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। ছেলেরা সকলে উঠিলে, নিজে যাইয়া উঠিলেন পিছনের গাড়ীতে। সিনেমার 'সিট' আগেই রিজার্ভ ছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া ভবভূতি ছেলেদের দেখাইয়া ম্যানেজারকে বলিলেন, 'এই আমার ছেলেরা এসেছে।'

তারপর তাদের দিকে চাহিয়া অর্দ্ধ-স্বগতোক্তি করিলেন, 'My boys.'

ম্যানেজার স্মিতহাস্য করিয়া বলিলেন, 'বাঃ, বেশ ছেলেগুলি।'

ছবি আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে ঘরখানা অন্ধকার হইয়া গেলে ছেলেরা একটা হুল্লোড় তুলিয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই ভবভূতি বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'My boys.'

এ ছেলেরা যে তাঁর। তারা যদি উপযুক্ত ব্যবহার না করে, তবে যে কলঙ্ক হইবে ভবভূতিরই।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গলা শুনিয়াই ছেলেরা চুপ করিয়াছিল।

পর্দ্দায় ছবির পর ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে, রাজার প্রসেশন, সবচেয়ে বড় জাহাজ ভাসানোর উৎসব, আরও কত কি!

তারপর আরম্ভ হইল 'অলিভার টুইষ্ট'।

গল্পের দিকে ভবভূতির কোন খেয়াল ছিল না, তাঁর লক্ষ্য শুধু ছেলেদের দিকে। তারা ঠিক দেখিতে পাইতেছে কিনা, তাদের কোনও অসুবিধা হইতেছে কিনা, সেই সবের প্রতি।

একটি নবেন্দু, একটি দেবেশ চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাদের জায়গায় তিনি আজ পাইয়াছেন এই এতগুলি স্নেহপুত্তলি।

ফল্গু

নার্স, ঔষধ আর টেম্পারেচার—আনতির সমস্ত দিনটা কাটিয়া যায় ইহাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া। শরৎকালের সূর্য্যের উজ্জল আলো, দুগ্ধ-ধবল জ্যোৎস্না সবই যেন অর্থহীন হইয়া আসিতেছে।

অবশ্য তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই, একদিন ত' এইরূপ হইতই, হয় দু'দিন আগে নয় পরে।

সেদিন ঝাউগাছের ফাঁক দিয়া একরাশ আলো আসিয়া ঘরে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। আনতির ইচ্ছা হইল উঠিয়া গিয়া ঐ আলোকধারায় স্নান করে সমস্ত অঙ্গে ঐ আলো মাখিয়া নেয়।

কিন্তু উঠিবার তার শক্তি নাই। বিছানায় শুইয়াই অপলক-দৃষ্টিতে তার জীবন-দীপের মত নিভন্ত ঐ সূর্য্য-রশ্মির দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু মানুষের সকল সুখের মতো শরতের বৈকালী আলোর আয়ুও সংক্ষিপ্ত, সেও ফুরাইয়া যায়, তারপর আসে অন্ধকার—আনতির হৃদয়ের অন্তস্তলের হতাশার মত।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে নার্স মিস দে আসিয়া আলো জ্বালিয়া টেবিলের উপর কেসের মধ্য হইতে থার্ম্মোমিটার বাহির করিলেন।

আনতি কহিল, 'ওটা রেখে দিন।'

'ডাক্তাররা বলেছেন দিনে চারবার জ্বর দেখতে।'

'তারা ভুলে যান যে রোগীরা মেসিন নয়। ওটা মুখে রাখলেই যে আমার কাসি আসে।' তারপর একটু থামিয়া আনতি কহিল, 'বুঝতে পারছি জ্বর এখন একশ' হবে।'

মিস্ দে থার্ম্মোমিটার রাখিয়া দিয়া বলিলেন, 'তবে একটু দুধ খান।'

আনতি বলিল, 'দুধ থার্ম্মোমিটারের বিকল্প বুঝি?'

রোগিণী জ্বরের উত্তাপ দেখিতে রাজী নয়, পথ্যও সে খাইবে না। মিস দে জানিতেন সে একলা থাকিতেই ভালবাসে, তাই বাহির হইয়া গেলেন।

আনতি বলিল, 'ঘরের আলোটা নিভিয়ে বারান্দারটা জেবলে দিয়ে যান।'

ছেলেবেলা হইতেই মানুষের জ্বালানো আলো সে পছন্দ করে না, কেমন যেন গরম বোধ হয়, অস্বস্তি লাগে।

অন্ধকারে মনটা তার বাহির হইতে ভিতরের দিকে ফিরিয়া আসে, মনে পড়ে অনেক কথা।

কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারে না কখন কোন কাজ কি উদ্দেশ্যে করিয়াছে। সে জানে না নিজের মনের গোপন কোণের গূঢ় রহস্য, জানে না অম্বুজের সঙ্গে প্রণতির বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল কোন বিচিত্র মনোবৃত্তিতে।

কিন্তু সেদিনকার চেয়ে আজকের মনোভাব আরও দুর্জ্ঞেয়।

আজ হয়ত প্রণতিকে সে ভুল বিচার করিতেছে। যদিও তার যক্ষ্মা নয় শুধু জ্বর আর কাসি, কিন্তু প্রণতি বোধ হয় মনে করে দিদির যক্ষ্মা; হয়ত' সেই জন্যই কাছে আসে না। হয় ত' আর সকলের সমান নয়।

কারণ যাহাই হউক, এই দুই ভগ্নীর সহজ সম্বন্ধের সরল মাধুর্য্য দিন দিন ধীরে ধীরে নষ্ট হইতেছে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চন্দ্রের মতো।

এই জন্য সঙ্কোচ এবং লজ্জাও আনতির কম নয়। কিন্তু সঙ্কোচ যাহাই থাকুক ব্যাপারটা একটা রূঢ় সত্য।

এই ত' আজ দু'দিন প্রণতি তার ঘরে আসিল না, একবারও জিজ্ঞাসা করিল না, 'দিদি, কেমন আছ ?'

প্রথম যখন আনতি রুগ্ন হইয়া এ বাড়ীতে আসে, তখন প্রণতির সেবা, শুশ্রূষা ও যত্নের অবধি ছিল না।

তবে আজ কেন এমন হইল ?

ইহাতে কী তার নিজের দায়িত্ব কিছুই নাই ?

আছে যে তা' তার মতন ভাল করিয়া ত' আর কেহ জানে না।

কিন্তু সে মনে মনে এখনও আশা পোষণ করে, দুই বোনের সেই হাসি-খুসী, সেই প্রাণ খুলিয়া মেলা-মেশার দিনগুলি আবার ফিরিয়া আসিবে।

কিন্তু বেচারীকে হতাশ হইতে হয়। তখন সে আপনা-আপনি হাসিয়া ফেলে—মিথ্যা আশা পোষণের মূঢ়তার জন্য। কিন্তু সে হাসিতে মিশানো থাকে প্রণতির প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব।

আজও রাত আটটা, নয়টা, দশটা বাজিয়া গেল। নার্স মধ্যে একবার পথ্য দিতে আসিয়াছিলেন। আনতির ইচ্ছা হইল তাকে জিজ্ঞাসা করে, পিনু কি ফিরিয়াছে।

কিন্তু করিল না।

পরদিন প্রাতে বাহির হইতে অম্বুজ জিজ্ঞাসা করিল, 'ভিতরে আসতে পারি ?'

'এস ভাই।'

অম্বুজ একটা চেয়ার টানিয়া নিয়া আনতির খাটের পাশে বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন ছিলে কাল ?'

'যেমন রোজ থাকি।'

'একবার চিকিৎসা বদলালে হয় না, ধর হোমিওপ্যাথি কি কবিরাজী ?'

'দরকার নেই।'

'দরকার নেই, কেন ? জীবনটা ত' খোলামকুচি নয় যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে।'

আনতি একটু ম্লান হাসি হাসিল।

একটু পরে অম্বুজ বলিতে আরম্ভ করিল গত রাতের জজ-সাহেবের বাড়ীর ডিনারের গল্প, ফিরিতে দেরী হইয়া গিয়াছিল, তাই আর কাল খোঁজ লইতে পারে নাই।

জজ-সাহেবের বাড়ীতে তার আলাপ হইয়াছে একটি মার্কিণী মেয়ের সঙ্গে নাম মিস্ সিজউইক্—খাসা সুন্দর মেয়ে, ফাইন ফিগার, স্মার্ট, জলি—এক কথায় 'ওয়াণ্ডারফুল'।

'সিজউইক্ কে ?'

'একজন ট্যুরিষ্ট, আমেরিকান কনসালের গেষ্ট।'

আনতি বলিল, 'মিস মেয়োর কাজিন বোধ হয় ?'

'না, সে এসেছে ষ্টাডি করতে আমাদের বন্ধুভাবে।'

'একদিন তাকে নিয়ে এসোনা এখানে।'

'আসবে বলেছে। তবে সে দেখতে চায় কতকগুলি খাঁটী হিন্দু পরিবার। আমি নিমন্ত্রণ করায় বললে, সানন্দে তোমার ওখানে যাব। কিন্তু তোমার বাড়ীতে হিন্দুত্বের কি দেখব বুঝতে পাচ্ছি না। তোমার তিন-চতুর্থাংশই ত' বিলিতি।'

আনতি বলিল, 'তা বটে।'

'তাই মনে কচ্ছি মিস্ সিজউইক্‌কে নিয়ে যাব সেরেস্তাদার বাবুর ওখানে। একে নিজে গোঁড়া টিকিধারী, তার উপর বাড়ীতে আছেন এক বিধবা বৌদি।

সেখানে মিস্ সিজউইক দেখতে পাবে হিন্দুর সুপ্রাচীন সভ্যতার একটা সুন্দর দিক।'

জজসাহেবের বাড়ীর আরও অনেক গল্প হইল। বৈকালে আরম্ভ হয় টেনিস, মিস্ সিজউইক ও অম্বুজ খেলে একদিকে। আর একদিকে প্রণতি ও ডি, এস, পি, ডানকান। প্রণতিরাই দুই সেটে জিতিয়াছে—ছয় চার, ছয় তিন।

আনতি বলিল, 'তা হ'লে পিনু বেশ ভাল খেলে বলতে হবে?'

'জিতেছে ওরা ডানকানের জন্য, সে একটা চ্যাম্পিয়ন।'

একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া আনতি জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, পিনু তোমার এঘরে আসায় আপত্তি করে না?'

প্রশ্নের আকস্মিকতায় অম্বুজ বিস্মিত হইল, সে বলিল, 'নো নেভার, তোমার একথা জিজ্ঞাসা করার মানে?'

'আমার যক্ষ্মা বলে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে, সে অবস্থায়—'

অম্বুজ কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তারপর রোগিণীর একখানি শীর্ণ হাত তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তার উপর নিজের একখানা হাত বুলাইতে লাগিল।

অম্বুজের এই মৃদু স্পর্শে আনতির চোখ দুইটা বুজিয়া আসিল।

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকিয়া প্রণতি আসিয়া অম্বুজের চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল, ডাকিল, 'দিদি'।

ভগ্নীপতির হাতের মধ্য হইতে হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া আনতি ভগ্নীর দিকে চাহিল। নিজের অজ্ঞাতে মুখখানা তার আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, সে কহিল, 'বস।'

প্রণতি তার কপালে হাত দিয়া উত্তাপ অনুভব করিয়া মাথার কাছেই বসিল।

আনতি মনে করিয়াছিল, এই দু'দিন না আসার জন্য প্রণতি অন্ততঃ একটু দুঃখ প্রকাশ করিবে। কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

তিনজনে কথা হইল ঘণ্টাখানেক। প্রণতিও মিস সিজউইকের খুব সুখ্যাতি করিল, পশ্চিমের মেয়েদের কেমন সহজ স্ফূর্ত্তভাব সমাজ তাদের গড়িয়াছে একটা সম্পূর্ণ জীবন করিয়া।

আর পূবে অসংখ্য বাধা-নিষেধের মধ্যে ছায়ায় ঢাকা গাছের চারার মতো মেয়েরা বাড়িতে পারে না। একটা দল শিক্ষা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাদেরও মনের এবং স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক স্ফুরণে বেশী করিয়া বাধা দিতেছে তাদেরই লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত ভগ্নীরা।

প্রণতি কথা বলিতেছিল বেশ প্রাণ খুলিয়াই, কিন্তু বৈঠকটা তেমন জমিয়া উঠিল না—যেমন উঠিয়াছিল একটু আগে আনতি ও অম্বুজের মধ্যে।

তিন জনের মধ্যে ইহা বেশী করিয়া অনুভব করিল আনতি।

অম্বুজের কোর্ট আছে, সে উঠিয়া পড়িল ন'টা আন্দাজ।

তারপরও দুই বোনে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল, কথাগুলি আগের চেয়ে প্রাণহীন, নিতান্তই ফাঁকা ফাঁকা।

প্রণতি একবার টেম্পারেচারের রেকর্ড দেখে, একবার পেটেণ্ট ঔষধের শিশিটা তুলিয়া লইয়া লেবেল পড়ে, খানিকটা পরে একটা ট্যাবলেটের কৌটা হাতে করিয়া বলিল, 'এ ওষুধগুলো কোন কাজের নয়।'

এই সময় বেহারা আসিয়া বলিল, 'সাহেব মেমসাহেবকে ডাকিয়াছেন।'

প্রণতি উঠিয়া গেলে ঘরের নির্জ্জনতায় আনতি বেশ আরাম বোধ করিল।

ডানকান সিজউইকদের গল্প শুনিয়া তার লাভ কি! মৃত্যু যার শিয়রে, অবলম্বন করিবার মত যার কেহ নাই, একটীমাত্র ছোট বোন, সেও দিন দিন দূরে সরিয়া যাইতেছে।

আর পাঁচ জনের পক্ষে ছোট বোন বলিতে যাহা বোঝায়, আনতির কাছে প্রণতি তার চেয়ে অনেক বেশী।

বয়সে সে বড় মাত্র চার বছরের, কিন্তু তাদের শৈশবে আনতি ছোট বোনকে বাঁচাইয়াছে মাতৃস্নেহ দিয়া।

আট বছরের আনতি মাতৃহারা চার বছরের ছোট বোনটিকে কতই না আদর করিত, কাঁদিলে বর্ষীয়সীর মত কোলে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিত।

এই কোলে তুলিতেই তার কত না কষ্ট হইত। কোমরে কাপড় বাঁধিয়া দাঁত দিয়া জিভ কামড়াইয়া পিনুকে কোলে তুলিতে যাইয়া বেচারী হাঁপাইয়া পড়িত। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিত, 'আয়া কোলে নিলে পিনু কাঁদে, আমি নিলে কাঁদে না। আমি কিনা দিদি।'

সত্যই প্রণতি তার কোলে কাঁদিত না, আনতির মনটা গর্ব্বে ভরিয়া উঠিত, বড় হইয়া জন্মিয়া বড়ত্বকে সে সার্থক করিয়াছে।

তারা দু'টীতে বাড়িয়া উঠিতেছিল পিতৃস্নেহে। প্রণতির বয়স যখন তের, তখন সে স্নেহ হইতেও তারা বঞ্চিত হইল।

ব্যাঙ্কের হিসাবের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে পিতা তাদের পথে বসাইয়া যান নাই বটে, কিন্তু তাদের দেখিবার কেহ ছিল না, পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলেই কেহ নয়।

তাদের আশ্রয় মিলিল পিতৃবন্ধু ডক্টর অশোক সেনের বাড়ীতে। মিলিল বলিলে ভুল হইবে, আনতিই যাচিয়া তার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ডক্টর সেন দার্শনিক, তার উপর বিপত্নীক। কখনও জামা উল্টা করিয়া গায়ে দিয়া কলেজে যান, কখনও তার মনিব্যাগ ও চেক বই টেবিলের উপর পড়িয়া থাকে। ট্যাক্সি-ভাড়া দেওয়ার সময় খোঁজ পড়ে মনিব্যাগের।

এ-হেন লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সতের বছর বয়সেই আনতি একটা নূতন সংসারের কর্ত্রী সাজিল।

ডক্টর সেনের হিসাব রাখা, সংসারে সকল বিষয়ের তদারক করা, এমন কি তার জামাকাপড় গুছাইয়া রাখা—সবই তাকে করিতে হইত।

অবশ্য এ কাজগুলি সে বরণ করিয়া লইয়াছিল স্বেচ্ছায়, কেননা ডক্টর সেন ছিলেন একেবারেই বালকের মত অসহায়।

সংসারী কাজকর্ম্ম, নিজের লেখাপড়া এ সবের মধ্যেও চোখের তারার সম্বন্ধে চোখের পাতার মতো প্রণতির কল্যাণ সম্বন্ধে সে সর্ব্বদা সজাগ থাকিত।

প্রণতির বয়স যখন সতের, তখন ডক্টর সেনের বাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করিল তাঁর বন্ধুপুত্র তরুণ আই সি এস—অম্বুজ ব্যানার্জ্জী। অম্বুজ ছিল আই সি এস গোষ্ঠীর মধ্যেও শতকরা নিরানব্বই জনের চেয়ে স্মার্ট—চেহারায়, পোষাকে, ধরণ-ধারণে।

কয়েক মাস পরে ডক্টর সেন অম্বুজের পিতার নিকট আনতির সঙ্গে অম্বুজের সম্বন্ধ প্রস্তাব করিলেন।

আনতি এ বিবাহ হইলে সুখী হইত। কিন্তু প্রস্তাব বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই সে ডক্টর সেনকে বলিল, 'জ্যেঠামশায়, অম্বুজের সঙ্গে পিনুর সম্বন্ধের প্রস্তাব করুন।'

কলেজগামী অধ্যাপক জামার বোতাম ভুল করিয়া আঁটিতে আঁটিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, বল দেখি ?'

'পিনু তা'হলে খুব সুখী হবে।'

'তাই নাকি ? বেশ তাহলে প্রস্তাবটা বদল করা যাবে। কিন্তু একটা কথা, অম্বুজের মতামত ?'

আনতি হাসিয়া বলিল, 'তাত' আপনি জানতেন না—প্রথম প্রস্তাব করবার আগেও !'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'তা বটে, কিন্তু আমার কেনই মনে হ'ত—সে সম্মত হবে।'

আনতি ভাবিল—ও বাবা, জ্যেঠামশায়ের পেটে এত বিদ্যে। প্রকাশ্যে কহিল, ‘আমি তাকে রাজী করিয়েছি।’

এক শুভদিনে অম্বুজ ও প্রণতির বিবাহ হইয়া গেল।

ভগ্নীকে সুখী করিতে পারিয়া আনতির মনের আনন্দ আর ধরে না, পিনু যাহাকে চাহিয়াছিল তাহাকেই পাইয়াছে।

আনতির এই আনন্দের পিছনে ছিল আত্মত্যাগের গৌরবের একটা মোহ, যে মোহে মানুষ অনেক কিছু করিয়া বসে। এই মোহ ততদিন থাকে, যতদিন থাকে তার নূতনত্ব।

কিছুদিন পরেই আনতি বুঝিল—মানুষ আর সব ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু, পারেনা নিজের দয়িতকে।

সে যে অম্বুজকে কতখানি ভালবাসে তাহা উপলব্ধি করিল প্রণতির সঙ্গে তার বিবাহের পর।

অম্বুজ প্রণতিকে ডাকিত, ‘ডার্লিং।’ প্রণতি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত। বিবাহের পরই সে যেন কেমন করিয়া শিখিয়া ফেলিল স্বামী আদর করিলেই ধরা দিতে নাই। অম্বুজ আদর করিতে গেলে সে ছুটিয়া পালাইত।

আনতি প্রায় প্রত্যহই অম্বুজদের বাড়ী বেড়াইতে যাইত! অম্বুজ ও প্রণতির নূতন দাম্পত্য জীবনের অনেক মান-অভিমানের খেলাই হইত—তার চোখের উপর। তারা মনেও করিতে পারিত না যে, আনতিকে পীড়া দিতে পারে!

ছোট ছোট প্রেমের খেলা আনতির বুকে যাইয়া ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। সে বুঝিল কত বড় ভুলই না করিয়াছে; কিন্তু এ ভুল এ জীবনে আর সংশোধিত হইবার নয়!

প্রথম প্রথম সে ইহাতে লজ্জিত হইত, ছোট বোনের স্বামী-সুখে ঈর্ষ্যা—ছিঃ!

তারপর রাগ করিতে আরম্ভ করিল অম্বুজের উপর। প্রথম পরিচয়ে অম্বুজ কথাবার্ত্তায় ও দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ত' বুঝিতে দিত যে আনতিকেই সে-ভালবাসে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রণতির সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করা মাত্রই সে সম্মতি দিল।

প্রণতির উপর তার রাগের কারণ আনতি খুঁজিয়া পাইত না। এ যেন নিছক পরের সুখ দেখিয়া ঈর্ষা, তা'ছাড়া আর কিছু নয়।

এদিকে ভয়ও ছিল পাছে ভগ্নী ও ভগ্নীপতির কাছে তার মনোভাব ধরা পড়িয়া যায়। তাই আরম্ভ করিল প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অম্বুজকে আঘাত

করিতে। গন্ধপুর ফলার মতন তার প্রত্যেক কথায়ই থাকিত একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ। এই রকম করিয়া রাগের ঝালও খানিকটা মিটাইয়া লইত।

কিছু দিনের মধ্যেই আনতি বুঝিল, আত্মগোপনের ভুলপথ অবলম্বন করিয়াছে। নিজেকে গোপন করিবার প্রত্যেক প্রচেষ্টায় বেশী করিয়া ধরা পড়িবারই সম্ভাবনা।

কিন্তু সব চেয়ে লজ্জার কারণ ছিল প্রণতির ব্যবহার। সে যে আনতির মনোভাবকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা বোঝা গেল না। প্রণতি কিছু প্রকাশ না করায় আনতির সঙ্কোচ বাড়িয়াই চলিল। ব্যাপার যেরূপ, তাহাতে ওদের সংস্রব না এড়াইলে আর চলে না। সে যেন পালাইতে পারিলে বাঁচে।

এই সময় অম্বুজ বদলী হইয়া গেল রাজসাহীতে। আনতিরও চাকরী জুটিল বাঙ্গলার বাহিরে, অন্ধ্রপ্রদেশের মিসেস্ রাওএর প্রাইভেট সেক্রেটারীগিরি।

পাঁচ-পাঁচটা বছর সে সারা ভারত ঘুরিয়া বেড়াইল মিসেস্ রাও-এর সঙ্গে! আজ লাহোরে নিখিল ভারত মহিলা সঙ্ঘ, কাল বেজওয়াদায় শিশু-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন, পনের দিন পরে হরিজন উন্নয়নের বক্তৃতা গুরুবায়ুরে।

আনতিকে পড়িতে হইত অনেক কিছু, লিখিতে হইত একটা দৈনিকের সব-এডিটরের মতন। বক্তৃতা লেখা' কোট রাখা, ডায়েরী, করেসপণ্ডেন্স—এইসব ছিল তার কাজ!

কিন্তু শুধু ইহাই নয়, মিসেস রাও আনতিকে থিওসফিস্ট গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। মাছ, মাংস খাওয়া তার নিষিদ্ধ ছিল, সময়ে অসময়ে তাকে স্পিরিটে'র গল্প শুনিতে হইত।

সে মধ্যে মধ্যে প্রণতি ও অম্বুজকে চিঠিতে লিখিত তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। জানাইত, দিনগুলি ভাল ভাবেই কাটিয়া যাইতেছে—বিরাট সমুদ্রের নীল নিবিড় সৌন্দর্য, পাহাড়ের গুরুগম্ভীর শ্রী, প্রাচীন ভারতের গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া।

কিন্তু গোপন করিত একটি কথা যে শরীর তার দিন দিন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। প্রণতিকে সুখী করিতে যাইয়া নিজে যে দুঃখ বরণ করিল, দূর দেশে যাইয়াও আনতি তাহা ভুলিতে পারে নাই। শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এই সব দুশ্চিন্তায় এবং বাঙ্গালীর অনভ্যস্ত খাদ্যে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে পরে আনতি যখন কলিকাতায় ফিরিল, তখন অম্বুজ আলিপুরের এডিশনাল জজ।

আনতির শীর্ণ শরীর দেখিয়া প্রণতি ভীত হইল, বলিল, 'দিদি, এ কী একদিনও ত' লেখ নি যে শরীর তোমার এত খারাপ হয়ে গেছে !'

'চিন্তিত করতে তোমাদের চাইনি, কিন্তু এখন আর উপায় নেই ব'লে এসে আশ্রয় নিলাম।'

ডাক্তার আসিলেন। থুথু, রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা করা হইল, এক্স-রে করা হইল ফুসফুসের।

রোগ নির্ণয় হইল না, কেহ বলিলেন টি বি, কেহ কেহ মাল-ন্যুটিশান, কাহারও মতে রক্তে হোয়াইট করপাস লের অল্পতা। যাহা হোক, চিকিৎসা চলিল তিনজন বিচক্ষণ ডাক্তারের সম্মিলিত মস্তিষ্কের ব্যবস্থা অনুসারে।

প্রথম প্রথম প্রণতি দিদির ঔষধ, পথ্য, সেবা-শুশ্রূষার যাহাতে ত্রুটি না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিত বটে, কিন্তু আনতি লক্ষ্য করিল তার সে ছোট বোনটি আর নাই—যে পাঁচ বছর আগে কথা বলিতে বলিতে হাসিয়া হাসিয়া দিদির গায়ে লুটাইয়া পড়িত,নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিত দিদির মধ্যে। আনতির মনে হইল, এবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াই সে ভুল করিয়াছে।

সে ইহা ভাবিয়া দেখিল না যে, সতের বছরের প্রণতির সঙ্গে বাইশ বছরের প্রণতির পার্থক্য থাকিবার অনেক কারণই রহিয়াছে। আজকের প্রণতি একটা সংসারের কর্ত্রী, তার কাছে একটা নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—যার অস্তিত্বই তখন ছিল না।

আনতি ভাবিল প্রণতি সন্দেহ করে যে দিদি তার স্বামীকে ভালবাসে,আর এই সন্দেহ হইতেই দূরত্বের সৃষ্টি।

দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রণতির সেবা-যত্নেও একটু শিথিলতা আসিতে লাগিল। ঔষধ খাওয়াইত আগে সে নিজে, এখন তাহা সারে নার্সকে দিয়া। প্রথম প্রথম দিদির মাগুর মাছের ঝোল নিজের হাতে না রাঁধিলে তার তৃপ্তি হইত না, এখন পথ্যের ভার পড়িয়াছে রসুই বামুনের উপর।

আনতি ভাবিত এই তাচ্ছিল্য প্রনতির মনের সন্দেহের অভিব্যাক্তি মাত্র।

কিন্তু পিনু কী অকৃতজ্ঞ।

একবারও সে ভাবিয়া দেখে না যে দিদি তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কত বড় আত্মত্যাগ করিয়াছে।

আবার সঙ্গে সঙ্গেই আনতি লজ্জা অনুভব করিত অম্বুজের প্রতি তার প্রেমের জন্য। ধরা না পড়িলেও এ প্রেম তার মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলা উচিত। কিন্তু

মানুষ যে বড় দুর্বল, বড় অসহায়, বিশেষতঃ একবার যে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

অবশ্য এবার সে পূর্বের মতন অনাবশ্যক তর্কবিতর্ক ব্যঙ্গ-পরিহাস দিয়া নিজেকে ঢাকিতে চেষ্টা করিত না। প্রকাশও করিত না অবশ্যই। অম্বুজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল সরল ও সহজ। কিন্তু অম্বুজ ঘরে ঢুকিলে নিজের অজ্ঞাতেই আনতির চোখে একটা দীপ্তি ভাসিয়া উঠিত, যে দীপ্তি কোন দর্শকেরই চোখ এড়াইবার কথা নয়।

ঘণ্টা দুই পরে ডাক্তার চলিয়া গেলেন, বলিলেন, 'কেস অত্যন্ত সিরিয়াস।'

স্বামী-স্ত্রীতে ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন দিবারাত্র শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সময় সময় রোগজীর্ণ অম্লান দিদির দিকে চাহিয়া প্রণতির চোখ সজল হইয়া উঠিত।

প্রণতি ভয় পাইল, দিদি আর তার বাঁচিবে না। তার মনে পড়িল বাল্য-জীবনের কথা, দু'টী মাত্র বোন, সংসারের চড়ায় কি আশ্রয়হীন ভাবেই না তারা ভাসিয়া আসিল। চারিদিকে খালি লোভী চক্ষু লোভ তাদের টাকার প্রতি তাদের রূপের প্রতি। মিথ্যা হাসি, ভুল করিয়া পথ দেখাইবার কত না কুৎসিত প্রচেষ্টা।

দিদিও তখন তার নিতান্তই ছেলেমানুষ; কিন্তু ভগবান তাকে গড়িয়াছিলেন নানারূপ বাধা ও বিঘ্নের মধ্যে খুব সতর্কতার সহিত চলিবার শক্তি দিয়া। বেচারী জন্মিয়াছিল দিদি হইয়া, সমস্ত জীবনটা সে ঢালিয়া দিল এই দিদিত্বের সার্থকতার জন্য।

আনতির সংজ্ঞা ফিরিল কয়েকদিন পরে। জলেডোবা মানুষকে টানিয়া তুলিলে সে যেভাবে চায়, আনতি সেই ভাবে এদিক ওদিক চাহিল।

সে যেন ডুবিয়া গিয়াছিল অনন্ত অন্ধকারে, চোখ মেলিয়া প্রথমেই দেখিল— প্রণতি ও অম্বুজকে। চাহিয়া থাকিবার যে পরিশ্রম তাহাও সহ্য হয় না, চোখ আপনা আপনি বুজিয়া আসে।

প্রণতি ধীরে ধীরে তার হাতের উপর হাত বুলাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'একটু বেদানার রস দেব?'

প্রণতি এমন কি নার্স মিস্ দে-ও জানিতেন না যে কিছুদিন যাবৎ আনতি আর ঔষধ খায় না। মিস্ দে ঔষধ দিয়া গেলে তাঁর অলক্ষ্যে ঔষধটা

পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলে, ট্যাবলেট হইলে জানলা দিয়া 'লনে' ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রণতির আশঙ্কা দিদি আর বাঁচিবে না। সে বলে ডাক্তার বদলাইতে।

ডাক্তার বদলানো হইল, কিন্তু আনতি তাঁর ঔষধও খাইল না ; একান্ত কেহ সামনে থাকিলে ঔষধ ঢালিয়া ফেলা যখন অসম্ভব, তখন দু'এক দাগ গিলিত মাত্র।

সবচেয়ে খারাপ লক্ষণ দাঁড়াইল অসম্ভব রকমের দুর্ব্বলতা, আনন্দবাজার কিম্বা ষ্টেটসম্যানের দু'টা লাইনের উপর একটু চোখ বুলাইলেই মাথা ঘুরিতে থাকে, চোখের সামনে ভাসিতে থাকে কতকগুলি আগুনের ফুলকি।

ডাক্তার বলিলেন, রোগিনীর দেহে সুস্থ লোকের রক্ত সঞ্চালন করা দরকার, না হইলে বাঁচানো অসম্ভব।

স্থির হইল রক্ত দিবে অম্বুজ।

ব্যাপারটা অতি সাধারণ, দুর্ব্বল রোগীকে অনেক সময়ই অপরের রক্ত ইনজেক্‌সন দেওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত শুনিয়া আনতি একবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিল। তার শরীরে রক্ত দেওয়া হইবে, অম্বুজের রক্ত! ভাবিয়াই আনতির মাথায় রক্ত উঠিয়া গেল।

তার পরদিন রক্ত-সঞ্চালন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আনতি খুব জোরে হাসিয়া উঠিল। তার মনে হইল কড়িকাঠ নড়িতেছে, ঘরটা দোল খাইতেছে ঢেউয়ের উপরের নৌকার মত।

দোলা খাইতেছে ডাক্তার, অম্বুজ, সে নিজে। কী, ভূমিকম্প না কি? আবার একটা হাসির সঙ্গে সঙ্গেই আনতি সংজ্ঞা হারাইল। ডাক্তার রক্ত-সঞ্চালন বন্ধ করিয়া দিলেন। মাথায়, চোখে-মুখে জল দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু সংজ্ঞা ফিরিল না, রোগিনী বিকারের ঘোরে দুই একটা অস্পষ্ট শব্দ করিল; তার মধ্যে একবার একটি কথা মাত্র বোঝা গেল—'অম্বুজ'।

আনতি কহিল, আজ আর রক্ত নিয়ে কাজ নেই।' বলিয়াই চেষ্টা করিল একটু পাশ ফিরিবার। দুর্ব্বল শরীর আনতি অনেক সময়ই চোখ বুজিয়া থাকে, চোখ বুজিয়া সে অনুভব করে তাকে সারাইয়া তুলিবার প্রণতির কী আকুল আগ্রহ, কী সেবা, কী যত্ন!

ধীরে ধীরে সে প্রণতির হাতের উপর হাত বুলায়। কিন্তু চোখ তুলিয়া চাহিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। শুধু শুধু প্রণতির উপর কী অবিচারই না

করিয়াছে। নিজের মনের ছাঁচে তাকে বিচার করিয়া নিজেই সৃষ্টি করিয়াছে একটা দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব। অথচ তার জন্য দায়ী করিয়াছে ছোট বোনকে।

তখন আনতি উঠিয়া বসিতে পারে, জ্বর আর হয় না, সামান্য একটু খুস খুসে কাসি আছে, তবে শরীর দুর্ব্বল। কয়েকদিন হইতেই সে ভাবিতেছিল অম্বুজকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা আর হইয়া উঠে না, করিতে গেলেই কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। অথচ এই প্রশ্নের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে তার জীবন! দুইদিন কথাটা ভূমিকা করিতে গিয়া আর পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াই সে ক্ষান্ত হইয়াছে।

সেদিন অম্বুজকে একা পাইয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া মেজের উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া এক নিঃশ্বাসে আনতি বলিয়া ফেলিল, 'আমি বোধ হয় বিকারের ঘোরে বলেছি তোমার সঙ্গে প্রণতির বিয়ে দিয়ে একটা মস্ত বড় আত্মত্যাগ করেছি এবং ঐরকম আরও অনেক কিছু—।'

অম্বুজ নিরুত্তর।

আনতি একটু ব্যগ্রভাবে কহিল, 'বল ঠিক কি না?'

অম্বুজ উত্তর করিল, 'তোমার যে রকম শরীর তাতে এখন ও সব কথা—'

কথাটা শেষ করিল না।

আনতি ধীর ধীরে বলিল, 'বুঝেছি আর বলতে হবে না।'

তারপর দু'জনেই নীরব।

অম্বুজ আশঙ্কা করিতেছিল, হয়ত আনতির আবার ফিট হইবে, কথাটা একবারে উড়াইয়া দেওয়াই উচিত ছিল।

আর আনতি ভাবিতেছিল—ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা—সে কিনা প্রকাশ করিয়া ফেলিল ছোট বোনের সঙ্গে তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা!

কী মানসিক ব্যাধিতেই না তাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

লজ্জায় তার সমস্ত শরীর রি রি করতে লাগিল। লজ্জা শুধু অম্বুজকে নয়, তার লজ্জা করিতেছিল—সন্ধ্যার ম্লান ঐ আলোকটুকুকে—ঘরের আসবাবপত্র কড়ি-বরগা সমস্ত—নির্জ্জীব পদার্থগুলিকে, অন্ধকার হইয়া গেলে এবং অম্বুজ চলিয়া গেলে যে যেন বাঁচে।

সন্ধ্যাসন্ধি্য অম্বুজ চলিয়া গেলে, ঘরটা ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল।

আনতি ভাবিল এর পর ত' আবার আলো হইবে, তখন সে পিনুকে মুখ দেখাইবে কি করিয়া! এতদিন ব্যাপারটা সে জানিত না—কিন্তু জানার পরে

আর মুখ দেখানো চলে না। একটা বিরাট শূন্যতায় তার সমস্ত বুকখানা ভরিয়া গেল, চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

প্রণতি গিয়াছিল এক বান্ধবীর সঙ্গে বায়স্কোপে। ফিরিয়া দিদির ঘরে যাইয়া দেখিল সে ঘুমাইয়া আছে। আর তাকে ডাকিল না।

আনতি সবই টের পাইল, কিন্তু চোখ মেলিয়া ভগ্নীর দিকে চাহিল না।

দিন কয়েক পরের কথা, রাত্রি ন'টা। পোর্টিকোর নীচে গাড়ী থামিলে প্রণতি নামিবার পূর্বেই দারোয়ান তাকে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা আনতির লেখা, খুবই সংক্ষিপ্ত—

'তোমাদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে, তাই চললাম। সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি সুখে থাকো।'

প্রণতি বিস্মিত হইয়া গেল, কী ব্যাপার, কীসের লজ্জা ?

সে চিঠিখানা অম্বুজের হাতে দিল।

অম্বুজ পড়িয়া বলিল, 'ও ! আই সি।'

প্রণতি বলিল, 'তার মানে ?'

'বিকারের ঘোরে তোমার দিদি যা বলেছিলেন – লজ্জা তার জন্য।'

প্রণতি বুঝিল কথাটা তার দিদিকে জানাইয়াছে অম্বুজ, সে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে ছিল, অম্বুজের অদূরদর্শিতার উপর একটা তীব্র নিন্দা।

তারপরই সে সোজা-সুজি চলিয়া গেল আনতির ঘরে, চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া চির অভ্যাস মত ডাকিল—'দিদি'। দেখিল দিদির শূন্য শয্যা সেই ভাবেই খাটের উপর পাতা রহিয়াছে। আনতি যাইবার আগে ঔষধের শিশি ও কৌটাগুলি টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।

নাই খালি প্রণতি ও অম্বুজের বিবাহের পরের ফটোখানা।

এ ছবিখানা আনতি নিজের হাতে তুলিয়াছিল, সেখানা এই কয়মাস থাকিত তার শিয়রের কাছে—ঔষধের টেবিলের উপর।

নন্দ ঘোষ

নন্দ ঘোষ জীবনে একপয়সাও রোজগার করিল না। রোজগার করার মতন কিছু শিখিলও না। প্রথমে পায়রা ও ঘুড়ি উড়াইয়া তারপর সার্ব্বজনীন পুজার মোড়লি করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিল।

যৌবনে নেশা ভাঙও কিছু করিয়াছে, দুচার দিন ঘোড় দৌড়ের মাঠেও গিয়াছে। কিন্তু সেগুলি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তার সবচেয়ে বড় নেশাই ছিল ঘুড়ি আর পায়রা। মুখ্যি, লক্কা, সেরাজু, গেরোবাজ—নানারকম সুন্দর সুন্দর পায়রা পুষিত, নিজ হাতে তাদের মটর কলাই খাওয়াইত। পায়রার বসিবার জন্য ছাদের উপর বাঁশের তৈরী উঁচু বোমই ছিল তিনটা। পায়রা উড়াইয়া দিয়া সে শিস দিত, সে স্বর রেলের হুইশলের চেয়েও তীব্র, তীক্ষ্ণ!

সবচেয়ে তার বড় শখ ছিল মাইনগরে শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়া পায়রা ওড়ানো। শ্যালিকা ও শ্যালক বধুদের কাছে তাদের গুণকীর্ত্তন—এই ওদের ছেড়ে দিলুম, ওরা ঠিক কলকাতায় আমার বাড়ী গিয়ে উঠবে।

পথ চিনবে কি করে?

রহস্য ত ওইখানে। এর নাম গেরোবাজ। চিতোরের রানারা, লক্ষ্ণৌর নবাবরা, লড়াইয়ের জন্য পুষতেন। গেল যুদ্ধেও পায়রা দুতীয়ালি করেছে।

শ্যালিকা ও শ্যালক বধুরা বিস্মিত হয়। আর তাদের এই বিস্ময়ই নন্দর পুরস্কার।

দেওঘর, মধুপুর, এমন কি কাশী হইতেও সে পায়রা উড়াইয়া দিয়াছে। দু'একটি ভিন্ন কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে প্রায় সবগুলি।

শীতকালে পায়রা, বর্ষার শেষে ও শরতে ঘুড়ি। নিজে বোতল গুঁড়া করিয়া সে সুতায় মাঞ্জা দিত। অন্য পাড়ার সঙ্গে ঘুড়ি ও পায়রা ওড়ানোর কম্পিটিশন দিত। তাতে খরচা ছিল বিস্তর। জিতলে পাঁচজনকে লইয়া হৈ হুল্লোড় ও ভোজ দেওয়া। মাংস পোলাউ করিয়া খাওয়ানো!

বাপের একমাত্র ছেলে। তিনি নন্দের জন্য বরফ বস্তি নামে একটি বস্তি ও

বসত বাড়ী রাখিয়া যান। বস্তিতে জমি দুবিঘার উপর, বসত বাটীতেও প্রায় দশ কাঠা। বরফ বস্তি হইতে খাজনাই উঠিত বছরে হাজার টাকা।

অন্য কোন আয় নাই, এদিকে হাত দরাজ। সাধারণ নিত্তনৈমিত্তিক খরচা চালাইবার জন্যই টুকরা টুকরা জমি বন্ধক পড়ে। খালাস আর হয় না। এইভাবে বরফ বস্তি গেল। বাড়ীর জমিও বার আনার উপর করালী মিস্তির কিনিয়া নিল।

করালীর সুন্দর স্বস্তিক মার্কা বাড়ীর পাশে নন্দর জীর্ণ পুরাতন বাস্তু তার দুর্দশাকে যেন আরো প্রকট করিয়া তোলে। ছোট ছোট ইঁটগুলি একখানার পর একখানা কোন রকমে যেন দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলে মনে হয় বাড়ীর কঙ্কাল। দেওয়ালের গায়ে কোথায়ও শ্যাওলা, কোথায়ও বা বট পাকুড় মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

একতলা বাড়ী, নীচু ছাদ, ঘরগুলি অপরিসর। উঠানে সিমেণ্ট নাই। কখনও ছিল কি না সন্দেহ। জানালার পাল্লা ভাঙ্গা। চৌকাঠ বসিয়া যাওয়ায় দরজা ভেজাইবার সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়। ক্লাইভের আমলে তৈরী হওয়ার পর কোন সংস্কারই আর হয় নাই।

কিন্তু নন্দর সমস্ত গর্ব্ব আজ ঐ বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া। কথায় কথায় সে বলে, আমরা হলাম আদি বাসিন্দে, ক'লকাতার জঙ্গল কেটে বাস।

এই আদি বাসের অধিকারে পাড়ায় সে খালিগায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া ট্রাম রাস্তায় যাইতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। ভাবটা এইরূপ যে তারা ত আর ভুঁইফোড় নয় যে বাবু সাজিয়া বেড়াইবে। চেনা বামুনের আবার পৈতার দরকার?

নন্দ আজকাল সার্ব্বজনীন পূজার প্রধান পাণ্ডা। শুধু দুর্গা ও কালীপূজা নয় তার উৎসাহ ও চেষ্টায় তাদের পল্লীতে শীতলা, ওলাই চণ্ডী, দেব সেনাপতি প্রভৃতি অনেক দেবদেবীরই বারোয়ারি পূজা হয়। নন্দ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাঁদা তোলে। পাড়ায় জ্ঞাতি অনেক, আত্মীয় বন্ধু আরও বেশী। তাছাড়া নবাগতের সঙ্গেও অল্পেই পরিচয় করিয়া ফেলে। তাকে চাঁদা না দিয়া উপায় নাই।

পূজার আগে ও পরে অন্ততঃ পাঁচসাত দিন আলোচনায়ই কাটাইয়া দেয়। পূজার সময় গরদের কাপড় পরিয়া, কপালে ফোঁটা কাটিয়া মণ্ডপের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। আরতির সময় বাজনার তালে তালে নাচে, আর বলে মা, মা।

পাড়ায় তার সমবয়সীর সংখ্যা কম। যে দুচার জন আছেন তারাও নন্দর

নাগালের বাহিরে। একদল জীবন যুদ্ধে এত আগাইয়া গিয়াছেন যে তার নিজেরই তাদের কাছে যাইতে সঙ্কোচ বোধ হয়। আর একদলের কাছে গেলে শুনিতে হয় বাত, ব্লাডপ্রেসর ও হৃদরোগের যন্ত্রণার কাহিনী। নিজের স্বাস্থ্য ভাল, তাই ভাল লাগে না।

একমাত্র আছেন ভবানীবাবু, নন্দ মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইয়া তাস খেলে। তাঁকে না পাইলে যায় গোকুল গাঙ্গুলীর চায়ের দোকানে।

এই চায়ের আড্ডায় পাড়ার ছেলে বুড়ো অনেকেই জড় হয়। অবশ্য ছেলের সংখ্যাই বেশী। তারা আলোচনা করে সর্ব্ববিষয়ে। জার্মাণী রাশিয়ার যুদ্ধ-নীতি হইতে আরম্ভ করিয়া সিনেমা, কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি, স্ত্রী স্বাধীনতা—বাদ যায় না কিছুই। তবু তাদের বেশী উৎসাহ নারী, সিনেমা ও ফুটবল সম্বন্ধে আলোচনায়।

কেহ স্ত্রী স্বাধীনতার কুফল সম্বন্ধে তীব্র মত প্রকাশ করে, কেহ করে কম্যুনিষ্টদের নিন্দা। কেহ বা কাপে ঠোঁট ঠেকাইয়া বলে, মোহনবাগান মিলিটারীকে একখানা গোল যা ঢুকিয়েছে মাইরি—একেবারে ছবির মতন। শ্রেফ পিকচর।

চেঁচাইয়া গলা শুকাইয়া গেলে চা চায়। বলে, এদিকে একটা হাফ্ কাপ ঝাড় ত' গোকুলদা।

নন্দর ছেলে চপ্পল, গজল, কজ্জল তিন জনেরই আড্ডা এই দোকানে। তারা আসিলে নন্দ কোন কোন দিন উঠিয়া যায়, কোন কোন দিন বসিয়া থাকে।

আড্ডার কেহ চপ্পলদের বন্ধু। কারও বাপ নন্দের সমবয়সী তাই প্রায় সবাই নন্দকে খাতির করে। সম্পর্ক বা সুবাদে নাতি তারা, মধ্যে মধ্যে একটু আধটু উপহাস ও করে। বারবার করে একই প্রশ্ন।

নন্দ তাতে রাগে না বরং উৎসাহের সহিতই জবাব দেয়। প্রশ্নগুলি পুরাতন কলিকাতা ও কলিকাতার সামাজিক জীবন সম্বন্ধে।

কোন রাস্তা করে তৈরি হইয়াছে, কোন প্রাসাদের জমিতে আগে খোলার বস্তি ছিল, শোভাবাজার ও পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীতে দুর্গোৎসবের সময় নাট-মন্দিরে কতদিন পর্য্যন্ত বিজলী বাতি ঢুকিতে পারে নাই মোম জ্বালিয়াছে এই ধরণের সব প্রশ্ন। এসবের হিসাব ছিল নন্দ ঘোষের নখদর্পনে। তাই কেহ কেহ তাকে বলিত, ওল্ড ক্যালকাটা গাইড।

কেহ প্রশ্ন করে, এরকম ট্রাম কবে হল দাদু?

ইলেকট্রিকসিটির ট্রাম ? এইত সেদিন তখন আমরা ফ্রেস ইয়ংম্যান। অবশ্য বিয়ে সে পর্যন্ত হয়নি।

বুদো বলিল, তাহলে আর ইউথের সার্থকতা কি ?

নন্দ মুচকি হাসিয়া বলে, কিছু কিছু আছে বইকি ভায়া। বিয়েটাই কি সব ?

হ্যারিসন রোডে আগে ট্রাম ছিল না। মাঝখানে বড় বড় আলো জ্বলত।

আশু মুখুয্যে রোড, রসা রোড এখন দেখছ চওড়া রাস্তা। আগে ছিল সরু দুধারে খোলা নরদমা।

আর রাসবিহারী এভিনিউ ওখানে ত' ছিল জঙ্গল। রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের দিকে দিনেও ভয়ে কেউ যেতনা। সার্কাস স্কোয়ারের ওখানে ছিল দীঘি। রাত্তির হলেই চীৎকার উঠত, গেলুম রে। মলুমরে। বিপন্নের আর্তনাদ।

বেঙ্গল ইমিউনিটির জায়গাটায় বিরাট বস্তি। সামনে ওই যে লাকি সিনেমা ওখানে ফুলমণির আস্তাবল। মস্ত বড় গাড়ীর আড়গড়া। ফুলমণি মরার পর থেকে পেলে তার বোনপো ফটকে সাঁই। সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ীর দরজার উপর লেখা থাকত, এফ, সি, সাঁই।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিল, থার্ড ক্লাশে থাকত না ?

নন্দ ঘোষ তখন থার্ড ক্লাশের খবর রাখত না। আজ ফলেন কণ্ডিসন দেখে সেকথা তোমরা বিশ্বাস করবে কি না সন্দেহ। অনিল অতি শিষ্ট ছেলে সে বলিল, সেকি কথা দাদু, সবই আমরা শুনেছি। আচ্ছা, কলকাতায় প্রথম এরোপ্লেন কবে এসেছিল ?

টালিগঞ্জ ঘোড়দৌড়ের মাঠে প্রথম দেখলাম। ভীষণ ভিড়। উড়ো জাহাজ মাত্র দু'খানা। একখানা পাখীর মতন খানিকক্ষণ উড়ল। তাইবা কত, মিনিট পনের হবে। আর একখানা উঠেই গোত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতন পড়ে গেল। মনে হয় এই সেদিনের কথা। কিন্তু তাও হয়ে গেল আজ চল্লিশ বছর। হবেই ত। দেখতে দেখতে আমারই ফিফটি নাইন।

মোটে উনষাট ?

তবে তোমরা কি মনে কর পঁচাত্তর ? সাধন ময়রা, অকা বোস, লিখিয়ে গোবর্দ্ধন, ওরা সবাই আমার চেয়ে বড়। কিন্তু আমাকেই বড় দেখায়। আমার চুল সব সাদা, আর শরীর ঢিলে হয়ে গেছে ; কেন না চম্পলের মা মরার পর থেকে যত্ন করার আর কেউ নেই ত'। তাছাড়া ষ্ট্রগল।

একটা হাফ কাপে এদিকে চালিয়ে দিও গোকুল। ছেলেদের কাছে পয়সাটা চেও না। আমার নামে একাউণ্ট কর। বুঝলে ?

এই একাউণ্টের কথা নন্দ অনেক সময় ভুলিয়া যায়। কিন্তু তার ছেলেরা দোকানের প্রধান খরিদ্দার বলিয়া গোকুল এই হাফ্ কাপের হিসাব সম্বন্ধে উদাসীন।

গোকুল চা তৈরী করিতে আরম্ভ করিলে নন্দ বলিল, লিকারটা একটু ষ্ট্রং কর। তার চিনিটে জানই ত আমি বেশী খাই। দুধ অবশ্য I don't mind.

জার্মাণীর পরাজয়ের পর গোকুলের চায়ের দোকানে একটু মন্দা পড়িল। খরিদ্দারদের মধ্যে অনেকেই এ, আর, পিতে চাকরি করে। কেহবা সিভিক গার্ড। চাকরি কদিন থাকে ঠিক নাই তাই আগে প্রত্যহ যারা ডবল মামলেট খাইত তারা রোজ এখন সিঙ্গেলও খায় না। যার হিসাবে দশ বিশটা হাফ কাপ লেখা হইত সে নামিল চারটা হাফে।

নন্দর ছেলে বড়টি এ, আর, পিতে চাকরি করে। ছোটটি সিভিক গার্ড। মেজো গজল পাড়ার ফুড, ক্লথ, কেরোসিন কমিটি প্রভৃতি বহু কমিটির মেম্বর। সেও বেশ দু'পয়সা আনে।

গোকুলের দোকানে বসিয়া বুদো বলিল, এখন উপায়? আমরা ত' সবাই ডিসব্যাণ্ডো হচ্ছি।

চম্পল বলিল, ডিসব্যাণ্ডোর ভয় আমাদের নেই।

তিন চার জন এ, আর, পি, তার দিকে চাহিল। মৃণাল বলিল, কি রকম?

বেঁচে থাক ভুরামলের ফারম। আরে ভুরামলের ফারম। ভুরামলের নাম শোনান, মুল্টিমিলওনার। বিড়লার সঙ্গে নেক-টু-নেক চলে। তিনি বাবুর বুজম ফ্রেণ্ড কিনা।

এবার আর কেহ প্রশ্ন করিল না। বিড়লার সমশ্রেণীর লোক নন্দঘোষের বুজম ফ্রেণ্ড শুনিয়া সকলেই চম্পলের দিকে চাহিল।

চম্পল বলিল, আমাদের জমি কিনেছে কিনা ভুরামল—বরফ বস্তি। ওর উপরই তুলেছে বুণ্ডী হাউস।

প্রথমে চায়ের আড্ডায় তারপর পাড়াময় রটিল চম্পলরা ভুরামলের ফারমে কাজ পাইবে। তাদের বাবা ভুরামলের বন্ধু কি না।

বরিশালের একটি ছেলে চম্পলকে বলিল, দুপুরে কাজ করে বিয়াল্লিশ টাকা পাই। বাড়ীতে মণি অর্ডার করে কিছু আর থাকে না। তোমার বাবাকে বলে ভুরামলের ওখানে একটা কাজ জোগাড় করে দাও। অন্ততঃ অফ্‌টাইমের কাজ—তা' হলে বেঁচে যাই।

আমি বাবাকে বলব। তুমিও একবার ব'ল মাখন।

মাখন নন্দকে ধরিল। নন্দ বলিল, ওঃ এই কথা! ভেরি ইজি।

মাখন প্রথম কয়েকদিন নন্দকে পুরো কাপ চা খাওয়াইল। তারপর শুরু হইল হাফ্ কাপ। তিনি চারটা হাফের পরই সে তাগাদা দেয়, আমার কি-হল সার?

হবে, হবে, ভয় নেই। ট্রাম খরচা করে রোজই যাচ্ছি। দেখা পাই না। ভেরি বিজি। বিড়লার সঙ্গে নেক-টু-নেক কিনা। টাইম কোথায়?

নন্দর নিকটতম প্রতিবেশী করালী কলিকাতায় নূতন। বিড়লার সঙ্গে নেক-টু-নেক দৌড়ায় না বটে কিন্তু যুদ্ধের বাজারে সেও বেশ দু'পয়সা কামাইয়াছে। পুরানো মরিচা ধরা লোহা সোনার দরে বেচিয়াছে। মিলিটারী ও মিউনিসিপ্যালিটির টিউবওয়েল বসাইয়াছে।

আজ তার মেয়ের বিয়ে। তার বাড়ীতে লাল, নীল, বেগুনি নানারংয়ের আলো। ফটকের উপর রোশনচৌকি, উঠানে বিলাতী ব্যান্ড। ফুটপাতে বিচিত্র রঙের সামিয়ানা টাঙ্গানো। গাড়ী মোটরের ভিড়ে রাস্তায় চলা অসম্ভব। দরজার উপর ইলেক্ট্রিকের ব্রহ্মা।

করালীর বাড়ীর কোলেই নন্দর বাস্তু। তার ছাদে করালীর ভিয়ান হইয়াছে। দুইটা বাড়ীর মধ্যে—নন্দর ছাদের উপর করালী একটি দরজা ফুটাইয়াছে।

ছাদ ভিন্ন নন্দর সমস্ত বাড়ী অন্ধকার। দরজা একটা সরুগলির উপর। ব্ল্যাকআউট উঠিয়া গেলেও গলির আলো এখনও জ্বলে নাই। নন্দ ব্যস্তভাবে এক একবার দরজার কাছে ছুটিয়া আসে আবার ভিতরে যায়।

কবিরাজকে অনেকক্ষণ হইল খবর দেওরা হইয়াছে। কিন্তু সে আসে না। নন্দ অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। ছোট ছেলে কজ্জলকে ডাকিয়া বলে, তুই একটু দাঁড়া, আমি ও বাড়ী ঘুরে আসি নইলে করালী ভাববে কি? কবরেজের দেখছি ত ছত্রিশ মাসে বছর। গজল থাকলে ভাল হত, সে কবরেজের কাপড়, কয়লা ও তেলের যোগাড় করে দিয়েছে। তার কাছ থেকে ফি টা আর নিতে পারত না।

করালীর মেয়ের বিয়ে তাই—নন্দ নিজের হাতে কাপড় কুঁচাইয়া পাঞ্জাবি চুনট করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জামা কাপড় পরিয়া, পমেড দিয়া পাকা গোঁফ জোড়া উঁচু করিয়া সে এবার করালীর বাড়ী ছুটিয়া যায়। নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা শুরু করে। এই যে আসুন ভবেশবাবু, বসুন। নমস্কার মুখুয্যে মশাই। ছোট নটবর পান নিয়ে আয় রে।

আপনাকে সরবৎ দিক গিরীন বাবু। কাফির ব্যবস্থাও আছে পবিত্র দা। আপনার নাকি আজকাল চায়ে শানায় না।

মিষ্টার দাশগুপ্তকে চুরুট দেরে, নমস্তে। বর্মা দিবি।

ভাবটা এইরূপ যেন সে এই বাড়ীর মালিক। অভ্যাগতরা তারই নিমন্ত্রিত।

কেহ কেহ নন্দর সঙ্গে হাসিয়া কথা বলে, কেহ প্রতি নমস্কার করে। কেহ সেটুকুও করে না। কিন্তু তার ভ্রুক্ষেপ নাই।

সে করালীকে বলিল, আপনার ভাবনা নেই। আমরাই সব দেখছি মান্য-মানতদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়।

করালী প্রশ্ন করিল, আপনার বাড়ীর খবর কি?

খারাপ—তবে নো ফিয়ার।

করালী বলিল, কোনরকমে কাজটা উদ্ধার হয়ে গেলেই বাঁচি। আমার স্ত্রী শুভকাজের সময় কান্না মোটেই সইতে পারেন না। তার একটু হিষ্ট্রীও আছে। বড় মেয়ে যখন শ্বশুর বাড়ী যায় তখন পাশের বাড়ীতে মরা কান্না উঠল—মেয়ে আর ফিরল না। যাক আসি জয়চন্দর কবরেজকে খবর দিয়েছি। কালী কবরেজের ছেলে জয়চন্দর। আপনার জামাইর অবস্থা এত সঙ্গিন জানলে আপনার ছাদে ভিয়ান করতাম না। আপনি জিদ করলেন।

একদিকে মৃত্যু নিজের দরজায় দাঁড়াইয়া আর একদিকে করালীর গৃহে আনন্দ-উৎসব।

দু'টার সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া বেচারী গলদঘর্ম্ম হইয়া ওঠে।

বাজাও—ভাল করে ব্যাণ্ড বাজাও। বলিয়া সে আবার বাড়ী ছুটিয়া গেল।

তার মেয়ে পরীরাণী স্বামীকে লইয়া একা বসিয়া আছে। সে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করে, মধ্যে মধ্যে ঝিনুকে করিয়া একটু একটু জল দিয়া তার গলা ভিজায়। ভিজানো ন্যাকড়ায় চোখ মোছে।

বাতাসে তেলের আলোর ক্ষীণ শিখা একটু একটু নড়ে, সঙ্গে দেওয়ালে পড়ে কতকগুলি চলমান ছায়া, তার নিজের ছায়া, অক্সিজেন সিলিণ্ডার ও টেবিলের উপরের শিশি বোতলের ছায়া পড়ে—বড় ও বিকৃত হইয়া।

উঠানের একাধারে করালীর বাড়ীর আলো। তার পাশেই কল, চৌবাচ্চা এবং উঁচু পায়খানার দিকটায় গাঢ় অন্ধকার। সেদিকে চাহিলেই শরীর ছমছম করে।

রোগীর নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে সে জলে ডোবা মানুষের মতন একটা শব্দ করে।

পরীর মনে পড়ে অনেক কথা। এই বাড়ীরই একটা অংশ বন্ধক দিয়া তার বাবা তার বিবাহ দেন। জামাই নন্দর খুব পছন্দ হয়। মেয়েকে বলে, তোকে খুব ভাগ্যিমন্ত বলতে হবে। সুরেন সোনার টুকরো ছেলে।

ভাগ্যবতীই সে ছিল বটে। অমন লেখাপড়া জানা স্বামী। কত তার প্রেম। কজনে এমন পায়। কিন্তু আজ তার সেই সৌভাগ্যে কাঁটা পড়িতে চলিল।

অবস্থা কিছুদিন যাবতই খারাপ। তবে খুব বেশী খারাপ হইয়াছে কাল ছাদের উপর ভিয়ান হওয়ার পর হইতে।

মাথার উপর ছয় ছয়টা বিরাট চুল্লীর আঁচ, কয়লার ধোঁয়া ঘিয়ের ধোঁয়া। তার উপর আছে মানুষের কলরব, ব্যাণ্ডের বাজনা। সুস্থ মানুষেরই দম বন্ধ হইয়া আসে।

করালী চায় নাই। তার বাবা কেন উপযাচক হইয়া ছাদে উনান করিতে দিলেন এইজন্য তার উপর অভিমান ছিল। নন্দর এই গায়ে পড়িয়া লোক-লৌকিকতার অভ্যাস তার ছেলে মেয়েরা পছন্দ করে না। বেশী অপছন্দ করে পরী।

স্বামীর শিয়রে বসিয়া যমের সঙ্গে পরী লড়াই করে আজ ছয় মাস। বাড়ীতে অন্য কোন স্ত্রীলোক নাই। সাহায্য পাওয়া ত' দূরের কথা—বলিবার মতন একটা মানুষও নাই। পিতা ও ভ্রাতারা আপিস, আড্ডা ও কমিটি লইয়া ব্যস্ত। তবু ভাল যে সুরেনের অসুখ খুব বেশী হওয়ায় আজ ক'দিন তারা রান্না করিয়া খায়।

রোগীর পথ্য তৈরী হইতে আরম্ভ করিয়া স্পঞ্জ করা, মাথা ধোয়ান, মলমূত্র পরিস্কার সবই পরীরাণীকে এক হাতে করিতে হয়। আহার নাই, বিশ্রাম ও নিদ্রা নাই। রাতের পর রাত জাগিয়া শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

তবু যদি রোগীর একটু উপকার হইত তাহা হইলে সার্থক হইত এই শ্রম। কাল রাত্রি হইতে মধ্যে মধ্যে অক্সিজেন চলিতেছে কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তাই কবিরাজের ডাক পড়িল।

কবিরাজ আসিল। বয়স ত্রিশের কম, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতন চেহারা, গোঁফ দাড়ি পরিস্কার কামানো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, কাঁধের উপর পাটকরা খদ্দরের ধবধবে সাদা চাদর, হাতে লাঠি।

কবিরাজ বলিল, একটু দেরি হয়ে গেল ঘোষ মশাই। বালীগঞ্জে গিয়েছিলাম। এসে শুনলাম আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন। জরুরী দরকার।

নন্দ বলিল, জামাইর অসুখ। জানই ত কবরেজিতে তোমার কেমন ফেইথ্!

অবশ্য তোমার বাবার জন্যই হয়েছিল, তিনি নাড়ী ধরে সত্য-ত্রেতার খবর বলতে পারতেন। এই মেয়েকেও যমের সঙ্গে লড়াই করে তিনি বাঁচিয়ে ছিলেন। শুধু ভাল কবরেজ নয়। মানুষও ছিলেন চমৎকার। ও রকমটি আর হয় না। একে একে তাঁরা সব চলে গেলেন। তারপর নন্দ নীচু গলায় আক্ষেপ করিল, গুড্ ওল্ড ডেজ।

কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, রোগ কত দিনের?

সে লম্বা ইতিহাস। আমার পরী বলতে পারে।

ততক্ষণ তারা রোগীর ঘরের দরজা পর্যন্ত আসিয়াছিল। নন্দ বলিল, বলত মা এঁকে রোগের অবস্থাটা। রোগের হিস্ট্রী।

রোগীর নাভিশ্বাস উপস্থিত। ইতিহাস শোনা অনাবশ্যক। কবিরাজ একবার ডান হাতের নাড়ী পরীক্ষা করিল, তারপর বাঁ হাতের। আবার ডান হাত ধরিয়া খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল।

নন্দ তখন কবিরাজের উদ্দেশে বলিয়াই চলিয়াছে আমি যত বলি কবরেজি কর, গ্রাহ্যই নেই। আজ-কাল এদের সব ইনজেকসন না হলে শানায় না!

কবিরাজের এক একবার মনে হয় রোগীর কব্জির নীচে সরু একটু সুতা নড়ে, আবার কিছুই পাওয়া যায় না।

পরী বোঝে সবই। তবু কবিরাজের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে, কাঠ-গড়ায় আসামী হাকিমের আদেশ শুনিবার জন্য যেমন তার দিকে চায় ঠিক সেই ভাবে।

কবিরাজ অস্বস্তি বোধ করে। একটা কিছু বলা দরকার অথচ কি বলিবে। অগত্যা নন্দের দিকে চাহিয়া বলিল, বাতাসটা বড় ভারী। রোগীর দরকার বিশুদ্ধ বায়ুর।

অক্সিজেন সিলিণ্ডার দেখাইয়া নন্দ বলিল ঐ চোঙাটা দেখছনা জয়চন্দর। ডাক্তাররা ঐ জন্যই এনেছে। কিন্তু—

কবিরাজ বলিল, ধোঁয়াটা কোনমতে বন্ধ করা যায় না?

নন্দ মেয়ের কাছে নিজের দোষ স্খালনের জন্যই যেন বলিল, পাশের বাড়ীর কাজ। ভদ্রলোক চাইলেন। না বলতে পারলাম না। বংশের ট্রাডিশন।

ছিঃ বাবা—অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উহা বলিয়াই পরী থামিয়া গেল। কবিরাজ ও তাহা শুনিতে পাইল।

কথাটা চাপা দিবার জন্যই নন্দ উচু গলায় বলিল, তোমার বাবাকে দেখেছি এই রকম সব কেস অদ্ভুত সারিয়ে তুলতেন। তাই তোমাকে ডাকা।

কবিরাজ বাহিরে আসিয়া বলিল. বড্ড দেরি হয়ে গেছে, ঘোষ মশাই। ডেকেছেন প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে।

তা কি বুঝি না ? দেখে দেখে, রোগীর সেবা করে আমিও বহুদর্শী হয়ে পড়েছি। আগে বসতুম তোমার বাবার বৈঠকখানায়। এখন বসছি মাইতি মেডিক্যাল ষ্টোরসে। যাক তোমাদের ত অনেক ভাল ভাল দাওয়াই আছে, মাস্কো, মকরধ্বজ, চব্যনপ্রাশ, ছাগলাদ ঘি, দাওনা ঠুকে।

বেশ আমার সঙ্গে একজন চলুন।

আমার ছোট ছেলে কুঞ্জল যাবে। গজল বাড়ী নেই। ভগ্নীপতির চিকিৎসার সব করে সেই।

গজলের নাম করা সত্ত্বেও কবিরাজ ফি নিল। তবে অর্দ্ধেক।

নন্দ বলিল, ঝপ করে আসবি কুঞ্জল। পরী একা রইল।

বাহির হইতেই সে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল। ভিতরে আসিয়া দেখে জানালার পাশে বসিয়া পরী কাঁদিতেছে।

নন্দ ভাবে এ কী বিপদ। বলে, কাঁদিসনে, কবরেজ বলে গেল ভেতরে জ্ঞান আছে। ও সব বুঝতে পারছে।

পরীরাণী—বড় স্থির ধীর, এত বিপদেও কর্ত্তব্যচ্যুত হয় নাই। দুর্ব্বলতা দেখায় নাই। কিন্তু আজ আর সে পারে না। ফাটিয়া পড়ে। বলে, না বাবা, আজ একটু কাঁদতে দাও।

নন্দ একটু অপ্রস্তুতভাবে বাহির হইয়া গেল।

পরীর ধারণা সে জাগিয়া থাকিতে যম তার স্বামীকে লইয়া যাইতে পারিবে না। সত্যিকার যে ভালবাসে তার সামনে দিয়া প্রেমাষ্পদকে লইয়া যাওয়া মৃত্যু-দেবতার পক্ষেও অসম্ভব।

সুরেনেরও বাঁচার বড় সাধ। কতবার সে বলিয়াছে যে করে হ'ক ধরে রাখ। যেতে দিও না আমাকে পরি। তোমার ঐ দু'খানা হাতের মধ্যে বেঁধে রাখ।

পরী রাতের পর রাত সেবা করে। ঘুমায় না। পাহারা দেয়। কিন্তু আজ সে আর পারিল না। অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তার শয্যা পার্শ্বেই এলাইয়া পড়িল।

কাজের বাড়ীতে আসিযা নন্দ আবার ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। হাঁক ডাক করিতে লাগিল।

ওরে পান নিয়ে আয় এদিকে, সিগ্রেট আনিস বুদো।

পেট ভরল মিস্টার ব্যানার্জী ? রাম রাম মহাদেও বাবু। তবিয়ত আচ্ছা ? সুরেয কিস মাফিক ?

জয়চন্দর কবরেজ ওর ইলাচ করে আচ্ছা কর্ দিয়েছে। দরদ ছিলো হুঁপানি।

আমি জামাইর জন্য তাকেই আজ কল দিয়েছি। বেশ ছোকরা।

বুদো পান আনিলে নন্দ এক থাবায় যতগুলি পারে উঠাইল।

পান দিয়া সে মহাদেও বাবু, মিঃ এ, সি, সেন, বি, সি, সেন প্রভৃতি অনেককে আপ্যায়িত করিল।

পান চিবাইতে চিবাইতে তার বাল্য সুহৃৎ সত্যশরণ নামিতে ছিল, তার হাতেও দুটা পান দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ বুাদার ?

ভাই। তোমার সঙ্গে কথা আছে বলিয়া সত্যশরণ তাকে একান্তে ডাকিয়া কহিল, করালী তোমার নামে যে এটর্নীর চিঠি দিয়েছে। সোমের আপিসে দেখে এলুম। এক মাসের মধ্যে টাকা না দিলে নালিশ করবে।

নন্দ একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর কহিল, জানি ভাই। এ বাস্তুটুকুও যাবে। সোম সেদিন আগেই আমায় বলেছিল, যাক্।

ওরে ভুলো, ভুলো, শরণ বাবুর জন্য একটা পান নিয়ে আয়।

ক্ষণিকা

টেলিগ্রাম পাইয়া বড় মাকে দেখিতে দেশে চলিয়াছি। তাঁর খুব অসুখ। শেষ রাত্রির কনকনে শীতের মধ্যে লুসাই স্টীমারে উঠিলাম। খুলনা হইতে যে সব স্টীমার, ছাড়ে তার মধ্যে আমাদের লাইনের গুলিই বড়, কুলীন স্টীমার, যাত্রী বেশী, মাল চলাচলও বেশী,। কৈশোরে এই জন্য গর্ব বোধ করিতাম। আজও তাহা একেবারে মরিয়া যায় নাই।

দোতলার ডেকে রেলিং-এর পাশে বিছানা বিছাইয়া বসিয়া আছি। গায়ে র‍্যাগ জড়ানো। এক দিকে আলোর মালা পরা ছোট্ট শহর খুলনা, যেন, হারেমের দুলালী ঘুমাইয়া আছে। তার বুকে হাজারো আশা নিরাশা ঢেউ খেলে; উঁকি মারে সহস্র স্বপ্ন। সে হাসে কাঁদে। এখানে ওখানে কালো কালো গাছগুলি হাবসী খোজার মতন হারেম পাহারা দেয়।

পরপারে লাজুক গ্রাম্য কুলবধুর মতন মাথায় অন্ধকারের ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে। আমার কতই না পরিচিত এই গ্রাম-শ্রী। কত না আপনার।

রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে পাতলা হইয়া আসে। আধ-আলো আধ-ছায়াময়ী প্রকৃতি আরও যেন রহস্যে ভরিয়া ওঠে। ছইওয়ালা নৌকায় এক মাঝি বিরহের গান গাহিয়া যায়। শীত রাতের বিরহ বেদনা বুকে করিয়া ভৈরবের ঢেউ সে ঠেলিয়া চলিয়াছে।

এই দৃশ্যের মধ্যে ডুবিয়াছিলাম। হঠাৎ ফিরিয়া দেখি আমার পাশে মাদুরের উপর দাড়িওয়ালা এক মুসলমান নামাজ পড়িতেছে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। সে ওঠে, দাঁড়ায়, উবু হয়। হাঁটুতে হাত রাখিয়া জগদীশ্বরকে ডাকে। দুই করতল চোখের সামনে ধরিয়া কি যেন পড়ে। দাঁড়াইয়া বলে, আল্লাহো আকবর। ঐ ধ্বনি করিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।

রাত্রে ঘুম হয় নাই। চোখ বুজিয়া আসিল। ঘুমাইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখিলাম বড় মায়ের কাছে বসিয়া আছি। তাঁর শ্বাস হইয়াছে। ডাকিলাম, মা, মা।

অভিমানিনী মা আমার উত্তর করিলেন না। আবার ডাকিলাম, মা।

নিজের ডাকেই নিজের ঘুম ভাঙিল। পাশ ফিরিয়া দেখি এক তরুণী এক প্রৌঢ়ের নাকের উপর রুমাল চাপিয়া বসিয়া আছে। কী উগ্র গন্ধ!

প্রৌঢ় জোরে নিঃশ্বাস নেয়। তার চোখ দুটা যেন ঠিকরিয়া পড়ে। তরুণী এক একবার হাত সরাইয়া নেয় আবার রুমালখানা রোগীর নাকের কাছে ধরে।

মেয়েটি শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল দুটি চোখ, সপ্রতিভ চাহনি। কোথায় যেন দেখিয়াছি। এক একজনকে দেখিলে এই রকম মনে হয়, অপরিচিত মুখ প্রায়-বিস্মৃত পরিচিতের রেখায় সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল অনেকের। একদল শয্যার পাশে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে, ওপাশে তাস খেলিতে খেলিতে আর একদল এই দিকে ঘন ঘন তাকায়। আর মুসলমানটির ত কথাই নাই। তার চাহনিতে আকুল আগ্রহ। মেয়েটির সঙ্গে সে আলাপ করিতে চায়।

আমার রাগ হইল। ভিড়ের মধ্যের এক কিশোরকে ধমক দিলাম, কি দেখছ? রোগীর হাওয়া বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছ যে?

এক একজন করিয়া সকলেই সরিয়া পড়িল। তরুণী আমার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিল। যেন বলিল, ধন্যবাদ।

ধীরে ধীরে রোগীর যাতনার উপশম হয়। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে—আঃ। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলে, রোজই এরকম হয়। দুবার, তিনবার। আগে ওষুধে কথা কইত, আধ মিনিটে কমত। এখন লাগে আধ ঘণ্টা। এরপর ওষুধে আর ধরবেই না।

তাকে আশ্বাস দেই, হয়ত এ ওষুধের দরকারই হবে না, আপনি সেরে উঠবেন।

তরুণীও আমার কথায় সায় দিল। প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হেঃ হেঃ।

এই হাসিতে তার ভিতরটা আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল; যেন জীর্ণ একটা গাছ, উইয়ে পোকা মাকড়ে ঝরঝরে করিয়া দিয়াছে।

আকাশ ততক্ষণে রোদে ছাইয়া গিয়াছিল, গাছপালা লতাপাতায় নদীর বুকে আলোর ঝিলিমিলি। সেই তরল আলোকে খান খান করিয়া জাহাজ ছোটে। ঢেউগুলি সাপের মতন ফণা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করে। তার উপর গাং চিল আসিয়া বসে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খায়, ডুব দেয়।

জাহাজ একটা ঘাটে ভিড়িল। পারের ধারের খান কয়েক নৌকা জলের উপর আছাড় খাইতে লাগিল। কয়েকটি যাত্রী নামিল, উঠিলও কয়েকজন। তীরে

যাত্রীর চেয়ে বেশী ভিড় ছিল ফেরিওয়ালার ; কৌতূহলীরা সংখ্যায় হয়ত আরও বেশী।

ছোট বড় যুবা বৃদ্ধের দল হাঁ করিয়া জাহাজের দিকে তাকাইয়া আছে। অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু দেখার তৃষ্ণা মেটে নাই, জিনিসটা রহস্যময়ই রহিয়া গিয়াছে।

আর একদল আসিয়াছে বেসাতি লইয়া, তাদের মধ্যে দশ বার বছরের কিশোর কিশোরী আছে। আছে যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। হাতে দুধের ঘটি, দইয়ের ভাঁড়, মুড়ি চিড়া পাটালি।

স্টীমার তীরে ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণী নিচে নামিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে উপরে আসিল এক বাটি গরম দুধ লইয়া। ঢালাঢালি করিয়া প্রৌঢ়কে খানিকটা দুধ ও সন্দেশ দিয়া কহিল, একটু দেরি হয়ে গেল।

তার স্বামী বলিল, সে খেয়াল কি তোমার আছে ?

এই অভিযোগের উত্তরে মেয়েটি শান্তভাবে বলিল, খাও লক্ষ্মীটি।

প্রৌঢ়কে মোটেই ভাল লাগে না। লোকটা নির্লজ্জ, দুধ খায় চক্ চক্ শব্দ করিয়া। জিভ দিয়া কশ চাটিতে চাটিতে আরও সন্দেশ চায়। তরুণী দুটি সন্দেশ দিলে আবার বলে, আর দুধ নেই ?

আছে। আর কি খাবে ? এক সঙ্গে—

প্রৌঢ় বাধা দিয়া কহিল, সব সময়েই তুমি আমাকে না খাইয়ে রাখতে চাও।

তোমার সহ্য হয় না যে।

তাও তুমি আমার চেয়ে বেশী বোঝ ?

বেশ খাও—বলিয়া মেয়েটি বাটিতে আরও খানিকটা দুধ ঢালিয়া দেয়। উহা খাইয়া রোগী চোখ বোজে। তরুণী তার কপাল টেপে, মাথায় চুলের মধ্যে হাত বুলায়। রোগী ধীরে ধীরে নাক ডাকাইতে আরম্ভ করে।

আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাবেন আপনারা ?

পাটগাতি। আপনি ?

জলাবাড়ি।

তরুণী কহিল, ভালই হল। পাটগাতিতে নামার সময় আপনি আমাদের একটু সাহায্য করবেন। মাল পত্তর অনেক, সঙ্গে আর কেউ নেই।

নিশ্চয় করব, অফ কোর্স—কথাটা বলিলাম একটু অনাবশ্যক জোর দিয়া। নিজের কানেই কেমন যেন বাজিল।

দু'চারটা কথা বার্তার মধ্যে মেয়েটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইলাম। বাড়ি তাদের

পাটগাতি হইতে বেশ কিছুটা দূরে। অসুস্থ স্বামীকে লইয়া সে দেশে চলিয়াছে।

আগেই অনুমান করিয়াছিলাম। কথাটা শোনার পর কিন্তু রাগ হইল। এই মানুষটা মেয়েটিকে আদর করে, তার কাছে আদর আদায় করিয়া নেয়। আমি বলিয়া উঠিলাম, স্বামী!

আমার কণ্ঠস্বরে হয়ত বিরক্তি ও বিস্ময় দুইই ছিল। তার প্রতিবাদেই যেন তরুণী জোর দিয়া বলিল, ভারী ভাল মানুষ। অসুখে ভুগছেন আজ তিন বছরের উপর। কলিকাতায় মার্চেণ্ট অপিসে কাজ করতেন। গ্র্যাজুয়েট।

মেয়েটি আঘাত পাইয়াছে দেখিয়া সঙ্কোচ বোধ হইল। কথাটা ঘুরাইয়া নিয়া কহিলাম, দেশে কে আছে আপনাদের?

কেউ নেই। আমার দুই কুলই পরিষ্কার।

দেখাশুনা কে করবেন?

আমিই দেখব। আর উনি আমায় দেখবেন। কলকাতায় অবশ্য অফিসের বন্ধু বান্ধবেরা ছিলেন। তাঁদেরই একজন এই অবধি এসে তুলে দিয়ে গেলেন—একটু থামিয়া মেয়েটি আবার প্রশ্ন করিল, খোলা আলো বাতাসে সেরে উঠবেন আশা করি। কি বলেন?

রোগীর বয়স হইয়াছে শরীর রক্তহীন, চোখ মুখ ফুলা ফুলা। কপালের দুধারে দুইটা গর্ত। অত্যন্ত আশাবাদীও তার সম্পর্কে কোন আশ্বাস দিতে পারে কিনা সন্দেহ। তবু বলিলাম, হ্যাঁ, সেরে উঠবেন বৈকি।

এরপর কিছুক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হয় না। বাঁকের মাথায় হুইশল দিয়া ষ্টীমার চলে। ছোট ছোট জলযানকে যেন বলে, হুঁসিয়ার। দুই তীর দিয়া দ্রুত সরিয়া যায় মাঠ ঘাট, ঘর বাড়ি, গেঁয়ো পথ, মন্দির, মসজিদ, পাঠশালা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তরুণ তরুণীরা নদীতে স্নান করে, জাহাজের ঢেউয়ের উপর দোল খায়। মনে হইল এই দোল খাওয়ার সঙ্গে আমাদের জীবনের সাদৃশ্য অনেকখানি। আমরাও ঢেউয়ে দোল খাই, ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া চলি।

মনে পড়ে বড় মাকে। তাঁকে কি দেখেতে পাইব? তিনি অভিমান করিয়াছেন। অপরাধ আমার, তাঁর স্নেহপুষ্ট আমি। আমাকে তিনি পালন করিয়াছেন, বড় করিয়াছেন। মানুষ করিয়াছেন কিনা জানি না। আমাকে দেখিলে হয়ত সুস্থ হইয়া উঠিবেন। তাহা হইলে বুঝিব আমার উপর কোন রাগ নাই। রাগ কি তিনি করিতে পারেন? তিনি যে মা।

পাশে চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ হয়। জলাবাড়ি হইতে মন আবার চলিয়া আসে

লাসাই জাহাজে। চুড়ির আওয়াজ যে এত সুন্দর জানিতাম না। শুধু ত কখানা কাচের চুড়ি।

তরুণী স্বামীর কাছে শুইয়া পা হইতে গলা পর্যন্ত একটা চাদর টানিয়া দিল। বাহিরে রহিল শুধু মুখখানি আর ডান পায়ের দুটি আঙুল। শান্ত স্নিগ্ধ মুখ—এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, এবার দেখিলাম তার উপর অস্পষ্ট কালো ছাঁয়া। ব্যাধির সঙ্গে, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়িয়া বেচারী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তারই আভাস।

একটা কি দুইটা ষ্টেশন ফেলিয়া আসিযাছি। সামনে আর একটা। জাহাজ ঘন ঘন হুইশল দেয়। আমি একতলায় সামনের ডেকে আসিয়া দাঁড়াই।

পারের কাছে জলের তোড় খুব। সারেং বহু চেষ্টায়ও ষ্টীমার তীরে ভিড়াইতে পারে না। দুইটি জোয়ান খালাসী তার ও কাছি লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। পারে যাইয়া ওঠে ঢেউয়ের সঙ্গে রীতিমত কসরৎ করিয়া। একটা বটগাছে কাছি বাঁধে, তার জড়ায় মাটিতে পোঁতা লোহার থামের সঙ্গে।

জাহাজ হইতে দুইখানা তক্তা ফেলিয়া দেওয়া হয়। তারা উহা টানিয়া পারে তুলিয়া সিঁড়ি বানায়। সিঁড়ির দুই পাশে দুটা বাঁশ ধরিয়া দুজনে দাঁড়াইয়া থাকে, যেন ব্রোঞ্জে গড়া স্বাস্থ্য ও যৌবনের দুই মূর্ত প্রতীক।

ষ্টেশনে নামিল পাঁচ সাতটি লোক, উঠিল মাত্র তিনজন। তার মধ্যে একটি ছিল কিশোরী। বোরখার ভিতর হইতে বিদ্যুৎ চঞ্চল চাহনি দিয়া খালাসীদের যৌবনকে সে বুঝি একবার অভিবাদন জানাইল।

আমি ডাঙায় নামিয়াছিলাম ফিরিলাম দুই ভাঁড় কাঁচি দই ও কতকগুলি পাকা কলা লইয়া। বাঁশ দুইটা ও সিঁড়ির একখানা কাঠ আগেই জাহাজে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল। অবশিষ্ট কাঠখানার উপর দিয়া কোনরকমে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া টলিতে টলিতে জাহাজে উঠিলাম। উঠিয়াই সহযাত্রিণীর কৌতুকচঞ্চল চাহনিতে বুঝিলাম আমার টলার বহর দেখিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। ইচ্ছা হইল আমার কৃতিত্বের ফর্দটাও তাকে শুনাইয়া দেই। শ' ওয়ালেসের লেজার বাবু আমি, বি কম পর্যন্ত পড়িয়াছি। উপরন্তু একজন কবি। 'মধুচক্র' আমার তিন তিনটি গদ্য কবিতা ছাপাইয়াছে। সেগুলিব সুখ্যাতিও হইয়াছে। কপিগুলি আমার সঙ্গেই ছিল (সব সময়ই থাকে)। কিন্তু উহা আর দেখানো হইল না।

উপরে আসিয়া দেখি প্রৌঢ় যমের সঙ্গে লড়াই বাধাইয়া দিয়াছে, সেই অসম

দুন্দের চোখ কপালে উঠিয়া গিয়াছে, পাঁজরার হাড়ে হাড়ে চলিয়াছে কাল বৈশাখীর ঝড়।

স্ত্রীকে দেখিয়াই সে নিজের পেটে চাপড় দিয়া বলিল, পেট একেবারে বেলুন হ'য়ে উঠেছে ; যেন গ্যাস বেলুন। আমি যেতে বসেছি, আর তুমি—

মেয়েটি বলিল, নীচে গিছলুম হাত মুখ ধুতে।

এত করে বলি বেশী খেতে দিও না আর তুমি কিনা সারাক্ষণ গাণ্ডি পিণ্ডি গেলাবে।

তরুণী মৃদুকণ্ঠে কহিল, তুমি অমন করে চাইলে।

রোগী ত চাইবেই। তোমার উচিত ছিল না দেওয়া কিন্তু তুমি যে খোশ মেজাজে গল্প করছিলে। আমার কথা ভাবার কি সময় ছিল!

লোকটার নীচতায় রাগ হয়, মনে হয় এর হাতে পড়িয়া মেয়েটির কি শোচনীয় অবস্থা। সে স্ত্রীকে খোঁচা দিয়া কথা বলে আর আর্তনাদ করে, গেল, গেল, প্রাণ গেল। এমিল, এমিল নাইট্রেট!

তার স্ত্রী একটা ক্যাপশুল ভাঙিযা রুমালে করিয়া স্বামীর নাকের কাছে ধরে। রোগী একবার ওঠে আবার বসে। তার সর্বাঙ্গ ঘামিয়া যায়। কষ্ট বাড়িয়াই চলে।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটার পর তরুণী রুমালখানা আমার হাতে দিয়া একটা এ্যাটাচি কেস খোলে। তাতে ছিল ঔষধ ও ইনজেকশনের সাজ সরঞ্জাম। সে স্পিরিট দিয়া সিরিঞ্জ ধোয়, টিউব ভাঙিয়া সিরিঞ্জে ঔষধ ভরে।

'ষ্টেটসম্যান দিয়া রোগীর মাথায় বাতাস করিতেছিলাম। তরুণী বলিল, বাতাস এখন থাক। ও'র ডান হাতখানা চেপে ধরুন ত। শিরা তুলতে হবে।

আমার উপর যেন দাবি আছে এমনই সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী। বেশ লাগে।

এ সব ব্যাপারে মোটেই অভ্যস্ত নই, ইনজেকশনের সাজ সরঞ্জাম দেখিলে সরিয়া পড়াই আমার স্বভাব। কিন্তু তার অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। ঠিক এই সময় কে একজন বলিল, সিরিঞ্জটা দয়া করে আমার হাতে দিন। আমি ডাক্তার।

চাহিয়া দেখি মুসলমান যুবকটি তরুণীর পাশে দাঁড়াইয়া, একরকম তার গা ঘেঁষিয়া বলিলেই চলে। আর মেয়েটির ভাব ভঙ্গীতে মনে হইল সে যেন মুশকিল আসানের সাক্ষাৎ পাইয়াছে।

যুবক তাকে জিজ্ঞাসা করিল, ইন্টার-ভেনাস দিতে হবে ত? ওষুধটা কি এ্যামিনোফাইলিন?

তরুণী কহিল, প্লুকোফাইলিন।

অজানা নাম, মনে থাকিবার কথা নয় কিন্তু নাম দুটা আজও আমার মনে আছে। ডাক্তারের ভুলে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি ঠিক এই সময় সে একটা ধমক দিল, হাঁ করে দেখছেন কি? সরে বসুন।

ভাবটা এই যে আমি যেন কাজের কত ব্যাঘাত করিতেছি। আমি অপ্রস্তুত ভাবে সরিয়া বসিলাম।

আমার কোন সাহায্য সে চায় না, নিজেই রোগীর কনুইয়ের একটু উপরে বাহুতে রবারের নল বাঁধে। একটা শিরা ফুলিয়া ওঠে। মোটা শিরা কিন্তু স্পর্শকাতর, ছুঁচের ছোঁয়া মাত্রই সরিয়া যায়। ইনজেকশন দিতে বেশ বেগ পাইতে হয়। ডাক্তার তরণীকে বলে, আপনি ত খুব এক্সপার্ট দেখছি। এই ভেইনএ ইনজেকশন দেন!

তরুণী কোন উত্তর করে না।

ইনজেকশনের পর যন্ত্রণা আরও বাড়ে, রোগী ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়, 'বুক গেল, বুক গেল' বলিয়া চেঁচায়। তার মুখ শাদা হইয়া যায়। আমি জোরে তার বুক টিপিতে থাকি।

আমি ত দূরের কথা, ডাক্তারও ভয় পাইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল গায়ে পড়িয়া ইনজেকশন দিতে আসিয়া কী ভুলই না করিয়াছে।

কিন্তু তরুণী অচঞ্চল, সে স্বামীর হাত পায়ের আঙুল টানিতে টানিতে আশ্বাস দেয়, এখুনি কমবে। ভয় নেই, একটু সহ্য করে থাক।

কিছুক্ষণ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগের পর রোগী চোখ বোজে. তার যেন একটা ফাঁড়া কাটিয়া যায়।

যুবক তরুণীকে রোগের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করে। কি কি লক্ষণ, কিসে উপশম হয়, বাড়েই বা কিসে, কোন্ সময়ে কোন্ ঋতুতে এইসব জানিতে চায়। আলোচনা হয় অনেক রকম। মেয়েটি বলে, যেসব ঔষধে আগে উপশম হইত সেগুলিতে এখন আর কাজ হয় না। রোগী দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। আছে শুধু ক্ষুধাটা।

ডাক্তার বলে, ও একটা খুব ভাল লক্ষণ।

তরুণী পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল, দেশে ভাল চিকিৎসক হয়ত পাওয়া যাইবে না। বাড়াবাড়ি হইলে কি করিবে।

ডাক্তার বলিল, ইন্টারভেনাস ইনজেকশন আর দেবেন না। হার্ট সোজাসুজি

পাঁচ সি সি গ্লুকোজও নিতে পারছে না। ওঁকে গ্লুকোজ খেতে দেবেন, গ্লুকোজ, মধু, মকরধ্বজ।

আমি স্তব্ধভাবে বসিয়াছিলাম—যেন একটি পুতুল। অর্থহীন দৃষ্টিতে ডাক্তার ও তরুণীর দিকে চাহিয়া আছি। তারা কত কি আলাপ করে। সব কথা কানে যায় না, শুনিতে ইচ্ছাও করে না; কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তরুণীর নিকট হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছি। নিজের চারধারে যে স্বপ্ন জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিলাম সেই জগৎ পায়ের তলা হইতে সরিয়া গিয়াছে।

মন বিতৃষ্ণায় ভরা; বিতৃষ্ণা সমস্ত পরিস্থিতির উপর, নিজের উপর। ডাক্তার হইলাম না কেন? বড়মার ইচ্ছা ছিল আমি ডাক্তার হই। এ্যানাটমি বায়লজি সার্জারির ভয়ে রাজী হই নাই। নরকঙ্কাল দেখিলে ভয় করিত।

চেষ্টা করি সান্ত্বনা খুঁজিবার। আমি কবি, শব্দলক্ষ্মীকে রূপ দেই, তাকে সাজাই কত অলঙ্কারে। আমার সৃষ্টির উপাদান আকাশ নদী, গ্রহ, নক্ষত্র, সর্বোপরি মানুষ, তার সুখ দুঃখ, তার হাসি কান্না। আর ডাক্তারের কারবার রক্ত-মাংস-মেদ লইয়া।

কিন্তু এই সান্ত্বনাও ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। ডাক্তারের সঙ্গে তরুণী কী আলাপই না জমাইয়াছে, তাদের বাহিরে আর কোন কিছুরই যেন অস্তিত্ব নাই।

সময় কাটে – নিষ্ঠুর অলস কতগুলি মুহূর্ত। বেশ কিছু পরে রোগী চোখ মেলিয়া যুবককে কহিল, আপনি আজ আমার প্রাণ দিলেন, ডাক্তার—

যুবক কহিল, আমার নাম আবুল কাশেম রহিমুদ্দীন।

প্রৌঢ় দুই হাত কপালে ছোঁয়াইয়া বলিল, নমস্কার রহিমুদ্দীন সাহেব, কি করে যে কৃতজ্ঞতা—

যুবক বাধা দিয়া কহিল, কৃতজ্ঞতার কিছু নেই। উনিই পারতেন। সামনে ছিলাম, তাই এগিয়ে এসেছি। এযে আমাদের কর্তব্য।

প্রৌঢ় স্ত্রীকে দিয়া কতগুলি ঔষধ বাহির করাইয়া কহিল, দেখুন ত আমার এই অবস্থায় খাটবে কিনা।

ঔষধগুলি দেখিতে দেখিতে আবুল কাশেম জিজ্ঞাসা করিল, কে দেখছেন আপনাকে?

ডাক্তার গুপ্ত। আর ওষুধ যোগাচ্ছে আপিস।

আপনি ত ধন্বন্তরির হাতে আছেন, আমি আর কি বলব? তবে মনে হয় ইন্টারভেনাস কোন ইনজেকশনই আপনার সহ্য হবে না। এ সম্পর্কে ওঁকে, আপনার—

রোগী পাদপূরণ করিয়া দিল, উনি আমার স্ত্রী, শ্রীমতী রীণা ভরদ্বাজ।

আবুল কাশেম কহিল, শ্রীমতী ভরদ্বাজকে আমি আগেই সব বলেছি। আচ্ছা দেখি আপনার প্রেসারটা।

সে রক্তের চাপ পরীক্ষার যন্ত্র লইয়া আসে। রক্তের চাপ দেখে।

এ কী! ডায়ষ্টালিক ১১০ আর সিষ্টালিক মাত্র ৪০। সাবধানে থাকবেন মিষ্টার রিণ।

সে হাসিয়া কহিল, রিণ আমি নই, আমার স্ত্রী।

ডাক্তারের এই ভুল ইচ্ছাকৃত। মেয়েটির সঙ্গে সে গায়ে পড়িয়া ঘনিষ্টতা করিতে চায়। আমার রাগ হইল, রক্তের চাপও হয়ত বাড়িল। কিন্তু আমার অবস্থা তখন নতুন লেখকের গল্পের ফুটকির মতন, যেন অর্থহীন কালো একটা বিন্দু।

ভোঁ-ও-ও—ও-জাহাজের হুইশল বাজে।

রোগী বলে, এবার বোধহয় পাটগাতি।

ডাক্তার বলিয়া উঠিল, পাটগাতি! আমারও এখানে নামতে হবে। কখনো আসিনি এদিকে। পথঘাট জানা নেই।

রিণ যেন খুশিতে ফাটিয়া পড়ে। বলে, ভালই হল। আপনি নামবার সময় আমাদের সাহায্য করবেন, আর উনি আপনাকে পথ-ঘাট বলে দেবেন।

ডাক্তারের এখানে নামার দরকার নাই, নামিবে শুধু মেয়েটির জন্য। তা নামুক। কিন্তু সে যে আমাকে সাহায্যের কথা বলিয়াছিল, তাহা ভুলিল কেমন করিয়া? মেয়েদের স্বভাবই হয়ত ওই।

রাশি রাশি জল ঠেলিয়া—উজান কাটাইয়া জাহাজ পাটগাতিতে ভিড়িল আরও মিনিট পনর পরে। ডাক্তার আগেই খালাসীদের দিয়া নিজের ও তরুণীদের মাল নামাইয়াছিল। আমি ছিলাম রেলিং-এর পাশে দাঁড়াইয়া। কোন প্রয়োজনই ছিল না কিন্তু লোকটা নামিবার সময় আমাকে বলিয়া গেল, সেলাম আলেকুম। তারপর রোগীকে পাঁজা কোলে করিয়া স্বচ্ছন্দে নামিয়া গেল। পিছনে চলিল তরুণী।

আমি নীরবে দাঁড়াইয়া আছি। জাহাজ হইতে লোক ওঠে নামে, খালাসীরা মাল নামায়, উঠায়। নিচেই নদী; নদীর বুকে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, পাতলা মেঘের টুকরা ভাসে।

আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িয়া যায়। বিকট শব্দ করিতে করিতে একটা যায়

এরোপ্লেন। মনে হয় আকাশচারী দৈত্যটা এখনই বুঝি নিজের নাড়ি ভুঁড়ি উগারিয়া ফেলিবে।

এ সবই আমার কাছে অর্থহীন, অবাস্তব। বাস্তব শুধু ওপারে মাঠের শেষের এক রাশ ধোঁয়া। ধোঁয়া পুচ্ছ পাকাইয়া পাকাইয়া উপরে ওঠে, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়।

চোখে পড়ে নৌকার একটা বহর। খানিকটা দূরে ছইওয়ালা কতগুলি নৌকা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। রঙ বেরঙের পাল, লাল নীল হলুদ। একখানা নৌকার বাহিরের দিকে একটি নারী বসিয়া; চেহারা রিণের মতন। ঠিক বোঝা যায় না বটে কিন্তু মনে হয় রিণই।

ডাক্তারও ঐ দলে আছে, হয়ত ঐ নৌকায়। হয়ত বা পাশের আর এক খানায়। লোকটা মানুষ না যেন শিকারী বাজ। ছোঁ করিয়া পাখীটাকে লইয়া গেল।

পিছন হইতে কে যেন আমার পিঠে হাত রাখিল। চাহিয়া দেখি আবুল কাশেম রহিমুদ্দীন! সে স্মিতহাস্যে কহিল, কি, রোদে দাঁড়িয়া আছেন যে?

কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করিলাম, আপনি,—আপনি এখানে?

ভুল শুনেছিলাম। আমার নামতে হবে দু' ষ্টেশন পরে। পাটগাতিতে টিকিট বদলে নিলুম। কি হয়রানি বলুন ত।

বলিলাম, সত্যিই হয়রানি।

পরক্ষণেই নদীর দিকে চাহিয়া দেখি নৌকার বহর বাঁকের শেষে বাঁ দিকে ঘুরিয়া গেল। রিণকে আর দেখলাম না।

আবুল কাশেম কহিল, দইয়ের ভাঁড় দুটো পড়ে আছে। আসুন, ওর সদ্ব্যবহার করা যাক।

ভাঁড় দুটিও যেন আমাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ওর একটা যে তরুণীর জন্য কিনিয়াছিলাম।

চিরন্তনী

গ্রীক ভাস্করের তৈরী মূর্তিরই মতন সুন্দর, সুঠাম গড়ন, চোখে মুখে সারা দেহে অপরূপ লাবণ্য। আবার কঠোরও ঐ পাষাণ মূর্তি'রই মতন, কঠোর, নিষ্প্রাণ, নীরস। পাথরের দেবতার সামনে হত্যা দিলে তারও হয়ত অনুকম্পা হত কিন্তু শ্রীর একটুও দয়া হল না।

এই মেয়েটির কাছে হেমেশ নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছে। শ্রী তাব সাধনা, তার স্বপ্ন কিন্তু সেই দুশ্চর তপস্যা সিদ্ধির পথে একটুও এগোয়নি। স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে। আর হেমেশ এই তরুণীর উদ্দেশ্যে কবিতার পর কবিতা লিখেছে, গান গেয়েছে, নিজের মনে রাঙিয়ে দেখেছে তাকে,সাজিয়েছে নানা বিচিত্র বর্ণে। কিন্তু তার মনে কোন রেখাপাতই করেনি।

একদিন কবিতা পড়তে পড়তে হেমেশ তার সুন্দব মুখখানি দুই হাতের মধ্যে তুলে ধরে তার চোখে চোখ তুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে শ্রী বলল, ছাড়ুন দেখি, এর চেয়ে বরং নিজের কাজ করে যান। এরই মধ্যে প্রফেসার হিসাবে নাম করেছেন আপনি একজন শক্তিমান কবি, এভাবে শক্তির অপচয় করছেন কেন? তাছাড়া আমি হিন্দু ঘরের বিধবা, এসব শোনাও আমার পক্ষে মহাপাপ।

হেমেশ বলল সংস্কার দেখেছি জগদ্দলের মত তোমার উপর চেপে বসেছে।

শ্রী তিক্তকণ্ঠে জবাব করল, ওই হল আপনাদের কাছ থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ।

ব্যথা আগেও সে দিয়েছে, তার মধ্যে হেমেশ মাধুর্যের সন্ধান পেত। মন কখনও বা রঙিন হয়ে উঠত। কিন্তু আজ শ্রী তাকে অপমান করল। তার মুখে পড়ল বেদনার ছাপ। তা লক্ষ্য করেও শ্রী বিন্দুমাত্র দুঃখিত হল না। সে নিষ্ঠুর হতেই চেয়েছিল, চেয়েছিল এ অধ্যায়ের উপর যবনিকা টেনে দিতে।

এরপর তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অর্থ নিজেকে অপমান করা। তা' পারে না হেমেশ। সে ঠিক করল শ্রীকে নিজের জীবন থেকে মুছে দেবে। ভুলে যাবে শ্রী নামে কেউ আছে কিংবা কোন দিন ছিল। কষ্ট হবে খুবই কিন্তু সে কখনও এ প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না।

শ্রী হেমেশদের প্রতিবেশী মতি সান্যালের মেয়ে। ষোল বছর বয়সে তার বিবাহ হয়, সে তখন ক্লাস নাইন-এ পড়ত। সুন্দরী ও সুলক্ষণা বলে পাত্রের মা তাকে ছেলের বৌ করে নেন। মতিবাবুর অবস্থা ভাল নয়, পণ দেওয়া এমন কি দু'ভরি সোনা দিয়ে মেয়েকে সাভরণা করে দেওয়ার মতনও সঙ্গতি তাঁর ছিল না। অথচ আপনা থেকে পাশ করা চাকুরে জামাই জুটল। তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মনে করলেন, এ হল মেয়ের গেল জন্মের পুন্যের ফল।

শ্রীর মা মহামায়া প্রতিবেশিনী দারোগা-গিন্নীর কাছে গল্প করলেন, পাপমুখে বলতে নেই মেয়েরা আমার ভাগ্যমন্ত। সুমারও কেমন আপনা থেকে বর জুটে গেল। জামাই হাজার টাকার চাকরে। আমরা কি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি যে, অমন জামাই পাব ?

বিয়ের এক মাসের মধ্যেই শ্রী বিধবা হল শাশুড়ী অলুক্ষণে বৌকে একরূপ দূর দূর করেই বিদায় করে দিলেন। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, আগুন, আগুন। রূপ নয়, আগুন এনেছিলুম ছেলের জন্য। ছেলে আমার পুড়ে গেল।

মতিবাবু এই মেয়েকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল শ্রীকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন। কিন্তু তার বৈধব্যের আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সংসার ভাসিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

দরিদ্রের সংসার ; শ্রীর দাদার আয়ে অতি কষ্টেসৃষ্টে চলে। ঝি-চাকর নেই। দাদার বিয়ে হয়েছে অল্পদিন—নতুন বৌ, তায় সন্তানসম্ভবা। শ্রী তাকে কাজ করতে দেয় না। নিজে এক হাতেই সব করে। বাসনমাজা,—আমিষ, নিরামিষ দুই হেঁসেলের রান্না, কাপড় কাচা – এসব ত আছেই। তার উপর কখনো কখনো ছোট ছোট ভাই-বোনদের পড়ায়। এ সব ভার নিজে থেকেই সে নিয়েছে। বিশ্রাম নেই। ক্লান্তিবোধও যেন এই তরুণী স্বামীহীনার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

মেয়ে বিধবা হওয়ার কিছু পরে মহামায়া স্বামী হারালেন। সেই থেকেই তিনি পুজা, আহ্নিক নিয়ে আছেন। হবিষ্যি করেন বেলা চারটার পর। শ্রী তাঁর সঙ্গে খায়।

তিনি অনেকবার বলেছেন, কচি বয়সে এত অবেলায় খাওয়া সহ্য হবে কেন ? তুই আগে খেয়ে নিস্।

শ্রী বলে, আমার খিদে পায় না। একদিন বলল, বিধবার কি কোন বয়স আছে ? আমি তুমি প্রদ্যোত কাকার পিসিমা সব আমরা এক বয়সী।

মহামায়ার চোখ বাষ্পার্দ্র হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবেন, যে সমাজের বিধানে

তাঁর কাঁচ মেয়ে মনু ঠাকুরপোর ছিয়ানব্বই বছরের পিসির একবয়সী হয়ে গেছে, সে কি মানুষের সমাজ, না আর কিছু ?

মায়ের সংসারের কাজ ছাড়া শ্রীর আর একটি কাজও আছে। সে বিধবা হওয়ার পর তার মাতামহ একটি কষ্টি-পাথরের গোপাল বিগ্রহ তার হাতে দিয়ে বলেন, এখন থেকে এর ধ্যান ক'র দিদা। ইনিই তোমার স্বামী-গুরু সব।

সেই থেকে সে দাদুর আদেশ পালন করেই এসেছে। রোজ বিগ্রহকে স্নান করায়, তাঁর ভোগ দেয়, সন্ধ্যারতি করে। কখনও বা একা একা গল্প করে গোপালের সঙ্গে। এক একবার মনে পড়ে যায় স্বামীর কথা।

তাকে দেখেছে শুধু বিবাহে ও ফুলশয্যার রাত্রে। চার ধার থেকে ঠানদি, বৌদিরা, সখীরা আড়ি পেতেছিলেন বলে ভাল করে চোখ মেলেনি। লজ্জায় আধবোজা চোখে দেখেছে। যুবক স্বামীর মূর্তি আজ মনে পড়ে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক কিশোরের ছবি। চৌদ্দ বছরের ছেলে মৃত পিতার পা ছুঁয়ে বসে আছে। ঠোঁট দু'খানির মাঝখানে একটু ফাঁক, ভারী করুণ চাহনি।

শ্বশুরের মৃত্যুর পরে রাত্রে শ্মশানে তোলা স্বামীর এই ফটোখানি শ্রী শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। এই কিশোরকে স্বামী বলে সে ভাবতে পারে না, ছবিখানা দেখলে কেমন যেন স্নেহ জাগে, ছোট ভাই দুলালের প্রতি স্নেহের মতন সে অনুভূতি নিবিড় অথচ অনুত্তাপ।

তরুণী বিধবার দিন চলেছে এইভাবে, উদ্দেশ্যহীন জীবন যেন হালহীন একখানা নৌকা। ভেসে চলেছে ত চলেছেই। এত কাজ করে তবু যেন সে সংসার ও সমাজের একটা অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ। স্বজনের দায় স্বরূপ। সঙ্গে অমঙ্গল নিয়ে ফেরে।

সেকেলে পরিবার, বাইরের লোকের যাতায়াত কম। আত্মীয়-স্বজন দু'-একজন যা আসে তারাই শ্রীকে প্রেম নিবেদন করে।

কেউ আকারে ইঙ্গিতে, চোখের চাহনি দিয়ে—কেউ বা স্পষ্টই ভালবাসা জানায়। তরুণেরা ত দূরের কথা, পক্ককেশ বৃদ্ধেরাও যৌবনের প্রাপ্য থেকে সুন্দরী এই তরুণীকে যেন রেহাই দিতে চায় না।

এর মধ্যে হেমেশের প্রেমই ছিল গভীর, শান্ত। নিজের অজ্ঞাতে শ্রী তাকে সৃষ্টির প্রেরণা জোগাত। তার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলত, সেই ঝঙ্কার রূপ পেত – তার কবিতার মধ্যে।

অনেকদিন পরে শ্রীর দিদি সুমা আমেদাবাদ থেকে মায়ের কাছে এসেছে।

শ্রীর বিয়ের সময় আসতে পারে নি, বিয়ের পরও এল এই প্রথম। পথ অনেকটা, তায় স্বামী প্রশান্ত একটি মিলের সর্বময় কর্তা, ছুটি তার কম। সুমারও ঘন ঘন সন্তান হয়। তার পক্ষে আসার বিঘ্ন অনেক।

স্বামী মোটা রোজগেরে, তার নিজেরও হাত দরাজ। সে এসে সকলকে কাপড়-জামা দিয়েছে, বৌদিকে দিয়েছে বেনারসী শাড়ী, ভাইবোনদের প্রায়ই থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখায়, সার্কাসে নিয়ে যায়। ঘন ঘন ভোজ দেয়।

তার ছেলেমেয়েরা সুদূর প্রবাসে থাকে, বাংলা থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে না। সন্দেশ রসগোল্লার স্বাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই বললেই চলে। মামাবাড়িতে এসে মামা-মামী-মাসীর সঙ্গে মিলে বাংলার খাবার খেয়ে বাংলা বই দেখে বাড়িটাকে তারা উৎসবমুখর করে তুলল। অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যও এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভুলে গেল যে তারা দরিদ্র।

শ্রী এ দলে ছিলনা, ভাল খাবারও খেতে চাইত না সে। কিছু পেলেই গোপালের ভোগ দিত। সুমা সিনেমার যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে বলত এক রাশ এঁটো বাসন পড়ে রয়েছে দিদি, উনোনটা ভেঙ্গে গেছে, মাটি দিতে হবে, সুভাষের জাম্পারটা আর ফেলে রাখা চলে না। শীত এসে পড়ল বলে। সুভাষ এদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই। সুমা তার জাম্পারের উল কিনে দিয়েছে।

সে জানে শ্রীর এসব এড়াবার ছুতা। আনন্দ মাটি করবেনা সে।

এই জন্য মহামায়াও থিয়েটার-বায়স্কোপে যেতে চান না। সুমার আনন্দের ফাঁক থেকে যায় অনেকখানি, দু'দিন সে প্রোগ্রাম নাকচও করে দিয়েছে। তার ছেলে-মেয়েরা, ভাই-বোনেরা এইজন্য রাগ করেছে শ্রীর উপর।

সুমা একদিন মাকে বলল, খুকুর সাধ-আহ্লাদ করা দরকার, নইলে পাগল হয়ে যাবে যে।

কথাটা শ্রীর কানেও গেল। সে বলল, পাগল হতেও বরাত চাই দিদি। আমি সে বরাত করেও আসিনি।

কয়েকদিন পরে সুমা বলল, ধর্মমূলক বই দিয়েছে — ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। চল, দেখে আসি গিয়ে।

চৈতন্যদেব—তার গোপাল এই রূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়ে দেশকে হরিনামে মজিয়েছিলেন। তিনি গোপাল, তিনিই শ্রীহরি। এইসব ভেবে শ্রী বলল, আচ্ছা যাব আমি!

আনন্দের সাড়া পড়ে গেল বাড়িতে। ছেলেরা কলরব করে উঠল। সুভাষ হাততালি দিয়ে বলল, মেজদি বড় ভাল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে-গুণে-কুলে-শীলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায় দেশ-বরেণ্য পুরুষ। মানুষ না যেন মূর্ত প্রেম। জগাই-মাধাইকে বুকে টেনে নিলেন, রূপ-সনাতনকে ভাসিয়ে দিলেন প্রেম-বন্যায়।

একদিকে এই মহান প্রেম আর একদিকে প্রস্তরের কাঠিন্য। জননীকে জায়াকে চোখের জলে ভাসিয়ে সংসারত্যাগী হলেন। কোমল কঠোরের এই মিলন লোকোত্তর পুরুষেই হয়ত সম্ভব।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার এই বঞ্চনা শ্রীর বুকে বড় বাজল। নিজে চিরবঞ্চিতা, তাই কোন নারীকে বঞ্চিত হতে দেখলেই সে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ত। রাগ করত বঞ্চনাকারীর উপর। আজ ছবি দেখে চৈতন্যদেবকেও সে যেন ক্ষমা করতে পারল না।

প্রায় তিন ঘন্টা পর্দার উপরে দ্রুত অপসৃয়মাণ ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে শ্রীর অনভ্যস্ত চোখ দুটো কড় কড় করছিল। হাওয়াটা মনে হচ্ছিল বড় বেশী ভারী। ছবি দেখে বাইরে খোলা বাতাসে এসে বেশ একটু আরাম বোধ হল।

সামনের রাস্তায় অসম্ভব ভিড়। দুটি ট্রাফিক পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। মানুষের কলরবের সঙ্গে মিশেছে মোটরগাড়ীর হর্ণের প্যাঁক-প্যাঁক, রিক্সার ঠুন্-ঠুন্, ট্রামের ঠন্-ঠন। বিভিন্নমুখী বাসের কণ্ডাক্টররা চেঁচাচ্ছে—পাইকপাড়া, কালীঘাট, বালিগঞ্জ। এর মধ্যেই মানুষ ধাক্কাধাক্কি করছে, কনুইর সাহায্যে যে যার পথ করে নিচ্ছে। আধ মিনিটের দেরী সইছে না কারও।

সুমারা হেঁটে চলেছে। একটু গিয়ে—রায়ের দোকান থেকে নানারকমের কেক কিনে পাঁচ রাস্তার মোড়ে গিয়ে তারা ট্যাক্সি নেবে। ভিড় কমে গেলে বাসেও যেতে পারে।

কার্তিকের অপরাহ্ন। ম্যাটিনী শো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছিল। প্রকৃতিতে নেমেছে শ্রান্তির আমেজ। চলেছে ছায়াছবির কথা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা তাদের অভিনয়-কৌশল, পরিচালনায় প্রয়োগ-নৈপুণ্য। সুমারা সবাই সোৎসাহে আলোচনা করছে, মন্তব্য করছে। মহামায়াও যোগ দিয়েছেন। ছোট্ট সুভাষও গুন গুন করে গাইছে, হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু—।

সবাই একসঙ্গে ছবি দেখেছে, বিশেষ করে শ্রী সঙ্গে আছে—তাই এত আনন্দ।

কিন্তু সে এ আলোচনায় নেই। সে দু'তিন কদম আগে আগে চলেছে, কী যেন ভাবছে। হয়ত বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা।

সামনেই জনবহুল পাঁচ-রাস্তার মোড়। গাড়ী মোটর যথেষ্ট, কিন্তু ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি নেই। শ্রী অন্যমনস্কভাবে চওড়া রাস্তাটা পার হচ্ছিল।

ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁ-া-া-চ লৌহে লৌহে ঘর্ষণের বিরাট আওয়াজ। সঙ্গে হো-ও-ও-গেল-গেল — এইরে — মানব কণ্ঠের অস্পষ্ট কলরব।

শ্রী শূন্যে উঠে গেল, তার মনে হল শক্ত বাহুপাশে বেঁধে কে যেন তাকে নিয়ে ছুটে চলেছে। উড়ে যাচ্ছে। হাত দুটো যেন ইস্পাতের তৈরি। একি দৈত্য, না যন্ত্র, না মানুষ?

খেলার পুতুলকে ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন দরদ দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে বসিয়ে দেয়, মানুষটি তাকেও সেইরূপ আলতোভাবে ফুট-পাথের উপর রেখে গেল।

শ্রী যেন স্বপ্ন দেখছে, পুরুষ মানুষের স্পর্শের আমেজ, বাতাসে তার দেহের গন্ধ, কানে আসছে নানা আওয়াজ। কেমন যেন বিহ্বল ভাব।

আর ঠিক এই সময় অচেনা মানুষটি তার চোখের উপর দিয়ে অদূরে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। শ্রী পিছন থেকে দেখল—লম্বা-চওড়া, জোয়ান পুরুষ, পরনে ঘি রঙা পাঞ্জাবি, গায়ের রংটা মনে হল ধবধবে ফরসা।

পথচারীরা তখনও টিপ্পনী কাটছে, আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি, পথ চলতে জানে না ত বেরোয় কেন, ভাগ্যিস্ ড্রাইভার পাকা লোক — তাই বেঁচে গেছে।

রক্ষা করেছে ঐ ছেলেটি, বাহাদুর বটে।

সুমা এসে পরম স্নেহভরে তার হাত ধরে ডাকল, খুকু।

মেজভাই দুলাল বলল, আর একটু হলে কি হ'ত বল্ দেখি মেজদি। ডবল-ডেকার দত্যিটার তলে পিষে যেতিস্ যে, কি ভাবছিলি তুই?

সুমা ধমক দিল, তোর আর সদারি করতে হবে না। আর মহামায়া শ্রীর দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন, মনে মনে বলছিলেন, হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু।

শ্রী ততক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল, একটা ঝড় বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে, তাকে রক্ষা করেছে অচেনা ঐ মানুষটি। আর অদূরে দাঁড়িয়ে আছে দোতলা বাসটা, বাস না যেন বাঘমুখো কালো বিরাট যমদূত। ভয়ে সে চোখ বুজল, নিমীলিত চোখের পাতার উপর দেখল, ঘি-

রঙা পাঞ্জাবিপরা গৌরাঙ্গ সেই যুবাকে। সমগ্র সত্তা দিয়ে যেন তার দৃঢ় স্পর্শ অনুভব করছিল।

সুমা বলল, তোর পা ছড়ে গেছে, ব্লাউজেরও খানিকটা ছিঁড়েছে দেখছি।

শ্রীর জীবনদাতা হ্যাঁচকা টান দিয়ে যখন তাকে রাস্তার উপর থেকে তুলে নেয়, তার বাম স্তনের কাছে ব্লাউজটা তখন ছিঁড়ে গেছে। সেটা লক্ষ্য করে শ্রী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তাড়াতাড়ি স্কাফ'টা টেনে দিল বুকের উপর।

বাড়ি ফিবেও কিছুক্ষণ চলল ঐ আলোচনা আর একটু হলে কী দুর্দৈবই না ঘটত।

মহামায়া বললেন, পথ চলার অভ্যেস নেইত। ঐ রকম হয়ে অবধি রাস্তায় যায় না, রাস্তা দিয়ে মিছিল গেলেও চোখ তুলে তাকায় না। দুলাল বলল, হবেই বা কোত্থেকে? ওর গরুতে যা ভয়।

মহামায়া বললেন, ভাগ্যিস ভগবান ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলেন। এ সব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যেরই লীলা। আর ধন্যি বলতে হবে ছেলেটিকে, নিজের জীবনের পরোয়া না করে ছুটে এলো ত।

দুলাল বলল, যেমন ভদ্র তেমনি লাজুক। মেজদির দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। কাকে বাঁচালাম তা একবার দেখতেও তার ইচ্ছে হল না। আশ্চর্য।

অপরিচিত এই তরুণকে নিয়ে পরিবারের সবাই আলোচনা করছে। তাদের পরম আত্মীয় সে, খুকুর জীবনদাতা। মানুষটির তারা পরিচয় জানল না, ভাল করে তাকে দেখলও না। এই তাদের আক্ষেপ।

সুভাষ বলল, ঠিকানা জানলে বড়দি তাকে লুচি-মাংস করে খাওয়াত। আমরাও খেতুম।

অপরিচিত মানুষটিকে নিয়ে সবাই আলোচনা করছে, কিন্তু শ্রী যোগ দেয়নি। তার দেহ মন দুইই অবসন্ন, পায়ের ছড়ে যাওয়া জায়গাটা একটু একটু জ্বালা করছে। কোন কথা বলতে কি শুনতে ভাল লাগে না। একবার শুধু তার মনে হয়েছিল, ছিঃ ভদ্রলোক কি ভাবলেন? হয়ত মনে করলেন মেয়েটা পথ চলতেও জানে না। কী আনাড়ি!

একবার মনে প্রশ্ন জাগল, বয়স কত হবে? আটাশ-তিরিশ? রং ত সুন্দর। মুখখানা কেমন? মুখচোখ—লোকটার কি বিয়ে হয়েছে?

পরক্ষণেই এসব ঝেড়ে ফেলে দিল তার মন থেকে। রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে, একরাশ বাসন। দিদির ছোট মেয়ে তনুকে খাওয়াতে হবে। ক'দিনেই কচি মেয়েটা তার বড় নেওটো হয়ে পড়েছে।

সারা রাতটা শ্রী প্রায় জেগেই রইল। ঘুম আর আসে না। চোখ বুজলেই চোখের পাতার নীচে দেখতে পায়, শচীমাতার শোক, বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না। রাস্তার সেই দৃশ্য। কানে আসে—হো-ও-ও-গেল—গেল।

শেষরাত্রে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে দেখল একটা উ'চু জায়গা থেকে পড়ে যাচ্ছে সে, পড়ছে ত পড়ছেই। বিরামহীন, বিশ্রামহীন পতন, উন্মাদ একটা তারা যেন নিচের দিকে ছুটছে। চারধারের অন্ধকারে শিহরণ জাগছে, পতনের শব্দ হচ্ছে—শ্... শ্... শ্।

হঠাৎ একটা মানুষ তা'কে লুফে নিল, রক্ষা করল পতন থেকে। তার গায়ে ঘি-রঙা পাঞ্জাবি। তাকে নিয়ে সে একটা বলের মতন লুফতে লাগল। একবার উপরে ছুঁড়ছে, আবার ধরে ফেলে। তার কুশলী হাত শ্রীকে মাটিতে পড়তে দেয় না। কিন্তু ভারী শক্ত সে হাত, লোহার মতন রুক্ষ কর্কশ। মানুষটা বোধ করি শ্রমিক, কারখানায় হাতুড়ি পেটে, হাতুড়ির ঘায়ে লোহার কড়ি টুকরো টুকরো করে দেয়।

শক্ত বটে, কিন্তু দরদী সে স্পর্শ।

মানুষটি চেনা, কোথায় যে দেখেছে শ্রী ঠিক মনে করতে পারে না। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে থাকে, ডুবে যায় স্মৃতির অতল তলে। কিন্তু—খালি পাঁক সেখানে, হিমশীতল পাঁক।

হ্যাঁ, ঠিক এই মানুষটি—হ্যাঁচকা টানে তার ব্লাউজ ছি'ড়ে দিয়েছে। কী লজ্জা।

তার মুখ দেখেনি তখন। মুখ দেখার আগ্রহে শ্রী কাঁধ ধরে তাকে ফেরাতে চেষ্টা করে, কিন্তু অমন জোয়ান পুরুষকে ফেরাতে পারবে কেন সে ?

বাইরে কি একটা শব্দে তার স্বপ্ন টুটল। স্বপ্নের রেশ রয়ে গেল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। এবার উঠতে হবে তাকে, উনুন ধরাতে হবে। দাদা আপিস বেরোবে ন'টায়, তার আগে রান্না করে খাইয়ে দিতে হবে তাকে।

ধীরে ধীরে শ্রীর একটা পরিবর্তন আসতে লাগল। কথা কয় আরও কম, কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব। কি যেন ভাবে। ভিতরে একটা অভাববোধ তাকে পীড়া দেয়। সে অভাব যে কেন, কিসের অভাব তা' সে নিজেও জানে না। মধ্যে মধ্যে শুধু মনে পড়ে ঘি-রঙা পাঞ্জাবি, তার স্পর্শে যে এতটা আমেজ আছে সে তা জানত না। স্পর্শ ত অনেকই সে পেয়েছে, মায়ের ভাইয়ের বোনের। কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র জিনিস।

হেমেশ তার হাতে হাত রেখেও কথা বলেছে দু'একবার—তার স্পর্শ সে

পেয়েছে কিন্তু তাতেও কোন উন্মাদনা ছিল না। কিন্তু একী! আজ কেন এরকম হল?

ভাবতে ভাবতে এক এক সময় নিজের কাছেই লজ্জা বোধ হয় কিন্তু পর ক্ষণেই ঐ ভাবনা এসে আবার মাথার মধ্যে চেপে বসে।

সুমা এর পরও কয়েকবার সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়ার জন্য বলেছে, কিন্তু শ্রী যায়নি। সে ভাবে কি লাভ গিয়ে? ছবি দেখে পরের দুঃখে মনকে মিছিমিছি ভারাক্রান্ত করে তোলা, চোখকে পীড়িত করা।

তার শরীর খারাপ হয়ে গেল। দিনের পর দিন কৃশ পাণ্ডুর। সুমা ডাক্তার ডাকল. তিনি বললেন, 'নার্ভাসশক্'।

কবিরাজ চোখ বুজে নাড়া পরীক্ষা করেও অনুরূপ রায দিলেন।

ওষুধ আসে, শ্রী ওষুধের শিশি হাতে করে আপন মনে হাসে। কান্নার চেয়েও করুণ সে হাসি। মনে পড়ে সেই অপরাহ্নের ম্লান আলো, সেই স্পর্শ। মনে পড়ে হেমেশকে। তাকে ব্যথা দিয়েছে বলে মন অনুশোচনায় ভরে যায়। ভারী দুঃখ পায় সে।

বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মতন বিশাল অগ্নিগর্ভ, জ্বালাময়।

এক-একবার মনে প্রশ্ন জাগে, হেমেশ এলে আজও কি তাকে ফিরিয়ে দেবে। পারবে দিতে।

একখানি পোষ্টকার্ড

বেশ কাটছিল দিনগুলি।

রূপ, ধন-সম্পত্তি, খ্যাতি মর্যাদা, মানুষ যা চায় সবই পেয়েছিলেন হরিসাধন। ভাল মানুষ বলে সুনাম হয়েছে সমাজে। আর এই সুনামই তিনি সবচেয়ে বেশী কামনা করতেন। প্রভাতে আরম্ভ করেন স্ক্র্যাচ থেকে অর্থাৎ শূন্য থেকে। কর্মজীবন সুরু হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই চাকা ঘুরে যায়। বাড়ী, গাড়ী, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স হয়েছে সবই।

আজ তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন তবুও রেহাই নেই। প্রায়ই জুনিয়র উকিল, ব্যারিষ্টাররা আসেন কনসালটেশনের জন্য। গল্পচ্ছলে পরামর্শ দিয়ে মোটা টাকা গুণে নেন তিনি।

ছেলে দুটিও বেশ কৃতী হয়েছে। বড় ছেলে সুধাংশু বিলাত ফেরৎ ডাক্তার, জম-জমাট প্রাকটিশ। ছোট ছেলে বর্ধমানের এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট।

জীবন সায়াহ্নে মানুষ চায় শান্তি। ভগবানের নাম কীর্তনের মধ্যে তিনি সেই শান্তি খোঁজেন। শনি, রবিবার, সপ্তাহে দুদিন তাঁর বাড়ীতে কীর্তন হয়। হরিসাধন কীর্তন রসে ডুবে থাকেন। খোল বাজাতে বাজাতে ভাবে বিভোর হয়ে যান।

তিনি ভেবেছিলেন জীবনের এই ধারায় কোন ছেদ পড়বে না, চিড়ও ধরবে না। এইভাবেই একদিন আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে শেষ দিনের পাড়ি জমাবেন। লোকে বলবে, হ্যাঁ, মানুষ বটে, যেমন ক্ষমতাবান তেমনি সজ্জন।

কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল ছোট্ট একখানি পোষ্ট কার্ডের জন্য।

সেদিন ছিল শনিবার। হরিসাধন বৈকাল পাঁচটায় নিজের খাটে শুয়ে সংবাদপত্রে চোখ বুলোচ্ছেন, এমন সময় নাতি গৌতম তার হাতে একখানা পোষ্ট কার্ড এনে দিয়ে বলে, দাদু এই নাও তোমার চিঠি।

চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে নিতেই তাঁর মাথা ঘুরে গেল। চোখের উপর অস্পষ্ট হয়ে গেল রেখাগুলো কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। কেউ দেখলে মনে করত, কোন গুরুতর দুঃসংবাদ পেয়েছেন।

হরিসাধন গৌতমের কব্জির উপরটা ধরে জিজ্ঞাসা করেন, তোমায় এই চিঠি দিয়েছে কে ?

পাঁচ বছরের গৌতম ভীত কণ্ঠে উত্তর করে, পিয়ন দাদু।

আর কেউ দেখেছে ?

গৌতম মাথা নাড়িয়া জানায়, না, দেখেনি কেউ।

পিতামহ তার হাত ছেড়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। তার মনে হয় কি কঠোর পরীক্ষায়ই না পড়েছিল সে।

হরিসাধন চিঠিখানা আবার পড়েন। মেয়েলী হাতের লেখা। তার মনে হয় পরিচিত হস্তাক্ষর। কিন্তু হস্তাক্ষর যে কার—ঠিক করে উঠতে পারেন না। আবার পড়েন। পত্র প্রেরক লিখেছে–

বড় হয়েছ তুমি, সজ্জন বলে খ্যাতিও লাভ করেছ। সপ্তাহে দুদিন নাকি বাড়িতে কীর্তন কর। কিন্তু আমাদের কথা কি একবারও ভাবো, যে সব নর নারীদের বিশেষ করে যে সব নারীদের পথে বসিয়েছ তুমি ? মনে পড়ে—তোমার এই খ্যাতি ও অর্থাগমের পিছনের ইতিহাস ? মনে পড়ে স্ত্রীকে, লক্ষ্মী স্বরূপিণী যে মহিলা তিলে-তিলে ক্ষয় পেয়েছেন তোমার জন্য ? চলে গেছেন তিনি বহু তপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হয়ত ক্ষমাও করে গেছেন তোমায়।

কিন্তু যে সব ভ্রূণ হত্যা করেছ তুমি, তারা কি ক্ষমা করেছে তোমায় ? তাদের হতভাগিনী জননীরা কি ক্ষমা করেছেন ?

না, করেননি, যেমন করিনি আমি।

মনে করে দেখ, আমায় চিনতে পার কিনা। ইতি—

হরিসাধনের চোখের উপর ভেসে উঠল নর-নারীর মিছিল। এক, দুই, তিন যেন সংখ্যাতীত তারা। এল সরযূ, এল সাগরিকা, মাণিকমালা আরও অনেকে। এ মিছিল আর শেষ হয় না।

নারীর মধ্যে এসে ভীড় জমায় বহু পুরুষ রুক্ষ কঠোর, কর্কশ মূর্তি, সকলেই অভিশাপ দেয় তাঁকে।

এদের মধ্যে কে লিখল এই চিঠি কোন্ নারী ?

যেই লিখুক, নিষ্ঠুর আঘাত করেছে সে। বিদ্ধ করেছে যেন বিষ শায়ক দিয়ে।

একখানা খামও জোটেনি ? না, পোস্টকার্ডে লিখেছে পাঁচজনের কাছে তাঁকে হেয় করার জন্য ?

হরিসাধনের অপরাধগুলো পর পর বিচ্ছিন্ন। অপরাধ তিনি করেছেন সঙ্গোপনে। একজনের খবর অপরে জানে না। সমাজে তাই নিন্দা হয়নি। তাঁর ধারণা ছিল হতভাগ্য এই শিকারগুলিও নিজ নিজ ঘটনা ছাড়া অন্য ঘটনার খবর রাখে না। কিন্তু এই লেখিকা ত জানে অনেক কিছু। এত সব সে জানল কি করে?

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘরখানাকে ছেয়ে ফেলল। তাঁর মনেও নামল সেই অন্ধকার। তিনি সর্বাঙ্গে সেই গাঢ় অন্ধকার জড়িয়ে বসে রইলেন। কাউকে আলো জ্বালাতে ডাকলেন না, নিজেও জ্বাললেন না। অতীত তমিস্রার মধ্যে স্মৃতির টর্চ ফেলে লেখিকাকে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধরা পড়ল না তার মুখ।

ঘরখানা নিস্তব্ধ, সেন্ট টমাসের ক্লকটার টিক-টিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না। এই শব্দ অন্ধকারের নিস্তব্ধতাকে যেন গাম্ভীর্যে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

খোলা জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলো এসে পড়েছে দেওয়ালের উপর। আলোর উপর সমান্তরালে ছটা গরাদের কালো রেখা। তার মধ্যে দুটো রেখার মাঝখানে অস্পষ্ট একটি নারী মূর্তি।

হরিসাধন চেয়ে আছেন সেই দিকে। ভাবছেন কে-এ সরযূ, সাগরিকা? না—

জীবনে যে সব নারী এসেছে তাদের কারও সঙ্গে এই মূর্তির কোন সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন না। অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলেন।

এই সময় চাকর পিটার পল বিশ্বাস ঘরে এসে আলো জেলে দেখল কর্তা ঘূর্ণায়মান পাখার নীচে বসে আছেন। খাটের পাশে পাখার নীচে বসে আছেন। টিপয়ের উপর ছানা, ছানার জল, আপেলের টুকরো ও সন্দেশ পড়ে আছে। বেলা পাঁচটারও আগে সে এগুলো রেখে যায়। কর্তা তা স্পর্শ করেন নি। ছানার উপর মাছি বসেছে।

তিনি বসে আছেন পাষাণ মূর্তির মত। এমনটি কখনও হয় না। পিটার হরিসাধনের নিজের চাকর, বিপত্নীক প্রভুর দেখা-শুনার ভার তার উপর।

সে একটু আবদারের স্বরে বলল, ছানাটাও খাননি যে বাবু, শরীর খারাপ?

হরিসাধন অর্ধস্পষ্ট গম্ভীর একটা আওয়াজ করলেন।

কি যে বললেন, বোঝা গেল না।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পিটার আবার বলল, একটু পরে ওঁরা কীর্তন

করতে আসবেন। জজ সাহেব, ব্যারিস্টার সাহেব—

ধমক দিয়ে উঠলেন হরিসাধন, যাও, যাও।

অন্য কেউ হলে ক্ষুব্ধ হত, ভাবত ব্যাপার কি! কিন্তু পিটারের প্রকৃতি অন্যরূপ। তার উপর সে গোঁড়া খৃষ্টান। প্রভুর কীর্তনে অরুচি দেখে সে খুশীই হল। জিজ্ঞাসা করল, বাবুরা এলে কি বলব?

কীর্তন হবে না। সংক্ষিপ্ত উত্তর, কিন্তু কণ্ঠস্বর রুক্ষ কর্কশ।

আচ্ছা বলে পিটার বেরিয়ে গেল।

হরিসাধনের বন্ধু-বান্ধবরা খানিকক্ষণ পরে কীর্তন করতে এলে পিটার একে একে তাঁদের সবাইকে বিদায় করে দিল। প্রায় প্রত্যেককেই বেশ একটু উল্লাসের সঙ্গে বলল, বাবু আর কীর্তন করবেন না।

পিটার চলে গেলে চিঠির ছত্রগুলি আবার হরিসাধনের চোখের উপর স্পষ্ট হয়ে উঠল। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে দেওয়ালের গায়ে আলোর যে ফালি এসে পড়েছে তার উপর চিঠির রেখাগুলো জ্বলছে। রেখা নয় যেন জ্বলন্ত অভিশাপ। সেগুলি ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করল—সরযূর, সাগরিকার, মাণিকমালার হরনাথের, সন্তোষ সরকারের।

প্রথম এল সরযূ। তার বাবা দেবেন বসু ছিলেন কলকাতার কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। কলকাতায় সিনেমা ব্যবসায়ের অন্যতম প্রবর্তক।

সরযূ হরিসাধনের সঙ্গে কলেজে পড়ত। সে তাকে ভালবাসত। দেবেন মেয়ের এই দুর্বলতা লক্ষ্য করেন। মেয়েব প্রতি তার স্নেহ ছিল অপরিসীম। হরিসাধনকেও পছন্দ করতেন। সে পাশ করে হাইকোর্ট বারে যোগ দিলে দেবেনবাবু তাকে একখানা শেভ্রলে গাড়ী কিনে দেন। কলকাতায় জমি কেনেন তার ও সরযূর নামে। তাদের বিবাহ সম্বন্ধ তখন পাকা হয়ে গেছে।

কিছুদিনের মধ্যেই সরযূ লক্ষ্য করল তার প্রেমাস্পদ আর একটি মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, মাতামাতি করছে তাকে নিয়ে। সে সহ্য করতে পারে না। ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। শুধু বাবার কাছে হরিসাধনের সঙ্গে তার বিবাহের অস্বীকৃতি জানায়। জোরালো অস্বীকৃতি। কিন্তু তিনিও কারণ জানতে পারেন নি।

সেই বিয়ে আর হয় নি সরযূ চিরকুমারীই রয়ে গেছে। কিন্তু দেবেনবাবু হরিসাধনকে প্রদত্ত জমি আর ফিরিয়ে নিলেন না, কোন উচ্চ-বাচ্যও করলেন না।

এইভাবে হরিসাধনের প্রথম প্রেমের উপর যবনিকা পড়ে। তবে এই ধনীর দুলালীর প্রেমেই তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

এরপর এসেছে সাগরিকা, মাণিকমালা। তাঁর রূপ বহ্নিতে ঝাঁপ দিল তারা, আর সে তাদের পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিল।

সাগরিকা দূর সম্পর্কে তাঁর বৌদি, বয়সে তাঁর চেয়ে বড়। এই বিধবার বেশ কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল, বৈষয়িক ব্যাপার নিয়েই প্রথম তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, সাগরিকা রূপবান এই দেবরকে ভালবেসে ফেলে। একেবারে ডুবে যায়। অল্পদিনের মধ্যে হরিসাধনই কার্যতঃ তার সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেন।

সন্তান সম্ভাবিতা হলে সাগরিকা তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে।

হরিসাধন বলেন, তুমি ত জান আমি বিবাহিত।

তাত জানি, কিন্তু আমার উপায় - একটু ভেবে সাগরিকা আবার বলে দুটো বিয়েও ত অনেকে করে।

সে আমি পারব না।

দুইজনে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত হরিসাধন বলেন, একে ওল্ড ফসিল, তায় পরের উচ্ছিষ্ট। তাকে বিয়ে!

এরপর হরিসাধনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই ছিল সাগরিকার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে তখন এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে তা আর সম্ভব হল না।

কিছুদিন পরে সাগরিকার একটি ছেলে হয়। সেই হরিসাধনের প্রথম পুত্র। হরিসাধন নবজাতককে ফুটন্ত গরম জলে ফেলে হত্যা করেন। এই দৃশ্য দেখে পাগল হয়ে যায় সাগরিকা। তারপর কোথায় যে সে চলে গেছে তা কেউ জানে না।

এত বড় একটা ঘটনা হরিসাধনকে বিচলিত করতে পারেনি, শয়তানের মত ছিল তাঁর মনের দৃঢ়তা। কিন্তু আজ ছোট্ট একখানা পোষ্টকার্ড সেই দৃঢ়তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। তার মনে পড়ল গরম জলের টবে নিজের শিশু সন্তানের ছট-ফটানি, আর্তনাদ, চীৎকার করে উঠলেন হরিসাধন।

কিন্তু রেহাই নেই। পাশেই দাঁড়িয়ে মাণিকমালা। সে অট্টহাস্য করছে। ভিখারিণী মাণিকমালা—কিন্তু তার গলা এত চড়ল কি করে?

মাণিক পতিতার মেয়ে, পতিতা পল্লীতেই তার জন্ম। মার কাছ থেকে একখানা বাড়ী পেয়েছিল সে। তার চেহারায় হাব-ভাবে, ব্যবহারে ভদ্রজনোচিত সুরুচি ও শালীনতা ছিল। সে চমৎকার গান গাইত, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

হরিসাধন একদিন বন্ধুদের সঙ্গে তার গান শুনতে যান। মাণিকমালা তাকে দেখেই ভুলে গেল, দু'দিন তার কাছে না গেলে সে গাড়ী করে হরিসাধনের বাড়ী উপস্থিত হত। আসত মক্কেল সেজে তার বিরহে কান্না-কাটি করত।

হরিসাধন বেশ কিছুদিন খেলিয়ে নিল তাকেও, শিকারী যেমন বঁড়শি দিয়ে মাছকে খেলায়। হতভাগিনী শেষটায় একদিন দেখল উকিলবাবু বাড়ীখানা নীলামে তুলে তাকে একেবারে পথে বসিয়েছেন। গৃহহারা, আশ্রয়হারা হ'য়ে আজ সে কোথায় আছে কেউ তা ঠিক জানে না। কেউ বলে কালীঘাটে ভিক্ষা করতে দেখেছে। কারও কারও মতে জগন্নাথঘাটের এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর চেহারা অনেকটা মাণিকমালার মতন।

হরিসাধন এইরূপ সর্বনাশ করেছেন আরও অনেকের। একদিকে নারী নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যেমন তাঁর বাঁধেনি আর একদিকে ধনীদের বেপরোয়াভাবে ঠকিয়েছেন। বিত্তশালীদের মধ্যে হরনাথ ও সন্তোষ সরকার তাঁর শ্রেষ্ঠ শিকার।

হরনাথ কাপ্তেনি করতে গিয়ে এক এক রাত্রের মাইফেলের জন্য হাজার টাকা নিয়ে পাঁচ হাজার টাকার হ্যান্ডনোট লিখে দিয়েছে, অথচ এই টাকা বেশীর ভাগই উঠেছে হরিসাধনের সিন্দুকে। তিনি নিজেও ছিলেন এই আনন্দের ভাগীদার। এইরূপে পৈতৃক সম্পত্তি খুইয়ে হরনাথ হয় দেউলিয়া। সন্তোষ সরকারের মদ সহ্য হত না। টাকার জন্য হরিসাধন তাকে মদ ধরালেন। ফলে তার হল পক্ষাঘাত।

তিনি সুকৌশলে এক একজনের সর্বনাশ করেছেন। অপরে তা জানত না। এমন কি যার সর্বনাশ হচ্ছে প্রথম প্রথম সেও ব্যাপারটা বুঝত না। দায়ী করত না তাঁকে, করতে পারতও না।

তাঁর স্ত্রী শিবানী দেবী কিন্তু নারীর সহজাত অনুভূতি দিয়ে বুঝতেন স্বামীর জীবনে নারী এসেছে অনেক। অন্যদিক দিয়েও ঠিক পথে চলছেন না। তিনি। মহিলা এ নিয়ে সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করেছেন।

হরিসাধন না বোঝার ভান করেছেন, বিস্ময় প্রকাশ করেছেন; বলেছেন, তুমি আমায় সন্দেহ কর? আশ্চর্য!

শিবানী জানতেন, এ তাঁর অভিনয়, কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রতিবাদ করতেন না। আরও ভয় ছিল তাঁর, স্বামী পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কা করতেন তিনি। তাঁর ভিতরে ভিতরে একটা জ্বালা ছিল, ফলে অল্প বয়সেই এই মহিলার মৃত্যু হয়।

স্ত্রীর মৃত্যুতে হরিসাধনের সামান্যতম সঙ্কোচটুকুও লোপ পেয়ে গেল। বাধা দূর হল।

একে একে তাঁর চোখের উপর অনেকগুলি ছবি ভেসে উঠতে লাগল। যে সব মক্কেলকে ঠকিয়েছেন তাদের রক্ত চক্ষু, যে সব নারীদের সঙ্গে ছলনা

করেছেন তাদের ভ্রূকুটি। সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠল ফুটন্ত জলের মধ্যে নিজ নবজাত সন্তানের আর্তনাদ তার মায়ের উন্মাদ হাসি, পাগল হয়ে গেছে সাগরিকা।

ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মাণিকমালা পথে বসেছে। শ্রীমানীদের বাড়ী বিক্রী হয়েছে, সন্তোষ সরকারের জমিদারী লাটে উঠেছে, হরনাথের বিরাট পৈতৃক কারবার ফেল পড়েছে। সবই তাঁর জন্য।

তারা একে একে সবাই আজ সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে দেওয়ালের উপর। অভিশাপ দিচ্ছে তাঁকে। শিবানীও তাঁর দিকে চেয়ে হাসছেন, বিদ্রূপের হাসি। তিনিও ক্ষমা করেননি?

হরিসাধন মনে করতেন পাপপুণ্য বলে কিছু নেই। আইনের চোখে, লোকের চোখে ধরা না পড়লেই হল, বিশেষ করে আইনের চোখে। কারও কাছে ধরা পড়েননি তিনি। এতদিন তাই একটা আত্মতৃপ্তি ছিল। আজ সেই তৃপ্তিটুকু লোপ পেয়েছে, এসেছে একটা দুর্দমনীয় ভীতি। বৃদ্ধ চীৎকার করে উঠলেন, ক্ষমা কর আমায় ক্ষমা কর।

প্রত্যুত্তরে দেওয়ালে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল অট্টহাসির কোরাস। ভয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন।

একবার ইচ্ছা হল জানালা বন্ধ করে আলোর প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেন। ঐ মূর্তিগুলোকে ডুবিয়ে দেন অন্ধকারের মধ্যে। কিন্তু উঠতে পারলেন না।

খানিকক্ষণ পরে তাঁর পুত্রবধূ আভা এসে আলো জেলে শ্বশুরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল, স্থাণুর মত বসে আছেন তিনি মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, মুখের উপর পড়েছে যেন এ্যালুমিনিয়ামের পাতলা এটকা পোঁচ। কি হল? ভয় পেলেন নাকি? সে বলল, কি হয়েছে বাবা, অসুখ করেছে আপনার?

কোন উত্তর করলেন না হরিসাধন। বাঁ হাতের তালুর উপর ডান হাতের পাঁচটা আঙুল ঠুকতে ঠুকতে কার্ডখানির দিকে তাকালেন।

আভারও চোখ পড়ল কার্ডখানার উপর। সে সেখানা তুলে নিতে যাচ্ছিল।

হরিসাধন গর্জন করে উঠলেন না-না খবরদার— ।

তার সঙ্গে শ্বশুরের এরূপ ব্যবহার এই প্রথম। তিনি তাকে একটি কড়া কথা কখনও বলেননি। আভার মনে হল ব্যাপার কি? কি আছে ঐ চিঠিখানায়।

একটু পরে হাত দিয়ে দেখল তাঁর কপাল যেন পুড়ে যাচ্ছে। জ্বর হল নাকি, না ব্লাড প্রেসার?

কিন্তু ব্লাড প্রেসারেও ত এত গরম হয় না। সে বলল, ডাক্তার ডাকব বাবা।

ডাক্তার আমার কিছু করতে পারবে না।

স্বামী বাড়ী নেই, মফঃস্বলে গেছেন রোগী দেখতে, আজ ফিরবেন না। দেবর বর্ধমানে। পরিবারের লোকেব মধ্যে বাড়ীতে আছে শুধু সে আর তার ছেলে গৌতম।

আভা আবার বলল, আমার বাবা বা মামাবাবুকে খবর দেই? মামাবাবু অর্থাৎ আভার মামা শ্বশুর।

আমায় বিরক্ত কর না বলছি, একটু একা থাকতে দেও।

আভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একবার ভাবল তার বাবাকে ফোন করে দেয় কিন্তু ফোন শ্বশুরেব ঘরে, সেখান থেকে কাউকে ডাকা সম্ভব নয়। খবর দিয়ে তাদেব জানালেও রেগে যাবেন।

বিকেল থেকে কিছু খাননি, হাত মুখ ধোননি, শনিবারের কীর্তন বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপার কি? এসেছে নিশ্চয়ই গুরুতর কোন দুঃসংবাদ, কি সে খবর। আভার মন খারাপ হয়ে গেল।

গৌতম পিতামহের অত্যন্ত প্রিয়। খানিকক্ষণ পরে তাকে নিয়ে এসে আভা শ্বশুরকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করল, অন্ততঃ একটু দুধ বা এক গ্লাস সরবৎ খান বাবা। তিনি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, না-না তোমায় ত আগেই বলেছি আমায় মাপ কর।

সারারাত হরিসাধন একই অবস্থায় খাটের উপর বসে বইলেন, একবারও নডলেন না। আভা চাকরদের বলল, হরিসাধনের উপর নজর রাখতে, নিজেও বার বার এসে বাইরে থেকে দেখে যাচ্ছিল। একবার দেখল তিনি হাসছেন। অর্থহীন হাসি।

ভোরের দিকে শুনল তিনি কতকগুলো নাম আওড়াচ্ছেন, সরযূ, সাগরিকা, মাণিকমালা, হরনাথ সন্তোষ—মাণিকমালা, সাগরিকা—।

নাম আওড়াতে আওড়াতে একবার বলে উঠলেন, এ্যাঁ! সেদ্ধ হয়ে গেল ফুটন্ত গরম জলে ইস-স··। ঐটুকু বাচ্চা।

আভার মনে হল এরা কারা। ফুটন্ত গরম জলেই বা সিদ্ধ হল কে? কার বাচ্চা? এদের সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক।

সকালেই সুধাংশু মফঃস্বল থেকে ফিরল। বাবার অসুখের কথা শুনে প্রথমেই গেল তাঁর ঘরে। সে ভেবেই পেল না এক রাত্রের মধ্যে মানুষের চেহারার কেমন করে এরূপ পরিবর্তন হয়। চোখ দুটি ঈষৎ লাল, চাহনি উদভ্রান্ত। চোখের নীচে পড়েছে গভীর কাল রেখা। মুখখানা কাগজের মত সাদা, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনায়

এক রাত্রির মধ্যেই এত ভেঙ্গে পড়েছেন ! কি হল ?

সে ডাকল, বাবা ।

সদ্য তন্দ্রোখিতের মতন হরিসাধন উত্তর করলেন, এ্যাঁ ।

অসুখ করেছে তোমার, কি হয়েছে ?

হরিসাধন নীরব ।

সুধাংশু তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখল গা পুড়ে যাচ্ছে । নাড়ী পরীক্ষা করে দেখল, রক্তের চাপ বেশ বেড়েছে । সে বলল, একবার যোগেশবাবুকে খবর দেই ?

যোগেশবাবু সুধাংশুর সিনিয়র ।

হরিসাধন বলে উঠলেন, না-না, দরকার নেই, কেন ডাকবে ? আমার ত কোন অসুখ করেনি ।

শুনলাম কাল সারা রাত ঘুমোওনি বিকেল থেকে খাওনি কিছু ।

হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন হরিসাধন । সুধাংশুর ভয় হল মাথার শিরা না ছিঁড়ে যায় ।

তাঁর হাসি থামল না ।

সুধাংশু চেয়ে রইল ।

একটু পরে হরিসাধন অনুচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, শুধু একখানা পোষ্ট কাড । সবই জানে, গরম জলে সিদ্ধর খবর পর্যন্ত, উঃ ।

সুধাংশু ত অবাক—এ সব কি বলছেন, পোষ্টকার্ডেরই বা অর্থ কি ?

হরিসাধন তখন বাইরের দিকে তাকিয়ে শূন্যে কি যেন খুঁজতে লাগলেন ।

সিনিয়র ডাক্তার এলেন । হরিসাধন তাকে ঘরে ঢুকতেই দিলেন না । গর্জন করে উঠলেন, ওকে বিদায় করে দাও, মিকশ্চার, ট্যাবলেটের কর্ম নয় ।

কিছুক্ষণ পরের কথা, সুধাংশু বাবার খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে আভা । শ্বশুরের মুখ ধোয়ার জল ও তোয়ালে নিয়ে এসেছে সে । সাধ্য সাধনা করছে । হরিসাধনের কানে সে কথা ঢুকছেই না ।

তিনি পোষ্টকার্ডখানা তুলে নিয়ে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, এই কার্ডখানার লেখিকাকে যে করে হোক খুঁজে বার কর । তাকে আমার সম্পত্তির একটা অংশ দিয়ে দিও ।

তারপর গলার স্বর বেশ নামিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, তাহলেই আমার চিকিৎসা করা হবে । বুঝলে ?

সুধাংশু কার্ডখানা নিয়ে দেখল কার্ডের এক কোণে তার বাবা উপরের

কথা কয়টি লিখে রেখেছেন। এই যেন তার বিষয় ভাগ করার শর্ত। বৃদ্ধের শেষ উইল।

সুধাংশু কি যেন ভাবল। তার চোখের উপর ভেসে উঠল অপরিচিত একটা জগৎ। তার বাবা সেই জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, নায়ক।

বড়ই রূঢ় আঘাত পেল সে। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আর আভা বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁদের দিকে।

হরিসাধন তার পরও কিছুদিন বেঁচেছিলেন, বাড়ীতে কীর্তন হয় না, জুনিয়র উকিল ব্যারিস্টাররা আসেন না। সুধাংশু, আভা এমন কি নাতি গৌতমের সঙ্গেও তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আছেন একা, সমস্ত দিন খাটের উপর বসে থাকেন, শূন্যের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবেন, হাসেন।

এর মধ্যে দু-তিন দিন সুধাংশুকে ডেকে বলেছেন, সেই পত্র লেখিকার খোঁজ পেলে না?

পাঁচপন

বেলা পাঁচটা। চার বন্ধুতে মিলে জেল-গরাদের পিছনে বসে তাস খেলছিল। রেগুলেশন থ্রির বন্দী তারা। সরকারের অতিথিদের মধ্যে নিকষ কুলীন।

কালীপ্রসাদ তাস বাঁটছিল। অরুণ তাস তুলে নিয়ে বলল, ষোল।

কালীপ্রসাদ বলল, সতের।

অরুণ বলল, আছি।

এই সময় এক যুবক এসে কালীপ্রসাদের পাশে দাঁড়াল। বয়স বাইশ-তেইশ। শ্যামবর্ণ লম্বাটে মুখে কালো কুচকুচে একজোড়া গোঁফ, চোখ দু'টি ছোট হলেও বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল কিন্তু চাহনি ব্যাথাতুর। এই বেদনার জন্য নিজেকে পাঁচজনের কাছ থেকে যেন আড়াল করে রাখতে চায়। কনুইয়ের উপর পিতলের চাকতিতে তার পরিচয় খোদাই করা, এক হাজার পঞ্চান্ন। এক ঝলকে তাকে দেখেই কালীপ্রসাদের মনে হল, একে শাস্তি দেওয়ার আগে হাকিম কলম তুলে নিশ্চয়ই দুবার ভেবেছেন, ভুল করছি না ত কিছু ?

অরুণ হাতের তাসের আড়াল থেকেই জিজ্ঞাসা করল, কি মনে করে বন্ধু ? আগে ত' দেখিনি, এখানে এলে কবে ?

এই শ্লেষমিশ্রিত তাচ্ছিল্যে যুবক ক্ষুব্ধ হয়েছিল কিন্তু সেই ক্ষোভ চেপে যতটা সম্ভব সহজকণ্ঠে বলল, ক্যানাবিস পাঠিয়ে দিলে। আপনাদের কি রান্না হবে আজ ?

পূর্ণ বলল, তুমি রাঁধবে বুঝি ? সে কিছু বলে দেয়নি ?

না, চোখ বুজে পড়ে আছে। একটু আগে আমায় ডেকে বলল, যা পাঁচপন স্বরাজী-দাদাদের রসুইটা করে দিয়ে আয়।

জেলে সাধারণ কয়েদীর পরিচয় নম্বর দিয়ে। এক হাজার পঞ্চান্ন কয়েদীদের মুখে মুখে সংক্ষেপে পাঁচপনে এসে ঠেকেছে। একমাত্র ক্যানাবিস এর ব্যতিক্রম। আবগারি আইনের মূর্ত প্রতিবাদ এই মানুষটি জেলে ছোটখাটো এক আবগারি কারবার খুলেছে। এসেছেও ঐ আইন ভঙ্গের অপরাধে। অতিরিক্ত গাঁজা খায়

বলে লোকে তাকে ডাকে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, সংক্ষেপে ক্যানাবিস। সে এবং আরো দু'তিন জন কালীপ্রসাদদের কাজ করে। রান্নার ভার তার উপরে। রাঁধে ভাল, কিন্তু মাসের মধ্যে পাঁচ সাত দিন গাঁজা ভাং মদ খেয়ে পড়ে থাকে।

অরুণ বলল, ক্যানাবিসকে নিয়ে আর পারা যায় না।

নলিনী পাঁচপনকে বলল, যাও, নিজে সব দেখে নাও গিয়ে।

সে চলে যাচ্ছিল। অরুণ জিজ্ঞাসা করল, রাঁধতে জান ত হে ছোকরা?

আজ্ঞে জানি।

পর পর ক'দিন ক্যানাবিস নেশায় বিভোর হয়েছিল। পাঁচপন রাঁধে ভাল। যত্ন করে খাওয়ায়। একদিন পূর্ণ বলল, এই ছেলেটিই থাক, ক্যানাবিসকে এবার বিদায় করে দাও।

শুধু রান্না নয়, রাজবন্দীদের সবকিছু তত্ত্বাবধানের ভার পড়ল পাঁচপনের উপর। ক্যানাবিসের কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠা লোপ পেল। আর পাঁচ জন কয়েদীর কাছে সে-স্বরাজী-দাদাদের নিয়ে জাঁক করতে পারে না। আর্থিকও বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে তার। পাঁচপনের উপর তাই সে রেগে গেল। প্রথম প্রথম এই রাগ প্রকাশ পেত আকার-ইঙ্গিতে। শেষটায় সোজাসুজি বলতে সুরু করল, পাঁচপন একটা ঘুঘু।

কালীপ্রসাদ একদিন জিজ্ঞাসা করল, কেন, সে কি করেছে?

সেদিন দেখলুম আপনার বই ঘাটছে! লোককে দেখাতে চায় শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ—আমাদের মতো ফালতু নয়।

সম্ভবতঃ অপরাধ করেছেও পাঁচপন! তার কি সাজা হওয়া উচিত, বল দেখি?

ঠাট্টা করছেন দাদাবাবু! শেষটায় বুঝবেন একদিন।

পাঁচপন রাজবন্দীদের স্থায়ী রাঁধুনি হয়ে গেল। শুধু রান্নাই করে না, কিসে তাদের সুখ-সুবিধা হয় সর্বদাই সেই দিকে তার লক্ষ্য। কথা বলে কম, যা বলে তাও নম্র কণ্ঠে। এর মধ্যেই সে আরও ক'জনের মন জয় করেছে। পারেনি শুধু অরুণের। সে বলে, চাপা মানুষ বলেই ভয় আরও বেশী। ও নিশ্চয়ই স্পাই। আত্মগোপন করে ফালতু হয়েছে।

ফালতু মাত্রকেই সে সন্দেহ করে। বলে, আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, সরকার ওদের পাঠায় খবর সংগ্রহের জন্যে।

শুধু সন্দেহই নয়, একজন ফালতুর বিরুদ্ধে আর একজনকে লাগিয়ে ফালতুদের খবর সংগ্রহের চেষ্টা করে। ক্যানাবিসকে সে লাগিয়ে দিল পাঁচপনের

খবরের জন্য। ক্যানাবিস একদিন বলল, নতুন এসেছে, তাই খবর জানতে পারি নি। বেটা মিটমিটে শয়তান, বোধ করি খুনটুন করে এসেছে। কয়েদখানার মৌনী বাবারাই হল শয়তানের জাসু।

পাঁচপনের কোন খবর সংগ্রহ করার আগেই অরুণরা অন্যত্র বদলি হয়ে গেল, রইল কালীপ্রসাদ একা। তার উপরও হুকুম হ'ল, ফালতু ছাড়া অপর কারও সঙ্গে সে মিশতে পারবে না।

সঙ্গী নেই, কাজ-কম্ম নেই, খেলাধুলো নেই। পড়াশুনা সে ভালবাসে, কিন্তু সব সময় বই নিয়ে থাকতে ভাল লাগে না। সঙ্গী একমাত্র ফালতুরা, কিন্তু তারা যেন আর এক জগতের জীব! তারা তাকে বোঝে না, সেও তাদের সঙ্গে দুটো কথা বললেই হাঁপিয়ে ওঠে।

এর ব্যতিক্রম শুধু পাঁচপন। তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয় কম, কিন্তু পরস্পরকে তারা যেন বোঝে। সামান্য আলাপ-আলোচনার মধ্যেই কালীপ্রসাদ তার বুদ্ধিমত্তা ও পরিচ্ছন্ন রুচি লক্ষ্য করেছে। ছেলেটিকে লাগে বেশ।

তার এই সহানুভূতিকে পাঁচপনও বেশ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করে। তাকে ডাকে দাদা বলে, কিন্তু প্রসাদ দা' তার দিকে একটু এগিয়ে গেলেই সে সঙ্কোচে পিছিয়ে যায়। কালীপ্রসাদের মনে হয়, কোথায় যেন স্পর্শকাতর একটা ক্ষত আছে তার।

একদিন দেখল পাঁচপন তার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' পড়ছে। সে পিছনে গিয়ে দাঁড়ালে ও টের পায় নি। ক্যানাবিস তার পড়ার খবর আগেই দিয়েছিল, সে আমল দেয় নি।

কিছুদিন থেকেই তার মনে হত, এ যুবক ফালতু হয়েছে কেন? আজ প্রশ্নটা জোরালো হ'য়ে উঠল। লেখাপড়া-জানা কয়েদীরা ত ফালতু হয় না। তারা জেলের আপিসে বা ছাপাখানায় কাজ করে। নয়ত জেল-বাবুদের বাড় গৃহ-শিক্ষক হয়। অরুণের মতন পাঁচপনকে স্পাই ভাবতে সে চায় না। তার বিশ্বাস, এর কারণ আর কিছু। কি সেই কারণ? পাঁচপন জেলে এসেছে কেন?

একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

পাঁচপনের গোঁফের নিচে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। কোন জবাব দিল না সে।

আর এক দিন তার দেশের খবর জিজ্ঞাসা করলে বলল, থাক।

এ যেন অবাঞ্ছিত অতিথির মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া।

পাঁচপন তার স্নেহের মর্যাদা দিল না বলে কালীপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ হল। আর

ফালতু ভাবল, এ তার দুর্ভাগ্য! প্রসাদদা'র কাছে আর একটু এগিয়ে যেতে পারলে জীবনের দুঃখ-কষ্ট, ব্যর্থতা ও আত্মগ্লানির হাত থেকে সে বহুল পরিমাণে মুক্তি পেত। কিন্তু তা ত হবার নয়।

একদিন ক্যানাবিস ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে এসে বলল, জানেন দাদাবাবু, পাঁচপন একটা মস্ত শয়তান।

স্পাই?

স্পাই ত মাথার ঠাকুর। তার চেয়ে ঢের খারাপ, ৩৭৬!

বাজে কথা। তুমি শুনলে কার কাছে?

ডেপটী বাবুর বাড়ি দুধ দোয়াতে গিছলুম। গিন্নী কর্তাকে বলছিল, পাঁচপনকে আমাদের কাজে লাগাও না যেন? ছেলেটা ভাল। কর্তা বললে, ওকে বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে দেব না ও ৩৭৬!

ক্যানাবিস অনর্গল বকে যাচ্ছিল। সব কথা কালীপ্রসাদের কানেও গেল না। সে ভাবছিল, পাঁচপন ৩৭৬ ধারার অপরাধী, নারীধর্ষণকারী। মানুষের সম্বন্ধে যত কিছু উচ্চ ধারণা, মহৎ কল্পনা সব ধূলিসাৎ করে দিল ছেলোটা। ছিঃ ছিঃ, মানুষকে সে আর বিশ্বাস করবে না।

রাত আটটায় টেবিলে প্রসাদ দা'র খাবার রেখে পাঁচপন কুঁজো থেকে জল গড়াচ্ছিল, কালীপ্রসাদ বলল, জল থাক্।

তার কণ্ঠের কর্কশতা পাঁচপনের কানে বাজল।

কালীপ্রসাদ বলল, তোমার ছোঁয়া খেতে আমার আর প্রবৃত্তি নেই।

হাওয়া-বেরিয়ে-যাওয়া গ্যাস-বেলুনের মতো ফালতুর মুখখানা চুপসে গেল।

উভয়েই নীরব রাস্তা থেকে ভেসে আসছে ট্রামের ঠুন-ঠুন, মোটরের ভোঁ-ভোঁ, অদূরে এক বিয়ে-বাড়িতে সানাই বাজছে। সে সব পাঁচপনের কানে পেঁছায় না। খানিকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে বলল, ক্যানাবিস বলেছে বুঝি? সকলের কাছেই বলে বেড়াচ্ছে! কিন্তু আমি কোন দোষ করিনি।

বলতে চাও যে হাকিম মিথ্যে করে সাজা দিয়েছিল তোমায়? জুরিরা ভুল করেছেন?

আমি দোষ স্বীকার করেছিলুম।

মিছিমিছি?

পাঁচপন নীরব।

কালীপ্রসাদ বলল, তোমার ভিতর যে এমন একটা পাপ আছে তা কল্পনাও করতে পারিনি।

পাঁচপন যেন আর্তনাদ করে উঠল, না, না দাদা, আমায় ক্ষমা করুন।

অন্য অপরাধ হলে ক্ষমার প্রশ্ন উঠত। কিন্তু স্পাইকে, দেশদ্রোহীকে আর নারীধর্ষণকারীকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।

আমি নির্দোষ।

বেশ। সব কথা খুলে বল দেখি?

তাতো পারব না দাদা!

হুঁ—বলে কালীপ্রসাদ গুম্ হয়ে বসে রইল। পাঁচপনের মতন তার বুকের ভিতরও ঝড় বইছিল তখন।

খানিকক্ষণ পরে বলল, আজ আমি খাব তোমার রান্না। সামনা-সামনি বলতে লজ্জা করলে লিখে দিও তুমি।

জামিনে খালাস পাওয়া আসামীর মত কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে পাঁচপন বেরিয়ে গেল।

সে কালীপ্রসাদের কাগজ কালি কলম নিয়ে গেল কিন্তু রাত্রে তিন তিন বার চেষ্টা করেও দু' ছত্র লিখতে পারল না। লিখতে গেলেই সামনে এসে দাঁড়ায় এক নারী। রাণী, তার কুইন।

একবার এসে দাঁড়ায় কালীপ্রসাদ। কাবুলীর মত দীর্ঘকায়। স্বাস্থ্যবান, দৃঢ় চোয়াল, প্রশস্ত বক্ষ প্রসাদদা'। তাঁকে সে জানাবে কেমন করে? না জানালেও তিনি তার ছোঁয়া খাবেন না।

জানালেও কি বিশ্বাস করবেন? ক্ষমা করবেন তাকে? তাঁর মতন আদর্শবাদী পুরুষের পক্ষে এইরূপ কাঠিন্যই স্বাভাবিক। কিন্তু সে যে কতখানি আঘাত পাবে তা কি বুঝবেন না তিনি? তাদের দু'জনের মধ্যে কুইন কী এক বিরাট ব্যাবধানেরই না সৃষ্টি করেছে!

পরের দিন আর সে প্রসাদ দা'র সামনে গেল না। সন্ধ্যার সময় ক্যানাবিসকে জিজ্ঞাসা করল, দাদা কি খেয়েছেন আজ?

জাঁক করে ক্যানাবিস বলল, আমিই রসুই করে দিয়ে এলুম, মুগের ডাল, রুই মাছ ভাজা আর ডিমের ঝোল।

দাদার কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত'?

তুই ভাবিস, তুই ছাড়া আর কেউ দাদার কাজ করতে পারে না?

না, না, তা নয়—পাঁচপন আমতা আমতা করে।

কালীপ্রসাদেরও দিনটা অস্বোয়াস্তিতে কেটেছে। সে আশা করেছিল পাঁচপন ব্যাপারটা লিখে জানাবে। সে দিন সে এল না। পরের দিনও নয়। তার এখন

মনে হয় পাঁচপনের লেখার কিছু নেই। সে সত্যিই অপরাধী।

এই দু'দিন ক্যানাবিস তার কাজ করেছে। রাজবন্দীর কাজে আবার বহাল হয়ে খুসি হয়েছে সে। বক্-বক্ করেছে সারাক্ষণ। কালীপ্রসাদ পাঁচপনের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেছে, তার অসুখ দাদাবাবু!

কি অসুখ?

খায় না, কারো সঙ্গে কথা বলে না, পাগল হয়ে যাবে। ও পাগল হবে না ত' হবে কে? যা পাপ করেছে।

কালীপ্রসাদ ধমক দিয়ে উঠল, তুমি বড় বাজে বক ক্যানাবিস!

সন্ধ্যার অল্প আগে ডেপুটি জেলার এসে কালীপ্রসাদকে বলে গেলেন, আজ রাত্রে আপনাকে অন্যত্র যেতে হবে। প্রস্তুত থাকবেন।

কখন?

ন'টায়।

বন্দীজীবনে কয়েক বার এ-রকম ঘটেছে, কখনও মুক্তি এসেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে, কোন বার এসেছে অন্য জেলে যাবার হুকুম বা জেলের বাইরে অন্তরীণ থাকার নির্দেশ। কিন্তু কোন বারই আগে কিছু জানতে পারেনি, শুরু করতে হয়েছে অনির্দেশ যাত্রা। ডেপুটি জেলরের কাছে জিজ্ঞাসা করে ঐ সম্বন্ধে জানবার কোন উপায় নেই, তাই কালীপ্রসাদও তাঁকে কোন প্রশ্ন করল না।

তিনি চলে গেলে একজন ফালতুকে বলল, পাঁচপনকে বল আমি আজই চলে যাব। সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

ফালতু বলল, আপনি আজ যাচ্ছেন বুঝি? কোথায় যাবেন?

জানি না।

ফালতুটি ক্ষুন্ন মনে বেরিয়ে গেল।

এক এক করে কালীপ্রসাদের জিনিষপত্র জড় হয়েছে অনেক, বই-ই বেশী। বইয়ের উপর ধুলো জমেছে। সেগুলো ঝাড়তে হবে। তল্পীতল্পা বাঁধতে হবে, হাতে সময় কম, কিন্তু কালীপ্রসাদ আর কাউকে ডাকল না। নিজ হাতে সব গোছাতে লাগল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ছিল পাঁচপনকে, নিপুণ কাজ তার, করেও নিষ্ঠার সঙ্গে, সুন্দর স্বভাব, শান্ত, নম্র।

খানিকক্ষন পরে ফালতুটি এসে বলল, পাঁচপন আসছে।সে বললে একটু দেরী হবে তার, সে জানে যে আপনি আজ যাবেন।

কি করছে সে?

ঘ্যাচ-ঘ্যাচ করে কি সব লিখছে জোর কদম্।

পাঁচপন এল রাত সাড়ে আটটারও পরে। প্রসাদ দা'র হাতে কয়েকখানা কাগজ দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কালীপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে আরম্ভ করল। পাঁচপন চেয়ে রইল তার দিকে সে দেখছিল প্রসাদ দা'র মনের উপর তার চিঠির প্রতিক্রিয়া, তার মুখের প্রতিটি রেখার আকুঞ্চন-প্রসারণ।

কালীপ্রসাদ পড়তে লাগল।

পূজনীয় দাদা, যে রাত্রির ঘটনার কথা লিখছি সেই রাত্রি থেকে অবিচার অবিশ্বাস ও লাঞ্ছনাই পেয়ে আসছি, খুনেরা চোর-ডাকাতরা ভাবে, আমি তাদেরই সমগোত্র। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চায় তারা। তাদের সঙ্গে মিশতে পারি না বলে মনে করে আমি দেমাকে। পাঁচটা কুৎসা রটিয়ে আমাকে অপাংক্তেয় করে রেখেছে। সে সব আপনি জানেন না। এ আমার সৌভাগ্য।

একমাত্র আপনার কাছ থেকে স্নেহ পেয়েছি,মানুষের মর্যাদা দিয়ে আপনি আমাকে চার দিকের বিষাক্ত বাষ্প থেকে রক্ষা করেছেন। তাই অকপটে আপনার কাছে সব নিবেদন করলাম।

নিরপরাধ আমি নই, দোষ আছে আমার কিন্তু যে ঘৃণিত অপরাধের শাস্তি আমি ভোগ করছি, সে সম্পর্কে নিজেকে আমি অপরাধী মনে করি না, যা লিখছি তার একবিন্দুও মিথ্যা নয়, কোন কিছু গোপন করিনি, অতিরঞ্জিত করিনি. আপনি বিচার করে দেখবেন।

নাম তার অলকা, আমি ডাকতুম রাণী বলে। কখনো বলতুম কুইন। তাকে ভালবাসতুম।

এই সময় বাইরে জুতোর মশ-মশ শব্দ হল। জেলের কর্তৃপক্ষ আসছেন, কালীপ্রসাদ তাই তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পকেটে পুরল, পাঁচপনের মুখখানা কালো হয়ে গেল, কালীপ্রসাদ তার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বলল, পড়ে দেখব ভাই।

পাঁচপন আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এই সময় জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ টমসন ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে বন্দুকধারী তিনটি পাঠান, একটি বাঙালী অফিসার ও দুটি ফালতু।

টমসন বললেন, আপনি প্রস্তুত মিঃ বানার্জী ?

কালীপ্রসাদ বলল, হ্যাঁ মিঃ টমসন।

তাহলে চলুন আমাদের সঙ্গে, এঁরা আপনাকে নিয়ে যাবেন, ইনি হচ্ছেন মিঃ মজুমদার।

কালীপ্রসাদ বলল, আমি ওকে চিনি লর্ড সিনহা রো'তে ও'র সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

আশা করি পুরানো পরিচিত মিঃ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে পথে আপনার কোন অসুবিধা হবে না—ব'লে মিঃ টমসন একটু হাসলেন।

ধন্যবাদ, আমিও সেই আশাই করি।

কালীপ্রসাদ ও মজুমদারের মধ্যে মৃদু হাস্য বিনিময় হ'ল।

কালীপ্রসাদ তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে পাঁচপন স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে-মুখে তার এক অদ্ভুত হতাশা, প্রসাদদা'র অভিমতটাও সে জানতে পারল না? এতই ভাগ্যহীন!

পরের দিন কালীপ্রসাদ দ্রুতগামী এক ট্রেনে বসে আছে, উঠেছে হাওড়া থেকে। বর্ধমান, আসানসোল—ট্রেণ কোথায় যে তাকে নিয়ে যাবে সে জানে না।

যেখানে যায় যাক। সে পাঁচপনের চিঠিখানা বার করে পড়তে লাগল।

রেসের ঘোড়া যেমন একটা সীমারেখা থেকে ছুটতে আরম্ভ করে আমার মনের ঘোড়াও তেমনি একটা রেখা থেকে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। একদিন রাত্রে আমার বিদায় নেওয়ার সময় কুইন বলল, তুমি আমায় খুব ভালবেসে ফেলেছ, তাই না?

তার আগে ভাল হয়ত বাসিনি। শুধু ভাল লাগত, ভালবাসা শুরু হ'ল সেই থেকে।

তারও আগের কথা। দূর সম্পর্কে অলকার স্বামী আমার জেঠতুত ভাই। বয়সে সে আমার বাবার সমান। পরিচয় ছিল, তবে যাতায়াত ছিল না। একবার এই দাদাটির মরণাপন্ন অসুখ করে। সদ্যপ্রসবা কুইন তখন পিত্রালয়ে। সে সূতিকায় ভুগছে। ছেলেটি মরে গেছে। দাদার সেবার ভার পড়ল আমার উপর। সেবা-শুশ্রূষা করে আমি তাকে মরণের হাত থেকে ছিনিয়ে আনি। সেই থেকে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত, প্রায়ই যাই।

কিছুদিন পরে কুইন পিত্রালয় থেকে ফিরে এল।

রোজই বিদায় দেওয়ার সময় সে সদর দরজার কাছে এসে আমার পথের দিকে চেয়ে থাকে। বেশ একটা আমেজ লাগে। যেদিন প্রথমে ভালবাসার কথা বলে সেদিন তাকিয়েছিল অনেকটা বেশী সময়। আমিও ফিরে তাকাচ্ছিলুম। পাশেই একটা বড় পুকুর। পুকুরের ওপারে জঙ্গল। কয়েকটা তাল ও নারিকেল গাছ। একটা ছিল ইউক্যালিপট্যাস, তার পাতার ফাঁক দিয়ে সদ্যোত্থিত চাঁদ উঁকি মারছে। দুটো-একটা পাখী ডাকছে। স্বপ্নালু পরিবেশ।

আমি ভালবেসে ফেললুম। মনে করলুম, ওই আমার কুইন। পেতে হবে ওকে।

রোমান্স তীব্রতর নেশা। কস্তুরী মৃগের মতন আপন নেশায় আপনি বিভোর হয়ে গেলুম। সব কিছুই ভাল লাগত। সে যে মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যেত সে মাটি মনে হত স্বর্ণরেণু।

খারাপ লাগত তার স্বামীকে। দিন দিনই তার সান্নিধ্য দুঃসহ হয়ে উঠছিল। খর্বাকৃতি, শীর্ণ, লুব্ধ এই মানুষটি সারাক্ষণ রেলের বোতাম-আঁটা কোট পরে থাকে। কাঁচা-পাকা গোঁফ নাচিয়ে খালি রেলের গল্প করে। বলে, আমরা রেল-বাবুরা বিশেষ করে গার্ড ড্রাইভাররা হলুম সরকারের রাইট হ্যান্ড। খাদ্য ও সৈন্য চলাচল, বাণিজ্য রাজ্য শাসন সবই চলছে আমাদের এই বোতামকে কেন্দ্র করে। বলে আর বোতামে টোকা দেয়। এই মানুষটাকে বরদাস্ত করতে হত আমার। হেসে কথা বলতে হ'ত।

দিন কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কুইনকে গান শোনাতুম। সে একদিন আমার চার-পাঁচখানা রেকর্ড বার করে দেখাল। বলল, তোমার রেকর্ড কিনেছি। একলা থাকলে বসে বসে বাজাই। একে একে সবগুলিই কিনব।

সেদিন আমার চারখানা রেকর্ড বাজান হল। সেও সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে আমায় অবাক করে দিলে। সুন্দর কণ্ঠ, তাল লয়ে কোথাও ভুল নেই।

বললাম, তুমি যে এত ভাল গাইতে পার এতদিন তা গোপন করে রেখেছ কেন?

ভাল আর কোথায়? শিখেছি তোমার রেকর্ড ও রেডিওর গান শুনে শুনে। সে গানও তোমার।

অলকা আমার এতটা গুণগ্রাহী, আমার রেকর্ড কিনেছে, আমার গান শিখেছে। বড় ভাল লাগল।

তার ভাবালু চোখ দু'টি আমার চোখের উপর তুলে সে বলল, আমায় গান শেখাবে?

নিশ্চয়।

তার গানের প্রাইভেট টিউটর হলুম। অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সপ্তাহে দু'দিন গান শেখাতুম। তাকে শেখাতুম প্রত্যহ। একটা টিউশনি ছাড়তে হল। কুইনের ওখানে কিন্তু সঙ্গীতচর্চার চেয়ে মনস্তত্ত্বের চর্চাটাই হত বেশী। আরও অনেক সমস্যা, পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক, দেহ ও দেহাতীত প্রেম, প্রেম ও সমাজ।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, তরুণীরা প্রৌঢ় পুরুষকে ভাল বাসতে পারে কি না।

সে বলল, তোমার কি মনে হয় ?

পারে না।

পারে। বিশেষ করে এ দেশের মেয়েরা।

কুইনের জবাবে খুশি হতে পারিনি সেদিন।

অনেক দিন দু'জনার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে একটা রোমান্সের সৃষ্টি হত। গান সে পছন্দ করত কিন্তু তার চেয়ে বেশী পছন্দ করত রোমান্স। মুক্তি চাইত রেলবাবুর আদর থেকে, চাইত তারুণ্যের সান্নিধ্য।

তবুও গান কিছুটা হল। গান গাওয়ার জন্য আমি তাকে মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে নিয়ে যেতুম। একবার রেডিওর প্রোগ্রাম পেয়ে তার খুশি আর ধরে না। সে বলল, তোমার জন্য সারা কলকাতা আজ আমার গান শুনল।

আমার গুরুদক্ষিণা ?

দক্ষিণা ত যথেষ্ট পেয়েছ ?

কি যে পেয়েছিলুম জানি না কিন্তু ঐটুকুতেই ভুলে গেলুম। তবে এই গুরুগিরির ফলে তত দিনে আরও একটা টিউশনি ছাড়তে হয়েছিল। সেটিতে অর্থাগম হত সবচেয়ে বেশী।

বাড়ী ফিরে কুইন স্বামীর হাতে রেডিও-আপিসের চেকখানা দিল। মনে করেছিলুম সে খুসী হবে। চেকখানা হাতে করে সে বার দুই গোঁফও নাচিয়েছিল বটে। তারপরই বলল, তেজবরের হাতে না দিয়ে তোমার বাবার উচিত ছিল বড়লোকের অপ টু ডেট তরুণ ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া।

আমার গরিব বাবাকে ঠাট্টা করছ কেন ?

ঠাট্টা নয়, সত্য কথা বলছি। গরিব পরিবারের শিক্ষা তুমি পাওনি। আমাদের ঘরে সংস্কৃতির চেয়ে রান্নাবান্নার দাম অনেক বেশী।

আমি ও কাজে কোন ত্রুটি করি না।

যে ত্রুটি করে, সে বোঝে না। আমি মনে করি নাচ, গান ও সাহিত্য হল ধনীর বিলাস আর কুঁড়ের পেশা।

ইঙ্গিতটা স্পষ্টতই আমার বিরুদ্ধে।

কুইন গান ছেড়ে দিল। আমায় একদিন বলল, আমি হলুম তোমার কুগ্রহ। দু'দুটো টিউশনি নষ্ট করলে আমার জন্য অথচ আমারও গান শেখা হল না।

সে যে আমার কুগ্রহ নয় এটুকু বলতে গিয়ে এক রাজ্যের উচ্ছ্বাস করলুম। সে সুর আজ মনে নেই। শুধু আমি নই, সেও মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। সে দিনও উঠেছিল।

ধরা দিত সে নানা ভাবে। বলত আমি চাই মুক্তি, চাই আলো-বাতাস, অক্সিজেন। তুমি শিল্পী, একমাত্র তুমিই সেই আলোর সন্ধান দিতে পার।

এক দিন বলল, কাল সারা রাত স্বপ্ন দেখলুম তুমি আমায় আদর করছ।

আর একদিন একখানা রেকর্ড শুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকের উপর। বলল, তোমার প্রতিভার বেদীতে এ আমার অর্ঘ্য।

তার ওই স্বীকৃতিকে সেদিন মনে হয়েছিল জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

মাঝে মাঝে সে বলত, পবিত্র আমাদের এ সম্পর্ক, শুভ্র নিষ্কলুষ।

রোমান্স প্রীতি ও যৌবনের ক্ষুধাকে আদর্শের পোষাক পরিয়ে সে তৃপ্তি পেত। কথা বলত আদর্শবাদের ময়ান মাখিয়ে, বিশেষ করে আমার সঙ্গে।

সে সব সত্য বলেই ধরে নিয়েছিলুম। সত্য ছিলও হয়ত তখন।

বড় বেশী জড়িয়ে পড়েছিলুম। বন্ধু 'চ' একদিন আমার তুলনা করল ভারবাহী এক চতুষ্পদ প্রাণীর সঙ্গে।

কুইন আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শুনে 'গ' প্রশ্ন করল, তুই কি করলি?

ভদ্রলোকে যা করে। নিজেকে সরিয়ে নিলুম।

কচি খোকা, দুধের দাঁত পড়েনি। চিবিয়ে খেতে জানেন না।

সেদিন রাগ হয়েছিল 'গ' এর উপর। ভাবলুম, কী অভদ্র ইঙ্গিত।

কিন্তু সেই থেকে আমার ভিতরে রক্ত-মাংস-লোলুপ একটা নেকড়ে জেগে উঠল। প্রথম যেদিন কুইনকে আদর করতে গেলুম সেদিন সে তার মুখ সরিয়ে নিল। আর একদিন ছোট কপালখানি এগিয়ে দিল। কিন্তু আমি তার নিচের ঠোঁটে হাত দেওয়া মাত্রই একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল, না, না। আমি যে অপরের।

সেই দিন প্রথম বুঝিয়ে দিল যে সে একটা সীমারেখা টানতে চায়। আমাকে সেই সীমারেখার বাইরে রাখবে। অসহ্য ঠেকল। বললুম, এ তোমার নেকামি।

কুকুরে তাড়া করলে মার্জারী যেমন ফোঁস করে রুখে দাঁড়ায় কুইনও তেমনি ফোঁস করে উঠল। বলল স্পর্ধা ত কম নয় তোমার? ভদ্রমহিলাকে বল নেকা। আমি হোঃ-হোঃ করে হেসে বললুম, খুব ষ্টেজ এ্যাক্টিং জানো বটে!

উঃ! উঃ! কি ভুল করেছি একটা পাগলকে প্রশ্রয় দিয়ে—বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি যেন এতটুকু হয়ে গেলাম। এ কী করলুম আমি। এই আমার শিক্ষা? আমি না ভদ্রসন্তান? আমি না শিল্পী?

বন্ধুবর্গ শুনে বলল, প্রত্যাখ্যান করেছে ত? অক্ষমতার এইই পুরস্কার। কুইনের মধ্যে দুটো সত্তা ছিল। একটা ছিল যৌবন-পূজারিণী শিল্পী, সবুজের সাধিকা।

তার অপর সত্তা চাইত নীড় বাঁধতে। চাইত মাথার উপরে একটা আচ্ছাদন। তার ভিতরকার এই শেষ সত্তাটাই ক্রমে ক্রমে তার শিল্প-সত্তাকে গ্রাস করে ফেলল। নীড় রচনায় গার্ডবাবু ও সে বিহঙ্গম বিহঙ্গমী। আমি সেখানে একেবারেই ফালতু। সজীব বিঘ্ন। নীড় রচনার আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে দূরে সরে যাচ্ছিল আমার কাছ থেকে।

ভেবেছি সব ছেড়ে আবার পুরানো জীবনে ফিরে যাই। সুর ও সঙ্গীতের জীবনে। আমার কাছে সে শুধু সুন্দর সুরভিত একটা স্মৃতি হয়ে থাক। বুকের রক্তকমল। কিন্তু ছাড়তে পারিনি তাকে। সেও ছাড়তে চায়নি।

এক এক সময় তার ব্যবহারে ব্যথা পেতাম, আমিও রাগিয়ে দিতাম তাকে। রাগলে তার গৌরবর্ণ মুখের উপরে পড়ত লাল আভা। মুখখানা হয়ে উঠত যেন কাশ্মীরী আপেল।

প্রতিবার বিরোধেই আমার পরাজয় ঘটত। আমি হার মানতুম ; সে আবার সেই ক্ষতের উপর প্রলেপ বুলিয়ে দিত। এই ছিল তার চরিত্রের মোহনীয় দিক।

একদিন স্বামীর সামনেই তার অলক্ষ্যে কুইন আমার হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিল। বাইরে এসে গ্যাসের আলোয় পড়ে দেখি, কাল রাত্রে গার্ড বাড়িতে থাকবে না, সন্ধ্যার পর এসো।

স্বপ্নাতীত এ সৌভাগ্য ! সেই রাতটা আর পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কত সুর ভাঁজলাম।

তার বাড়ি গেলাম সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে। মেঘলা রাত, জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। পুকুরের ওপারে জঙ্গলটার পাতায় পাতায় জেগেছে শিহরণ। ঠোঁট আগিয়ে দিয়ে যেন পরস্পরে চুমো খাচ্ছে।

আমায় দেখেই কুইন বলল, গার্ডসাহেব দু'দিন আসবে না। রাণীগঞ্জ গেছে কয়লা আনতে।

মন হালকা থাকলে সে স্বামীকে বলত গার্ডসাহেব।

গল্প করতে লাগলাম। অফুরন্ত গল্প। অর্থহীন কথা। রাত আটটা নটা দশটা বেজে গেল। এগারটা। বললাম, তোমার একটা গান শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আমি ত প্রতিজ্ঞা করেছি আর গাইব না। মনে নেই তোমার ?

অন্ততঃ একটা দিন, আমার জন্য।

প্রতিজ্ঞা ভেঙে তোমায় অপরাধী করব ? তা হয় না। রাত বেশী না হলে তোমায় একখানা গান গাইতে বলতুম। থাক, বরং একটা আবৃত্তি শোন। বলেই আরম্ভ করল—

একথা জানিতে তুমি
ভারত ঈশ্বর সাজাহান—

সুন্দর কণ্ঠ, সুস্পষ্ট উচ্চারণ। কোথায়ও জড়তা নেই, গলাকাঁপন নেই, নাট্‌কেপণা নেই।

তার আবৃত্তি শেষ হলে বললাম, জীবনটা এরকম হলে কী সরসই না হ'ত—প্রিয়া কবিতা ও বৈশাখী রাতের মেঘলা হাওয়া।

বেশ হত, বলে সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চুমায় চুমায় তার মুখখানা ছেয়ে দিলাম। প্রতিদানও পেলাম।

হঠাৎ ধূমকেতুর আবির্ভাব। দরজার খিল যে আঁটা হয়নি, আমাদের সে খেয়ালই ছিল না। গার্ড এসে দাঁড়াল চৌকাঠের উপর। ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করে পলকের জন্য কুইন কি যেন ভাবল। চোখে তার বিজলী চমক্ খেলে গেল। পরক্ষণেই ছুটে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ রেখে ফোঁপাতে লাগল, উঃ উঃ, এতক্ষণে বাঁচলুম।

কী, কী হয়েছে?

ও-ও আমায় বুকে—রক্ষে কর শয়তানের হাত থেকে।

কুইন থর-থর করে কাঁপছিল।

স্কাউণ্ড্রেল—বলে গার্ড ঘুসি বাগিয়ে আমার দিকে ছুটে এল। তাদের চীৎকারে পল্লীর বহু লোক এসে জড় হল। অনেকের চোখে-মুখেই কৌতূহল-মিশ্রিত আনন্দ। তাদের মধ্যে দু'চার জন কুইনের অভিনয় হয়ত ধরতে পেরেছিল কিন্তু সমবেত পুরুষ জাতির শিভালরি তখন বিচার-বুদ্ধিকে ছাপিয়ে গেছে। আমার উপর যখন কিল, চড় ও ঘুষিবৃষ্টি হচ্ছিল সেই সময় আমি কুইনের চিঠিখানা গলাধঃকরণ করে ফেললুম।

নারী-ধর্ষণের চেষ্টা গুরুতর অপরাধ। দায়রায় সোপর্দ হলুম। হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কিছু বলার আছে?

না, আমি অপরাধী।

জান, এ অপরাধের শাস্তি?

জানি হুজুর!

তোমার কিছু বলার নেই?

না, আমি অপরাধী।

আমার মায়ের নিযুক্ত উকিল বলে উঠলেন, হোয়াট্ এ ফুল!

হাকিম মৃদু কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, ট্রাজেডি।

প্রথম অপরাধ, বয়স আমার কম, আমি অপরাধ স্বীকার করেছি. নানা দিক বিবেচনা করে তিনি আমায় লঘু শাস্তি দিলেন। দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

কুইন আদালতে উপস্থিত ছিল। হুকুম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার দিকে তাকাল। বড় করুণ দৃষ্টি, কি যে ছিল তাতে আর কি ছিল না জানি না। কিন্তু আমার সঙ্গে সেই চাহনির আবেদন আজও অক্ষয় হয়ে আছে।

এই আমার কাহিনী। আমি ভেঙে পড়েছি দাদা! যে কোন সময়, যে কোন অন্যায় কাজ করতে পারি। নেমে যেতে পারি অধঃপাতের অতল তলে, হয়ত যেতুমও, কিন্তু আপনার স্নেহ আমাকে রক্ষা করেছে।

ইতি আপনার স্নেহধন্য ৫৫।

পুনঃ– পৃথিবীতে মা ছিলেন আমার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় এবং একমাত্র আপনার জন। আমার শাস্তির সংবাদে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন, সে মূর্চ্ছা তাঁর আর ভাঙেনি।

চিঠি পড়া শেষ হলে কালীপ্রসাদ বাইরের দিকে তাকাল। রোদে পুড়ে পুড়ে আকাশ ধূসর হয়ে গেছে, চাওয়া যায় না। কিন্তু আকাশ নয়. তার চোখের উপর ভাসছে বিদায়ের সময় পাঁচপনের কাতর চাহনি। তার জীবনের স্মরণীয় সেই কালো রাত্রি, কুইনের ঘর! এক দমকা হাওয়ায় তার বুকের উপর থেকে ছিটকে বাইরে এসে পড়ল এক তরুণ স্থরাশিল্পী। সোজাসুজি জেলে এসে পাঁচপন বনে গেল।

কালীপ্রসাদ আবার চিঠিখানার কোন কোন জায়গার উপর চোখ বুলিয়ে নিল. সুন্দর হাতের লেখা, লিখেছে গুছিয়ে, আগাগোড়া পরিচয় দিয়েছে পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের। কুইনের উপর রাগ করেনি সে, নিজের উপরও নয় বরং কুইনের চাহনির শেষ আবেদন আজও তার বুকে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

অপরাধ আছে তার কিন্তু সেই অপরাধ আজ কালীপ্রসাদের মনে ক্রোধের উদ্রেক করল না বরং রাগ হল তার ভুলের জন্য।

আর হল সহানুভূতি, কি অপরাধ আর কী তার শাস্তি!

শাস্তি কি ছিল শুধু তার একারই প্রাপ্য?

হু-হু করে ছুটছে পাঞ্জাব মেল আর কালীপ্রসাদ ভাবছে পাঁচপনের কথা। সে এখনও কুইনকে ভুলতে পারেনি। এই ভুলতে না পারাই পাঁচপনদের ভাগ্যলিপি!

ভবানী সিংহের ফিশারি

অন্ধকার রাত, উপরে আকাশের বুকে অগণন জরির বুটি জ্বল জ্বল করছে। নিচে নদীর বুকে চলেছে ঢেউয়ের নাচন, জলো ফণা তুলে লাখো লাখো সাপ জলের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। এদিক থেকে বাতাস আসছে গাছের পাতায় শিহরণ জাগিয়ে, মৃদু গুঞ্জন তুলে। ডাল-পালা লতাপাতা কাঁপছে, মনে হয়, ট্যাবলো করছে তারা, মাঝে মাঝে কথা দিয়ে জোড়া বিচিত্র এক গীতি অভিনয়।

বাঁধের উপর কালো কালো কতগুলি মূর্তি—তারা নড়ছে, চলাফেরা করছে। শুক্র কিম্বা মঙ্গল গ্রহের পণ্ডিতরা হয়ত দূরবীণ দিয়ে দেখছেন কতগুলি পোকা, গভীর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করছেন যে, এগুলি নীচ জাতীয় কোনও জীব, এদের সবচেয়ে বড় কাজ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করা।

পোকা নয়, একদল মানুষ, মুখের ও পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলেছে বটে কিন্তু অনেকেরই কাপড়ে গামছায় কাদার দাগ, পাশে রয়েছে কোদাল, খন্তা,মাটি মাখানো ঝুড়ি। দুপুর থেকে তারা অপেক্ষা করছে ভবানী সিংহরায়ের জন্য।

কলকাতার বিরাট ব্যবসায়ী, সিংহরায় গঙ্গার পারে পাঁচশ বিঘা জমি নিয়ে ফিসারি করছে। মাটি কেটে কেটে ভেড়ি বাঁধছে। ভিতরে হবে ছোট ছোট খাল। বাঁধে নালা কেটে—নদী থেকে জল আসবে জলের সঙ্গে আসবে মাছ।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, এই সময় আজ দুপুরে এক বিপদ ঘটল, শ্রীধরের পা কেটে গেল। গোমস্তা জন্মেজয় তলাপাত্র তখনই কলকাতায় লোক পাঠিয়েছে সিংহরায়কে নিয়ে আসার জন্য।

কাজ সেই থেকে বন্ধ। মজুরেরা বাবুর জন্যে অপেক্ষা করছে। তিনি এলে সবাই গিয়ে শ্রীধরের আরও ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থার কথা বলবে, ক্ষতিপূরণ চাইবে, আর জানাবে নিজেদের অভাব অভিযোগ।

কিছুদিন থেকেই শ্রীধরের শরীর ভালো ছিল না, জ্বরভাব, মাথা-ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, কাজে না এলে ছেলে মেয়ে বউ উপোস করে, তাই অপটু শরীর নিয়েও আসে।

জ্বরের জন্য কোন কোন দিন ভাত খেতে পারে না ; আসে দুটো চিড়ে মুড়ি মুখে দিয়ে। খন্তা দিয়ে চাক্ চাক্ করে মাটি কাটে। মাটি বোঝাই ঝুড়ি মাথায় করে দশবারো হাত উপরে এসে বাঁধের উপর মাটি ফেলে। প্রতিবারই কুলকুল করে সারা শরীর দিয়ে ঘাম ঝরে, হাঁপ ধরে।

আজ দুপুরে বাঁধে এসে প্রায় উঠেছে এমন সময় তার মাথা ঘুরে গেল. কেমন যেন কালো হয়ে গেল চারদিক। শ্রীধর ডান হাতখানা বাড়িয়েছিল কিন্তু শূন্যে কোন অবলম্বন মিলল না। বেচারা গড়িয়ে এসে পড়ল একেবারে বারো হাত নিচে গুপলুর খন্তার তলায়।

খন্তার ডগায় মাংসের টুকরো ঝুলছে, রক্ত পড়ছে টুপ টুপ করে, পাশেই একটা মানুষ কে যে পড়ল, রক্ত কার—গুপলু তা লক্ষ্য করল না। রক্ত দেখেই গাঁক গাঁক শব্দ করে মৃগী রোগীর মতোন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

চীৎকার উঠল খুন খুন। লোক ছুটে এল চারদিক থেকে। শ্রীধর প্রথমটায় কিছুই অনুভব করতে পারে নি। ভিড় দেখে, রক্ত দেখে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই যাতনায় মুখখানা গেল কুঁকড়ে জিব বার করে ইসারা করল—জল।

বাঁধের উপর খড়ের চালা, গোমস্তার বিশ্রামের ঘর। চালার তলায় শ্রীধর শুয়ে আছে। আড়ায় ঝুলানো হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে তার ফ্যাকাসে মুখ, খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি। রক্ত ক্ষরণের ফলে বিকাল থেকেই জ্ঞান নেই, পাশে বসে তার স্ত্রী সর্ব। অর্থহীন চাহনি।

কি যে হয়ে গেল কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। স্বামীকে পাখা করতে করতে ঝিমিয়ে পড়ে, একটু পরেই উঠে হয়ত ডাকে, শুনছো।

কোলের মেয়েটি তার বুকের মধ্যে। মায়ের স্তণের শুকনো বোঁটা চুষতে চুষতে একবার ঘুমিয়ে পড়ে, ক্ষুধার জ্বালায় একটু পরেই আবার ট্যাঁ ট্যাঁ শুরু করে দেয়। সর্ব ধমক দেয়, দূর রাক্ষসী। কখনও বা চড়টা চাপড়টা মারে।

চার পাঁচ বছরের একটি ছেলে শ্রীধরের পায়ের কাছে ঘুমিয়ে, আর তাদের বড় ছেলে ঘরবার করছে, একবার বাইরে যায় আবার ভিতরে বাপের কাছে এসে বসে, তার কপালে, মুখে, গায়ে হাত বুলোয়।

বছর এগার বারো বয়স, নাম দুলু। শ্যামবর্ণ টকটকে সুন্দর মুখশ্রী। মাটি কাটা মজুরের ঘরের এ এক বেনিয়ম।

বাইরের জনতার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল সিংহরায়ের মজুর। কয়েকজন এসেছে মাতব্বর, আর দু' একটি কৌতুহলী। যেখানে যা কিছু ঘটুক না কেন

মধুলোভী মক্ষিকার মতোন তারা সেখানেই এসে ভন্ ভন্ করে।

বাইরে দুলুর ঘন ঘন ডাক পড়ে। শুভার্থীরা পরামর্শ দেয়, বাবু এলে কি বলতে হবে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখতে চায়। একজন বলল, চীৎকার করে কাঁদবি, আপনি আমার মা বাপ।

দুলু বলল, আমার বাবা ত ওই।

শুভার্থী উপদেশ দিল, বড় লোককেও বাবা বলতে হয়।

দুলু বলে, ইস্।

তা-না পারিস বলবি, দু'বেলা খেতে পাই না, আপনি আমাদের খেতে দিন, বাঁচিয়ে রাখুন।

কেন, কালও ত দুবেলা খেয়েছি। রোজই খাই।

মাতব্বর গুরুচরণ সম্পর্কে দুলুর মেসো, সে বলে উঠল, হা হা হারামজাদা বিচ্ছু। ও-ও আমাকেই বলতে হবে দেখছি।

ঠিক সময় রওনা হলে বাবু নটার আগেই আসতে পারতেন। দশটা এগারটা বেজে গেল এখনও তার দেখা নেই। লোকগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার আগে থেকে ভিড় কমে আসছিল, এবার আরো দ্রুত কমতে লাগলো গুরুচরণ বললো, ব-ব-ড় লোকের চলন তো, হাতির মতো আসছেন।

গোমস্তা জনমেজয় একটা গাছের গুড়ির ওপর বসে ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছিল। ভেড়ি, মাছের কারবার তা থেকে মৎস্য গন্ধার কাহিনী। ডাক্তার বললো, দেখবেন তলাপাত্র মশাই, আমি যেন ফাঁকিতে না পড়ি। গরীব মানুষ, দুপুর থেকে এই জায়গায় আটকে আছি।

তা দেখবো ব'ই কি। বাবুকে বলে আপনাকে যদি খুশি করে দিতে পারি তো আমায় কি দেবেন?

সে হবে' খন।

হবে' খন নয়। কথাটা আগে থেকেই পরিস্কার করে নেওয়া ভাল। ঠিক এই সময় সামনের পিচের রাস্তার উপর পরল আলোর সুতীক্ষ্ন ফলা, লোক-গুলোর চোখ যেন ঝলসে গেল।

নাকে পাঁসনে, মুখে সুবৃহৎ বার্মা, গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো। ঘাড় বাঁকাতে বাঁকাতে স্থূলবপু সিংহরায় গাড়ি থেকে নামল। পিছনে শ্মশ্রুল দেহরক্ষী, দেখলে মনে হয় লোকটা মাথায় ও মুখে যেন এক রাশ জঙ্গল বেঁধে চলেছে।

জনতা গাড়ির ধারে ধারে এসে ভীড় করে। সকলেরই চেষ্টা কি করে বাবুর নজরে পড়বে।

বাবু মহাশয়।

হুজুর।

পে-পে-পেন্নাম, আমি গুরুচরণ মাতব্বর।

জন্মেজয়ও ছুটে এসেছিল। ভবানী আর কোনদিকে না তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে লোকটি আছে কেমন, যার পা কেটেছে? কি যেন নাম? ওঃ শ্রীধর। অজ্ঞান হয়ে আছে? রক্তবন্ধ হয়েছে তো?

ডাক্তার পেছন থেকে বলে উঠলো, ইন্‌জেকসন দিয়ে রক্ত বন্ধ করেছি স্যার। এখনও ঘণ্টায় ঘণ্টায় চলছে কোরামিন, গ্লুকোজ, এড্রিন্যা—

ও, নমস্কার। আপনিই ডাক্তারবাবু?

আজ্ঞে হাঁ, পুরোনো আর. জি. কর, নাইণ্টিন থার্টিন।

তলাপাত্র বললো, খুব প্রাকটিশ ওর। এ অঞ্চলে বিধেন ডাক্তার।

ভবানী জিজ্ঞাসা করলো, যার খন্তার কোপে শ্রীধরের পা কেটেছে সে কোথায়?

গুরুচরণ মুখ বাড়িয়ে বললো, বে-বে-বেটা-গো-মুখ্খু, না জিজ্ঞেস করে পালিয়েছে। মরুক গিয়ে খুনের দায়ে।

ভবানী বলল, যে করে হক শ্রীধরকে বাঁচাতে হবে ডাক্তার বাবু। টাকার জন্য ভাববেন না।

তা-জানি, প্রাণটা আশা করি রক্ষা পাবে।

ডান-পা খানা?

সেপসিস না হলে পাও থাকবে।

দুলু বলে উঠল, সেপসিস কর না ডাক্তারবাবু। খোড়া করো না বাবাকে তোমার পায়ে পড়ি।

না রে ছোঁড়া ভয় নেই। সায়েন্সে যতটা আছে তা করতে কোন কসুর করবো না। তোর বাপের পা থাকবে।

ওঃ, এটি শ্রীধরের ছেলে বুঝি? বলেই তাকে কাছে টেনে নিয়ে ভবানী তার মাথায় হাত বুলোয়।

সুবেশা মোটরারোহী মোটাসোটা বাবুর সহৃদয় ব্যবহারে দুলুর মন পুলকে ভরে উঠলো। সে বলল, আমি বাবার ছেলে দুলু। সিষ্টিধর সাউ।

গুরুচরণ ধমক দিলো, হু-হু, হুজুর বলে কথা কইবি।

নিজেদের দাবি পেশ করার জন্য লোকগুলো দুপুর থেকে বাবুর জনাই

অপেক্ষা করছিল কিন্তু এখন ভরসা করে কেউ দাবি জানাতে পারে না। চারপাশে চলে মৃদু গুঞ্জন।

চিকিচ্ছের খরচার কথাটা বলো মাতব্বর।

আর ক্ষতিপূরণ। যতদিন না সেরে ওঠে ততদিন ওর ছেলে বউর খরচা।

আমাদের বাড়তি মজুরী।

ভবানীর কানে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে।

সবই সে জানত। তলাপাত্র তাকে লিখেছিল, মজুরদের দাবি না মেটালে তারা কাজ বন্ধ করবে।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এমন সময় এই উৎপাত। আর কদিন গেলেই বাঁধটা উঠে যেতো। বাঁধ না হলে বছরটা মাটি হবে। নষ্ট হয়ে যাবে হাজার হাজার টাকা। তাই কলকাতার বন্ধু পত্নীর জন্মদিনের উৎসব ফেলে সে চলে এসেছে। সে এইসব ভাবছে এমন সময় গুরু চরণ সামনে এসে বলল, জানেন বোধ করি যে মাটিতে রুধির পড়লে দেবতা তু-তু-তরুষ্ট হয়।

কাশীপতি পেছন থেকে নাক বাড়িয়ে বলল, পশুর রুধির পড়লেই মা—মাটি কলকল্ করে জল দেন্। এতো যে-সে পশুর রুধির নয়, মানুষের।

ধনীর কাছে নিজেদের স্বার্থের প্রসঙ্গ তোলার আগে মাতব্বরেরা ভূমিকার অবতারণা করলো তাকে খুশি করার জন্য, কিন্তু সিংহরায় সেকথা কানেই তুলল না। সে তখন সবাইকে শুনিয়ে গোমস্তা ও ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করছিল কি করে শ্রীধরকে সারিয়ে তোলা যায়, তার সংসার কিভাবে চলবে এইসব।

সর্বকে বলল, আমি তোমার সংসারের ভার নিলাম। কিছু ভেবো না মা।

পরক্ষণেই শ্রীধরের ডান হাতের কবজির নিচে ধরে বসে রইল। যেন ধ্যানী ধন্বন্তরি নাড়ী পরীক্ষা করছেন, মিনিট তিনেক ঐ অবস্থায় থেকে চোখ মেলে বলল, নাড়ী ভালো, জীবনের ভয় নেই। মনে হচ্ছে পা খানাও রক্ষে পাবে।

ঘোমটার ভিতর থেকে সর্ব তাকে দেখছিল, তার মনে হল, বাবু মানুষ নয়' দেবতা। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ বাষ্পার্দ্র হয়ে উঠল। ইচ্ছা হল তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

ভবানী দুলুকে জিজ্ঞাসা করল, কি খেয়েছো তোমরা ?

দুপুরে পান্তাভাত, মালঞ্চ শাক, লঙ্কা পোড়া।

—তারপর আর কিছু খাওনি ?

দুলু মাথা নাড়িয়ে জানাল, না, খায়নি কিছু। ভবানী গোমস্তার দিকে চেয়ে

বলল, এসব তোমার দেখা উচিত ছিল, একরাত্তি ছেলেমেয়েগুলো না খেয়ে রয়েছে।

এঁ্যা, এঁ্যা ভুল হয়ে গেছে স্যার। আপনার মতোন মাথা ঠিক রেখে তো আর···

ডোন্ট ফন্নাটার। এখানে বাজার কি দোকান কিছু কাছে আছে?

গুরুচরণ বলল, কা-কা কাছে কোন দোকান নেই। বা-বাজার পোটেক দূরে।

তোমাদের পাড়াগাঁয়ের এক পোত দু'মাইল। যাক্ বাজারে লোক পাঠিয়ে দাও, তলাপাত্র। ওদের জন্য খাবার নিয়ে আসুক। তলাপাত্র আমতা আমতা করে, এত রাত্তিরে দোকান কি—

বেশী পয়সা দিয়ে দোকান খোলাবে। এদের জন্য দই চিঁড়ে মুড়ি আনিয়ে দাও। আর পেলে সন্দেশ রসগোল্লা।

বাপকে দুলু ভালোবাসে খুবই, কিন্তু সন্দেশ রসগোল্লার সম্ভাবনার আনন্দ বাপের পা কাটার দুঃখটাকে ছাপিয়ে উঠল। তার মনে প্রশ্ন জাগল, বাবাব অসুখ সারা অবধি বাবু থাকবে তো, না হুট করে চলে যাবে?

জনমেজয় গুরুচরণকে বলল, তুমি এদের জন্য চিঁড়ে মুড়ি সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়ে দাও, মাতব্বর? চার জনের যাতে ভালো করে হয়।

ভবানী দরজার কাছে এগিয়ে এসে গুরুচরণের হাতে গুটি কয়েক টাকা দিয়ে বলল, ভালোই হল, তুমি মাতব্বর মানুষ, দোকান ঠিক খোলাতে পারবে। আচ্ছা তোমরাও অনেকে এখানে আছ, মোড়ল মশাই। আমার লোকই হয়ত বেশী।

কাশীপতি বলল, আপনার লোকই, যারা নিজেরা কাজ করে না, তাদেরও ছেলে ভাইপো আপনারই মজুর।

এখানে মোট কতজন হবে?

তা তিরিশ চল্লিশ জন হবে। ছিল আরও অনেক।

এই নাও আরও কিছু টাকা, তোমাদের জন্যও দই চিঁড়ে কলা গুড় আনাও। বলে ভবানী গুরুচরণের হাতে ঝন্ ঝন্ করে আরওকিছু টাকা ঢেলে দিল। শব্দ হল আগের বারের চেয়ে অনেক জোরালো। তারপর জিজ্ঞাসা করল, হবে— এতে?

গুরুচরণ বলল, নি-নি-নিশ্চয় হবে। সে চলে যায়। বাইরে জনতার মুখে মুখে চলে বাবুর প্রশংসা, মেজাজ বটে, এঁর কাছে সব বিষয়েই সুরাহা হবে।

আর একদল করে ফলারের হিসাব, চিঁড়ে দই কলার দাম। মাথাপিছু দই কতটুকু পড়বে, এইসব।

ভবানী শুনছে সবই। আর বসে বসে শ্রীধরকে হাওয়া করছে। প্রথমে

যখন পাখা করতে আরম্ভ করে তখন কাশীপতি বলেছিল, আমরা থাকতে আপনি কেন, কত্তা!

শ্রীধরের পা কেটেছে সেত তারই অপরাধ এইরূপ ভাব করে সিংহরায় বলল, আমাকেও একটু করতে দাও। তোমরা তো অনেক সেবা করেছ, আরও করবে!

ইন্‌জেক্‌শনের সময় শ্রীধরের শিরা যাতে ভালো করে ওঠে, সেই জন্য ভবানী তার বাহু চেপে ধরেছিল, কাশীপতি বলল, দেখেছ বাবু ডাংদারি কবিরাজীও জানে।

খাবার এল। দুলুদের দিয়ে সন্দেশ রসগোল্লা কয়েকটি অবশিষ্ট ছিল। গুরুচরণ বলল, ও-ও কটা আপনার ভোগে লাগান আপনিও হয়ত—

সে কী হে। আমার ভোগে কেন? ছেলে-ছোকরারা যারা আছে তাদের বরং একটা করে দাও।

দুলুর চিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল চালার তলায়।

সে এসে বাইরে বড়দের সঙ্গে খেতে বসল। বড়রা খাচ্ছে, গল্প করছে। কেউ বলছে, আর একটু দই হবে না গুরুদা?

আমার কলাটা বড্ড ছোট হয়ে গেল। কি দই করেছে দেখছ। দোখ্‌নের নাম হাসাল।

জোচ্চোর—পাকা জোচ্চোর। আবার বোড ঝুলিয়েছে ঠাকুর ছিরি ছিরি রামকিষ্টের নামে।

ভবানী এবার বেরিয়ে এসে বলল, তোমরা খাচ্ছ, বেশ বেশ। পেট পুরে খাওয়ার ব্যবস্থা আজ করতে পারলুম না।

এখনি যাচ্ছেন নাকি হুজুর?—আঙুলের দই চাটতে চাটতে মণি শীল প্রশ্ন করে।

গুরুচরণ বলল, আ-আমাদের আরজি ছিল। কাশীপতি বলল, শ্রীধরের সবই আপনি করবেন তা বুঝেছি তবে আমাদের রোজ—

রোজ মজুরি দু'আনা করে বেশী। আসতে এক লহমা দেরি হয়ে গেলেই গোমস্তাবাবু আধ রোজের মাইনে কাটে। এর পিতিকার চাই।

এ্যাঁ! আধ রোজের মাইনে নাকি; তলাপাত্র সেকী কথা?

তলাপাত্র নিচু গলায় বল্‌লে, আপনারই হুকুম ছিল। সিংহরায় এবার উচ্চকণ্ঠে বলল, দু'এক মিনিট দেরী হলে গোমস্তা বাবু মাইনে কাটবেন না, ওকে বলে গেলুম, তোমরা মন দিয়ে কাজ করো।

কাশীপতি বলল, আমাদের বাড়তি মজুরির—তার কথা শেষ হওয়ার আগেই

ভবানী বলল– কারবারে নেমে অবধি খালি খরচই করে যাচ্ছি। তার উপর আবার খরচা বাড়ল, কে জানে শ্রীধরের চিকিৎসার জন্য কত লাগবে ওর, পরিবারকেই বা সাহায্য করতে হবে কতদিন? ও সেরে উঠলে তখন বাড়তি মজুরির কথা ভাবা যাবে।

মণি শীল বলল, তার আগেই তো কাজ ফুরিয়ে যাবে, কর্তা।

না না, তা হবে না। আমাদের সকলের উচিত এখন শ্রীধরের কথা ভাবা, ওকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করা।

কাশীপতি বলল, সে কথাটা ঠিক। ওর ভাবনাটাই এখন বড়।

কেষ্ট বাগল বলে উঠল, তাই বুঝি দই চিঁড়ে সাপটাচ্ছ, মোড়ল? আঁতে ঘা লাগল, সকলের। অনেকেই সমস্বরে প্রতিবাদ করল, এ তোমার অন্যায় কেষ্ট ধন।

একজন বলল, দই চিঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে ছিরুর কথাও ভাবছি।

ওঠে হাসির লহর। চলে কথা কাটাকাটি। সিংহরায় ডাক্তারকে বলল, একটু সুস্থ হলেই শ্রীধরকে বোধ করি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

ডাক্তার বলল, হ্যাঁ স্যার, সেই ভালো, তবে সবচেয়ে কাছের হাসপাতাল পাঁচ ক্রোশ দূরে। সেখানে পাঠাবার মতোন হলেই সব ব্যবস্থা করব।

গুপ্লুর খোঁজ কর তলাপাওর। তার দরকার হতে পারে। আর তোমাদের কথা আমাব মনে থাকবে গুরুচরণ, কাশীপতি। সরকার মশাইকে বলে যাচ্ছি, উনি নিজেও বিবেচক লোক– বলে সিংহরায় যখন মোটর গাড়িতে উঠল মজুরদের ফলার তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, রাত্রির অন্ধকারও কেটে আসছে, ঊর্ধ্বে মহাশূন্যের দীপগুলি নিভছে এক এক করে। আর রাত্রি জাগরণের শ্রান্তি ও দই চিঁড়ের আমেজে মানুষগুলোর চোখও আসছে জড়িয়ে।

দুতিন দিন মাটি কাটার কাজ চলল খুব জোর। সিংহরায় যেন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে। সবাই চায় তাকে খুশি করতে।

মণি শীল নিজে ভবানীর মজুর নয়। তার কিন্তু মনে হল পিঠ চাপড়ে দই চিঁড়ে খাইয়ে বাবু তাদের বোকা বানিয়ে গেছে। সে কাশী পতিকে বলল ব্যাপার সুবিস্তা মনে হচ্ছে না। বাবুটা যেন কলকাতার ভেলকি খেলিয়ে গেল।

কাশীপতি বলল, ও আর পেকাশ কর না ভাই, তাহলে মান্যি মানত থাকবে না। মোড়ল আমরা।

গুরুচরণ বলল, না শীলের পো, বাবুর উপর তোমরা অন্যায় করছ। অমন দরাজ দিল তানার।

কিন্তু তার ছেলেই একদিন খবর নিয়ে এল, ওরা ছিরুকাকে গুরির গাঁয়ের হাসপাতালে পাঠিয়েছে মেরে ফেলতে। সেখানে ওষুধ ইনজেকশন সবই কিনে দিতে হয়। তার একটাও পড়ে না। এক দিনেই শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। বাঁচবে কিনা সন্দ।

সিংহরায়ের ওদার্য সম্পর্কে আরও দু'এক জনের সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু এই খবরের পূর্ব পর্যন্ত তারা ভেবেছে, যাক ছিরুর তবুও একটা সুরাহা হল। যা অবস্থা হয়েছিল দু'দিন পরে এমনিই শয্যা নিতে হত। চিকিৎসা হত না— পথ্য জুটতো না, চোখের উপর কচি কাঁচারা না খেয়ে মরত।

কেউ হয়ত বলে, বেচারার ডান পা খানা যদি যায়? সে জিজ্ঞাসা আর পাঁচটা কথার ভিড়ে চাপা পড়ে।

হাসপাতালের খবরে ক্ষোভের সৃষ্টি হল, শোনা গেল শ্রীধরের বাড়িতেও উপোস শুরু হয়েছে। মজুরদের রাগ হল বাবুর উপর, নিজেদের উপর, সুযোগ এসেছিল, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। তারা দু,আনা বাড়তি মজুরি চেয়ে ছিল। দু'আনা—আট—পয়সা যা তাদের কাছে অনেক। এমন পরিবার আছে বাপে ছেলেয়, খুড়ো ভাইপোয় মিলে চার পাঁচজন মানুষ কাজ করে। তাদের রোজ হত আট দশ আনা, বুনো মজুর পরিবারের সে এক ঐশ্বর্য। বাবু দেয় নি। তাদের বোকা বানিয়ে গেছে। শুধু তাদের নয়, মোড়লদেরও। এ মোড়লদের আর রাখবে না তারা, বদলাবে। সকলের আগে বদলাবে তোত্‌লা গুরুচরণকে।

তারা ঠিক করল কাজ বন্ধ করবে, কোদাল খন্তা তুলবে না, বাবুকে জব্দ করবে। কিন্তু দু'একদিন আলোচনা চলতে না চলতেই তাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল।

বাঁধ তৈরী হয়ে গেছে। মাটির তলা থেকে জল ওঠছে কুলকুল করে। মা গঙ্গাও প্রসন্ন হলেন, নালা পথে জল আসতে লাগল ভবানী সিংহরায়ের খালগুলিতে, খালগুলি মিলে হল প্রকাণ্ড এক ঝিল। নালাগুলি দিয়ে মাছ আসতে লাগল।

আর এল বন্দুকধারী পুলিশ, কলকাতা থেকে কুকি কোমরে গুর্খা পাহারা, মজুরেরা করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বছর তিনেক পরে, সিংহরায়ের ফিশারির ফলাও হয়েছে খুব। বাঁধের উপর বসেছে নতুন উপনিবেশ শ্রীপুর, নতুন বাজার বসেছে। ফিশারিকে কেন্দ্র করে

বেশ জমেছে বাজারটা। শ্রীপুরের বাসিন্দা ছাড়াও আশে পাশের লোক আসে। কলকাতা থেকে ফড়েরা আসে মাছ কিনতে। ভিখারীও বসে কয়েকজন।

সেদিন পাইপ টানতে টানতে অলস্টার গায়ে স্থূল বপু এক বাবু বাধের উপর ঘুরে ঘুরে নতুন কলোনি দেখছে, জল দেখছে, দেখছে মাছের বাজার।

এ সবই তার, এই জমি, ঐ জল, ফিশারি, শ্রীপুর। তার সঙ্গে তিন চারজন লোক, একজনের দু'হাতে ঝুলছে বড় বড় কয়েকটি মাছ।

একটি গাছ তলায় বসে এক খঞ্জ ভিক্ষা করছিল। এইখানেই ছিল গোমস্তার বিশ্রামের ঘর। মাছ দেখে খঞ্জ বলে উঠল, বাঃ খাসা মাছ তো। এক একটা নিদেন পাঁচ সেরি, কালিয়া হবে বুঝি? খাবেন রাজাবাবু, ভালো করে তেল ঘি দিয়ে খাবেন।

শ্মশ্রুল দেহরক্ষী ধমক দিল, চোপ রও।

ও আমার রুধিরে পুরুষ্টু জীব। আমায় দুটো পয়সা দিয়ে যান হুজুর। কাল থেকে মা মরা ছেলেমেয়েগুলো না খেয়ে আছে।

রুধিরে পুরুষ্টু শুনে ভবাণী সিংহরায় চেয়ে দেখে পা কাটা এক বৃদ্ধ, মাথার চুল সব সাদা, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে।

সে হন হন্ করে চলে যায়।

শ্রীধর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। পয়সা তো পেলই না, মাছগুলো যে তার রক্তে পুষ্ট বাবুর কানে হয়তো সে কথাও যায় নি। হায় ভাগ্য!

তখন রাজা বাবুকে সে চিনতে পারেনি। পরে শুনল।

দুদিন পরে কলকাতা থেকে হুকুম এল – সে আর ওখানে বসতে পাবে না।

শ্রীধর বুঝতে পারল না কি তার অপরাধ!

প্রবন্ধ

সাহিত্য সেবক সমিতির পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস

সমিতির ইতিহাস

তেরশ আঠার সনের ১২ই আষাঢ়, সাহিত্য সেবক সমিতির জন্ম হয়। কবিরাজি ছাত্রদের ছাত্রাবাস এর সূতিকাগার। প্রথম দিনের নয়জন সভ্যের মধ্যে আটজনই ছিলেন টোলের পড়ুয়া, তাঁদের মধ্যে সাতজনই পিতৃদেবের কাছে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করতেন। আমি অন্য একটি টোলে ব্যাকরণ ও কাব্য পড়তাম। একটি ছিলেন রিপন স্কুলের ছাত্র।

পিতৃদেব ক্ষীরোদচন্দ্র সেন ছিলেন কলকাতার একজন গণ্যমান্য কবিরাজ। সে যুগে কবিরাজদের আয় ও সমাজে তাঁদের সম্মান ও প্রতিপত্তির কথা শুনলে একালের ছেলেরা মনে করবেন, গল্প বলছি।

আমার বাবার কাছে পনের থেকে বিশজন আয়ুর্বেদ পড়তেন। আমাদের বাড়িতেই থাকতেন আট-দশজন। তাঁদের জন্য পৃথক একটি ছাত্রাবাস ছিল।

একদিন পিতৃদেবের অন্তেবাসীদের নিকট একটি সাহিত্য সভা গঠনের প্রস্তাব করি। তাঁরা সানন্দে সম্মতি দেন। সভার প্রতিষ্ঠা হল। নাম হল—সাহিত্য প্রচার সমিতি। কবিরাজি পড়ুয়ারাই সভাপতি, সহঃ সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। আমি হলেম সহঃ সম্পাদক। প্রথম সম্পাদক শ্রীঅনাদিনাথ ভট্টাচার্য ঘাটাল নিমতলায় আজও কবিরাজি করছেন। প্রথম দিনের এই সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন ওড়িয়া। নাম, নারায়ণচন্দ্র মহাপাত্র কাব্যতীর্থ। আর একজন চট্টগ্রামের বৌদ্ধ। তাঁর নাম অপূর্ব বড়ুয়া, ভিষক্‌তীর্থ।

নিজের কথা বলা সঙ্কোচজনক এবং কিছুটা ক্লান্তিকরও বটে। সমিতির ইতিকথায় মধ্যে মধ্যে আমার নিজের কথা এসে পড়বে অপরিহার্যরূপে। আশা করি সহৃদয় পাঠক সেজন্য ক্ষমা করবেন।

অনেক অক্লান্ত কর্মী বহু সুধিসজ্জন বাঙলা দেশের মনীষীদের অনেকেই এতে জীবন রসের সঞ্চার করেছেন। এই ইতিকথা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। মোটের উপর স্মৃতি থেকে গ্রথিত এই আখ্যায়িকায় হয়ত সমিতির কোন কোন বিশিষ্ট সহানুভাবকের নাম বাদ পড়ে গেছে। আশা করি তাঁরা সেই ত্রুটি মাজ না করবেন। তবে আমি যতদূর সম্ভব প্রত্যেককে তাঁর যথাযোগ্য স্থান দিতে চেষ্টা করেছি।

সাহিত্য প্রচার সমিতি নামের মধ্যে কোথায় যেন একটা দম্ভ লুকিয়ে আছে। প্রচারের শক্তি আমাদের কোথায়! অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু। এই কারণে পরবর্তী সাপ্তাহিক অধিবেশনে নামটি দলে রাখা হল সাহিত্য সেবক সমিতি। তাছাড়া কারণ আরও একটা ছিল। যতদূর মনে পড়ে 'মালঞ্চ' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কালপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সাহিত্য প্রচার সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল।

নানা কারণে আমাদের দেশের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই স্বল্পায়ু হয়। সাহিত্য সেবক সমিতি এর ব্যতিক্রম। ধন দৌলত নেই, বৈঠকের কোন স্থায়ী স্থান নেই, লাইব্রেরি নেই, এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও দরিদ্র এই প্রতিষ্ঠান আজ পঞ্চাশ বছর টিকে আছে। এই জীবন রসের জোগান এল কোত্থেকে? যাঁদের পরিশ্রমে. ত্যাগে ও সাধনায় প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘায়ু হয়েছে—এই বিবরণ তাঁদেরই সাহিত্য সেবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। দু মাসের মধ্যেই এই সংখ্যা তিরিশ চল্লিশের মধ্যে এসে পেঁছয়। সভ্যগণ সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে আবৃত্তি করতেন প্রবন্ধ পাঠ করতেন। মধ্যে মধ্যে আলোচনা সভা বসত। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, গিরীশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, রবীন্দ্রনাথ ও রজনীসেনের কাব্য, বাঙলা দেশের ইতিহাস প্রভৃতি ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এ ছাড়া ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বনেও নানা সন্দর্ভ পাঠ করা হত। কেউ কালিদাস, ভবভূতি ও শূদ্রকের উপর প্রবন্ধ পড়তেন। কেউ বা পড়তেন সেকস্‌পীয়র কোলরিজ এবং টেনিসনের উপর।

সত্যের খাতিরে বলতে হবে, এই প্রবন্ধগুলির কোনটিই উচ্চস্তরের হয়নি। তাই তার একটিও আজ বেঁচে নেই। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। এরই ফলে সমিতির সদস্যদের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি একটা আকর্ষণ এসেছে। তার প্রেরণা যুগিয়েছেন বাহিরাগত সুধী ও সজ্জনবৃন্দ। আমরা এই সব সভায় তাঁদের আহ্বান করতাম। টোলের পণ্ডিতরা আসতেন, কলেজের অধ্যাপকরা আলোচনায় যোগ দিতেন, উপদেশ দিতেন। তাঁদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গবাসী কলেজের ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও শিশু সাহিত্যিক শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের পাণ্ডিত্য আমাদের তরুণ মনে রেখাপাত করেছে। ফলে আমাদের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্য জগতে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

সমিতির তরুণ সদস্য শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আমাদের বিভিন্ন সভায় কয়েকটি রচনা পাঠ করেন। ইনি পরবর্তী জীবনে সুভাষচন্দ্রের বন্ধু ও সহকর্মী-রূপে দেশমুক্তির যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আজ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক। তাঁর নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিদেশের বহু-পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। তিনি বর্তমানে ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য।

আদিপর্বে সমিতির সভ্যদের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত করেন শিবনাথ শাস্ত্রী। ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যেত। শিশুর মত সরল এই বৃদ্ধ আমাদের সঙ্গে মিশতেন, উপদেশ দিতেন। সমাজে অত প্রতিষ্ঠা তাঁর, অত পাণ্ডিত্য কিন্তু আমাদের সমিতিতে যখন তিনি আসতেন, তখন মনে হত শাস্ত্রী মশাই আমাদেরই একজন। এক এক সময় মনে হয়, শৈশবে এই বরণীয় পুরুষের আশীর্বাদ সমিতিকে দীর্ঘায়ু করেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ছে। তাঁকে পেয়েও পাইনি আমরা। নাট্যকার হিসাবে, 'বঙ্গ আমার জননীআমার','যেদিন সুনীল জলধি হইতে'প্রভৃতি দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের উদ্‌গাতা হিসাবে, 'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই, সাহেব সেজেছি সবাই' প্রভৃতি হাসির গানের স্রষ্টারূপে, সে যুগে রবীন্দ্র নাথের পরেই যাঁর স্থান, সেই কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে একদিন গেলুম একটি সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব নিয়ে। নন্দকুমার চৌধুরী লেনের (অধুনা ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট) সুরধাম—দোতলা সুন্দর একটি বাড়ি। পূবের দিকে বাগান, বাগানের সামনের একতলার বারান্দায় কবি বসে আছেন। গিয়ে প্রণাম করলাম তাঁকে। তিনি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, বস। বললাম,আপনাকে আমাদের আগামী সভায় পৌরোহিত্য করতে হবে। বোধ হয় কানে কম শুনতেন তিনি। বললেন, আমি সানন্দে তোমাদের স্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণ করলাম।

বেশ একটু বিব্রত বোধ করে বললাম, এ বছর ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য অধ্যাপক ললিতমোহন দাস আমাদের স্থায়ী সভাপতি। আসছে বছর আপনি ঐ পদ গ্রহণ করলে আমরা ধন্য হব। আমি এসেছিলাম আপনাকে আগামী রবিবারের সভায় নিয়ে যেতে।

কবি বললেন, রবিবার তো আমি ব্যস্ত আছি, আর একদিন হবে।

আগামী বছর আপনাকে আমাদের স্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণ করতে হবে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল হেসে বললেন, নিশ্চয়। আজ আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি।

সমিতি তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছে কিন্তু তাঁকে পায় নি। এর অল্প দিন পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

পর পর দু বছরই ঘটা করে বাৎসরিক উৎসব করা হল। প্রথম বৎসর সভাপতিত্ব করেন শিবনাথ শাস্ত্রী। দ্বিতীয় বৎসর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র। তিনি ছিলেন সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। বিদ্যাপতি সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বাঙলাসাহিত্যে মিত্র মহাশয়ের সাহিত্য প্রীতি ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে।

বার্ষিক অধিবেশনে জলযোগেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রায় দু' বৎসর সমিতির কোন মাসিক চাঁদা ছিল না। এই দু' বৎসরের সমস্ত ব্যয়ভারই আমার পিতৃদেব বহন করেন। তাঁর স্নেহ ও আনুকূল্যের অভাব থাকলে শৈশবেই এই প্রতিষ্ঠানের বিয়োগ ঘটত।

সমিতির তৃতীয় বর্ষ বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল দিন। শরৎ-প্রতিভা বাঙালী পাঠককে করেছে বিস্ময়বিমূঢ়। যেন 'ভিনি ভিডি ভিসি' বলে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে আবিভূ ত হলেন এবং পাঠক চিত্ত জয় করলেন। 'ভারতী'তে তার 'অনুপমার প্রেম' দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় লেখকের নাম না থাকায় পাঠক সাধারণের মনে প্রশ্ন জাগে কবি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বেনামায় লিখছেন নাকি ?

এই বৎসরই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তি শুধু সাহিত্যে নয়, বাঙালী জীবনে একটা নব প্রেরণার সঞ্চার করে। বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়ও জাগরিত হয়। এতদিন বাঙলা সাহিত্য-সেবীর সমাজে তেমন মর্যাদা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সেই মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাঙলা সাহিত্যে তখন জোয়ারের বান ডেকেছে।

তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম বর্ষে সমিতির স্থায়ী সভাপতি ছিলেন মাইকেলের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু। *সুদর্শন*, সুবক্তা, মহনীয় চরিত্রের এই মানুষটি সমিতিকে খুব ভালবাসতেন ; সভ্যদের সাহিত্য সেবায় উৎসাহ দিতেন। তিনি তরুণ সাহিত্যসেবীদের বলতেন, সংস্কৃত পড়। ভাল সংস্কৃত জানা না থাকলে ভাল বাঙলা লেখাই সম্ভব নয়। ইংরেজির সঙ্গে লাতিন গ্রীকের যে সম্পর্ক, বাংলা হিন্দি, ওড়িয়া, গুজরাটি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পক তার চেয়ে ঘনিষ্ঠতর।

সমিতির সভাপতি থাকা কালীন তিনি দুখানি মহাকাব্য রচনা করেন। 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী'। দুখানিই তিনি আমাদের সমিতিতে পড়ে শোনান।

মহাকাব্য রচনার জন্য রামমোহন লাইব্রেরি হলে সভা করে তাঁকে 'কবিভূষণ' উপাধি দেওয়া হয়। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর (পরে রাজা) কবিকে সোনার দোয়াত কলম উপহার দেন। সমিতির পক্ষ থেকেও তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ বর্ষে সমিতির সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনিই প্রথম সমিতিতে মাসিক দু'আনা চাঁদার প্রবর্তন করেন। সুশ্রী সুবেশ সুশিক্ষিত সুরেন্দ্রনাথের অক্লান্ত সেবা সমিতিকে জীবন রসে পরিপুষ্ট করেছে। তিনি নিজে ইংরেজি সাহিত্য অবলম্বনে অনেকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য, রাজেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং আরও অনেক প্রতিভাবান তরুণ এই সময় সমিতির কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং রাজেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বামনবাবুর সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তী জীবনে বামনবাবু মাহিলাড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। রাজেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রথমে হন মুনসেফ এবং পরে জেলা জজরূপে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর আবার তিনি সমিতিতে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দেন। কৃষ্ণ প্রসন্ন ছিলেন প্রতিভাধর তরুণ। বাঙালী জাতির মর্যাদা রক্ষার জন্য হুগলি কলেজের অধ্যাপক থাকা কালীন শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষের ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন। বর্তমানে ইনি শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুরের সম্প্রদায়ে 'কেষ্টদা' নামে পরিচিত।

কৃষ্ণপ্রসন্ন মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের মধ্যম পুত্র। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাপ্রসন্ন সমিতির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবনে এই পরিবারের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বিভূতিভূষণ বলতেন, রমাপ্রসন্নের লেখার শক্তি ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় সে লিখল না।

আর একজনের কথা না বললে শুধু কর্তব্যেরই অবহেলা হবে না, তদানীন্তন কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের ইতিহাসই কিছুটা অকথিত থেকে যাবে। তাঁর নাম কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন। ইতি 'বীরভূমি' পত্রিকার পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার, ডক্টর সুশীলকুমার দে প্রভৃতি অনেকের প্রথম দিকের বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কুলদাপ্রসাদ সমিতির কয়েকটি বিশেষ অধিবেশনে বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্য অবলম্বনে

পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল উদাত্ত ও গম্ভীর, বাচনভঙ্গি হৃদয়গ্রাহী।

তৃতীয় বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন সাধারণ অধিবেশনে বাঙলা দেশের তদানীন্তন সুধিসজ্জনরা সভাপতি ও বিশেষ বক্তা হিসাবে যোগ দিতেন। এঁদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

তখন সমিতির সাধারণ অধিবেশন হত মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটস্থ প্যারীচরণ বালিকা বিদ্যালয়ে, কখনও বা মেট্রোপলিটান কলেজে।

তৃতীয় বর্ষেই আমরা বঙ্কিম স্মৃতি সভার আয়োজন করি। সে সময় কলিকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাৎসরিক স্মৃতি পূজা হত না। আমাদের প্রথম বঙ্কিম স্মৃতি সভা হয় গোলদীঘিস্থ সিটি কলেজ হলে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রদ্ধেয় সমালোচক সুরেশচন্দ্র :সমাজপতি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের ছন্দে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর আমি একটি সঙ্গীত রচনা করি। গানটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস ও তার নায়ক-নায়িকাদের নাম সন্নিবেশিত ছিল। সভায় এই গানটি পরিবেশন করেন হেমচন্দ্র সেন। কলিকাতার বড় বড় সভা বিশেষ করে স্বদেশী সভার উদ্বোধন হত হেমবাবুর গাওয়া বন্দেমাতরম্ দিয়ে। পর পর কয়েক বৎসর ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতিথিতে আমরা তাঁর স্মৃতি পূজা করতাম। সভা হত থিয়জফিক্যাল সোসাইটি হলে। এই সব সভায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,সতীশ বিদ্যাভুষণ,বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন, নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু ও 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার প্রমুখ চিন্তানায়কগণ সভাপতি ও বক্তা হিসেবে উপস্থিত হয়ে বন্দেমাতরমের ঋষির স্মৃতি তর্পণ করতেন।

নারায়ণ বিদ্যারত্নকে তাঁর পিতা পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। ছেলেবেলায় শুনতাম তিনি পিতার অযোগ্য পুত্র। একটু পরিণত বয়সে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সান্নিধ্যে এসে দেখলাম এই ভদ্রলোক ভাগ্যবিড়ম্বিতদের একজন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত অত বিরাট পুরুষ নন

কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত, বিনয়ী, ভদ্র, সুবক্তা ও সাহিত্যের সমজদার। আজকের দিনে এতগুলি গুণের সমাবেশ খুব কম লোকের মধ্যেই দেখতে পাই।

শুনেছি পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর উইল পরিবর্তন করে নারায়ণচন্দ্রকে উত্তরাধিকার দেওয়া সঙ্কল্প করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শেষ পর্যন্ত সেটা কার্যে পরিণত হয় নি।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের বহু সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। এক বছর তিনি ছিলেন আমাদের স্থায়ী সভাপতি। কলিকাতার অভিজাতদের অন্যতম, অতি বড় সুপণ্ডিত, কিন্তু মানুষটি ছিলেন অতিশয় অমায়িক। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি এক ঘণ্টা কাল ব্যাপী ভাষণে একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতেন না।

বঙ্কিম-স্মৃতি সভায় অমৃতলাল বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকার তাঁদের দেখা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের অনেক কথা শুনিয়েছেন। তারা তাঁর পারিবারিক বিশেষ করে তাঁর হাকিমি জীবনের নানা গল্প করেছেন। থিওজফিক্যাল, সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাঙ্গালীদের মধ্যে সুপুরুষ দেখেছি অনেক। তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ-ই শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের রূপে কোমলতা ও মাধুর্য বেশি। আর বঙ্কিমচন্দ্রের রূপে ছিল তেজ, পুরুষোচিত একটা দার্ঢ্য ও বলিষ্ঠতা।

১৩২০ সালে কলিকাতার টাউন হলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সমিতি এই সম্মেলনে ছয়জন প্রতিনিধি পাঠান। তরুণদের মধ্যে ছিলাম আমি ও সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর বাড়িতে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের এক ভোজ সভায় আপ্যায়িত করেন। সুসঙ্গের মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ আর একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। শেষ অনুষ্ঠানটি হয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির পাশের জমিতে।

তাঁদের সৌজন্য ও অমায়িকতা অতিথিবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিল। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র ছিলেন দানবীর। তাঁর এবং মহারাজা কুমুদ চন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি সর্বজন বিদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবন মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতির জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তাঁর প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে লালগোলার মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও মহোদয়ের অর্থে বর্তমান সাহিত্য পরিষদ ভবন নির্মিত হয়।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বর্ষে যথাক্রমে সমিতির স্থায়ী সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

দ্বিতীয় বর্ষ থেকে অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় প্রথমনাথ তর্কভূষণ, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি মণীষিগণ। আমরা তখন তরুণ। জজ, ব্যারিস্টার ও বিখ্যাত সুধিগণের নিকট গিয়ে যে অমায়িক ব্যবহার পেয়েছি আজ আমাদের সমাজ থেকে সে অমায়িকতা লোপ পেতে বসেছে।

সমিতির অষ্টম বর্ষের শেষভাগে আমার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের ফলে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তখন কয়েক মাস আমাদের নিয়মিত অধিবেশন বন্ধ থাকে।

এই সাত বৎসর সভা হয়েছে, প্রবন্ধ পাঠ হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। অনেক রথী-মহারথীদের সংস্পর্শে এসে আমরা ধন্য হয়েছি কিন্তু অধিকাংশ সভ্যের মধ্যে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির কোন প্রেরণা ছিল না। যে সব প্রবন্ধ নিবন্ধ পঠিত হত সেগুলি উঁচু দরের সৃষ্টির পর্যায়ে উপনীত হতে পারে নি।

এই সময় সর্বশ্রী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুশীলচন্দ্র মিত্র প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত, সোমনাথ মৈত্র, কান্তিচন্দ্র সেন, সুরেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি তরুণ সাহিত্য রসিকগণ সমিতিতে একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। এঁদের অনেকেরই লক্ষ্য ছিল সাহিত্য সৃষ্টি। নীরদরঞ্জন একাঙ্ক নাটিকা লিখে পড়তেন। সেগুলো একাধিক পত্রপত্রিকায় স্থান পেয়েছে। সুশীলচন্দ্র মিত্র পড়তেন সারগর্ভ প্রবন্ধ। তাঁর রচিত ও সমিতিতে পঠিত রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাঁর পরবর্তী গবেষণার মূল উপাদান। এই গবেষণার জন্য পরে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও বহু সভার কার্যে অংশ গ্রহণ করে সমিতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন। কান্তিচন্দ্র সেন 'বাজে তর্ক' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র সেন ছিলেন তীক্ষ্নধী সমালোচক।

এই সময়ের আরও একজনের নাম না করলে সমিতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার নাম সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত। তিনি আজ মহীশূর হাইকোর্টের

প্রধান বিচারপতি। সুবোধরঞ্জন একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং কোন বিষয়ে আলোচনা হলে তাতে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত যোগ দিতেন।

সুশীলচন্দ্র মিত্র, নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত ও প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্তের সাহচর্যে 'লেখা' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। সুশীল আজ ইহ জগতে নেই। প্রমোদরঞ্জন এবং কান্তিচন্দ্রও সাহিত্য জগতে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন কিন্তু পরে তাঁরা আর সাহিত্যের সেবা করেন নি। নীরদরঞ্জন তাঁর সাহিত্য-সেবা অক্ষুন্ন রেখেছেন। নাটক তিনি কম লেখেন, কবিতা মোটেই নয়। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'সুশান্ত-সা' তাঁকে সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত করেছে। সুরেশচন্দ্র বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেনামী প্রবন্ধাদি লিখে তাঁর সাহিত্য চর্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

বরিশালের কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বৈদান্তিক শরৎচন্দ্র ঘোষ এই সময় আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সমিতিকে চলার পথে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সুকবি হেমচন্দ্র ছিলেন সুকণ্ঠ। অগ্নিযুগের বিখ্যাত মুকুন্দদাসের গানের প্রায় সবগুলি তাঁর লেখা। শরৎচন্দ্র ঘোষের বেদান্ত সম্পর্কে বক্তৃতা শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করে রাখত। মধুর ভাষা, উদাত্ত কণ্ঠ এবং সুগভীর পাণ্ডিত্য দিয়ে তিনি তখনকার বাঙালী সমাজে শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। পরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন বলে শুনেছি।

এই সময় আমি প্রথম গল্প লিখতে আরম্ভ করি। এবং 'রাজার বানর' ও 'দরিদ্রের ক্ষুধা' নামে দুটি স্যাটায়ার লিখি। সুশীল, নীরোদ, প্রমোদ প্রভৃতি বন্ধুগণ গল্প দুটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন স্যাটায়ার লেখক হিসাবে আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাঁরাই উদ্যোগ করে বীরবলকে সভাপতি করে আনেন। আমি খুব উৎসাহিত হয়ে গল্প দুটি পাঠ করি বীরবল গল্প সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করলেন না। আমিও নিরাশ হয়ে স্যাটায়ার লেখা ছেড়ে দিই। গল্প লেখক হিসাবে এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেদিনের সভায় বীরবলের উপস্থিতি ও সাহিত্য সম্পর্কে তার ভাষণ সমিতির সভ্যগণের মধ্যে একটা নব প্রেরণার সঞ্চার করে। সেদিন মনে হয়েছিল এরূপ পরশপাথরের স্পর্শেই বুঝি মানুষ-লোহা সোনায় পরিণত হয়।

সমিতির কাজ কিছুদিন বেশ জোর চলতে থাকে। নীরদরঞ্জন প্রায়ই একাঙ্ক নাটিকা পড়তেন। নাটিকার ভিতর স্বরচিত গানগুলি গাইতেন। সুশীল পড়তেন প্রবন্ধ। বেশির ভাগ লেখা নিয়েই আলোচনা করতেন প্রমোদরঞ্জন।

এই সময় সমিতি একটা বিপদের সম্মুখীন হয়। উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে

একদল প্রস্তাব করেন সাহিত্য সেবক সমিতি নামটি বড় সেকেলে, ওটা বদলে দেওয়া হোক। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি অতি আধুনিক নাম প্রস্তাবিত হয়, তার একটিও আজ আমার মনে নেই। তবে এঁদের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন সাহিত্য সেবক নামটি বড় মিষ্টি, এর মধ্যে বিনয় মিশ্রিত গাম্ভীর্যের আভাস আছে। আর তা ছাড়া এই নামকে কেন্দ্র করে একটা ঐতিহ্যও গড়ে উঠেছে।

এই নিয়ে দুদিন তর্ক হল, পরে ভোট গৃহীত হয়। জোর ক্যানভাসিংও চলেছিল। শেষ পর্যন্ত সাহিত্য-সেবক সমিতি নাম রাখার পক্ষপাতীরাই জয়ী হন। বিরোধীদল সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও তাঁদের উৎসাহে বেশ ভাঁটা পড়ে। এমনও আশঙ্কা হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি আর বুঝি টিকবে না।

১৯১৯ সালে সমিতির সভ্যবৃন্দ য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'ভীষ্ম', ও চীনা নাটক 'চাউচি কাউয়েল' অভিনয় করেন। প্রবাসীতে এই চাউচি কাউয়েল'—এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক উপেন্দ্রনাথ মৈত্র।

নীরোদরঞ্জন ভীষ্মের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাঁর ভাই প্রমোদরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর তৃতীয় ও চতুর্থ ভ্রাতা এবং শ্রীসরোজকুমার সরকার নারী-ভূমিকায় অভিনয় করেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন সাত্যকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এরপরে আসে গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন। সমিতির কর্মীরা অনেকেই সেই মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সমিতির সভা মাঝে মাঝে বসত বটে কিন্তু কর্মীরা তখন ব্রত নিয়েছেন মাতৃভূমিকে পরাধীনতার নিগড় থেকে মুক্ত করার। সাহিত্যের ডাকের চেয়ে এই ডাক তখন জোরালো। একদল আগে থেকেই সমিতির নামকরণ নিয়ে ভগ্নোদ্যম হয়েছিলেন। একদল নামলেন মুক্তি সংগ্রামে। সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাঁরা মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন, তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস ও তাঁর সহকর্মী শ্রীকালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজরোষের ভয়ে তৃতীয় দল সমিতির সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করলেন।

এক বৎসরের মধ্যে গান্ধীজীর প্রতিশ্রুত স্বরাজ না আসায় কোন কোন কর্মী অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কিছুটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। পুনরায় সাহিত্য সেবায় ফিরে আসেন তাঁরা। নতুন একদল উৎসাহী সাহিত্যরসিককে পেয়ে সমিতি আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ সেন অন্যতম। এই প্রসঙ্গে এ্যাটর্নি দাশরথি সোম, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও সত্যশরণ ঘোষের নাম আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। ধীরেন্দ্রনাথ সেন আজ ডক্টর

ধীরেন্দ্রনাথ সেন নামে বিশেষ পরিচিত। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মতামতকে দেশবাসী শ্রদ্ধা করেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। দাশরথি এবং সত্যশরণ পরে আর সাহিত্য সেবা করেন নি।

শ্রীনাদেল্লা কুটুম্বরাও নামে এক তেলেগু তরুণ সমিতির সভ্য হয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই বাঙলা শেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভক্ত হয়ে পড়েন। রাও বলতেন, বাঙলা জেনে নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। তার জন্য সমিতির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমানে তিনি অন্ধ্রদেশের বিখ্যাত কবিরাজ।

এরপর সমিতিতে যোগদান করেন কল্লোলের তরুণ সাহিত্যসেবীরা। এঁরা ছিলেন নবযুগের উদগাতা। সাহিত্যকে এঁরা নতুনএকটা পথে পরিচালনা করতে চান। মুক্ত করতে চান রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব থেকে। এক কথায় বলা যায় এঁরা ছিলেন সাহিত্যে বিদ্রোহী দল। একজন বিদ্রোহী কবি লিখলেন—'সম্মুখে রয়েছে বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর।'

স্বর্গীয় দিনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত মাসিক পত্র 'কল্লোল'কে কেন্দ্র করে এই এই তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব। এঁদের মধ্যে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য ও প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি তরুণ লেখকেরা বাঙলা সাহিত্যে এক নব-প্রেরণার সঞ্চার করেন।

এঁদের অগ্রণী 'কয়লাকুঠী'র শৈলজানন্দ একদিন আমার ডিসপেনসারিতে এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল না; তিনি বললেন, ভারতবর্ষে আপনার গল্প 'শরতের মেঘ' পড়ে দেখা করতে এলাম।

যতদূর মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে কবি সুবল মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। শৈলজার সঙ্গে অল্প কয়েকদিনেই বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠল। তিনি প্রায় রোজই আসতেন। তাঁর জন্য প্রেমেন, অচিন্ত্য, প্রবোধ সান্যাল এঁরাও এসে আড্ডা জমাতে লাগলেন। সেই আড্ডা যেন সমিতিরই এক একটি ক্ষুদ্র (Miniature) বৈঠক। প্রায় রোজই হত দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন। দেশী-বিদেশী সাহিত্যিকদের নূতন লেখা, তাঁদের জীবনী, তাঁদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে প্রায় প্রত্যহ যে অধিবেশন হত, পনরদিন অন্তর সমিতির নিয়মিত অধিবেশন যেন ছিল তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডিসপেনসারি ঘরের একটা সিঁড়িতে পা রেখে বৈঠক জমাতেন। স্বভাব স্নিগ্ধ রসিকতায় বৈঠকটিকে সরস করে রাখতেন হাস্য-পরিহাস ও Pun দিয়ে।

সাহিত্যিকদের এই ধরনের আড্ডা আজকাল কোথাও জমে কিনা জানি না।

তখন 'বিচিত্রা'য় 'পথের পাঁচালী' বেরুচ্ছিল। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বিভূতিবাবুকে আমাদের আড্ডায় নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হলেন 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিবাবু।

বাঙলার উপন্যাস সাহিত্য এতদিন যেন ছিল ধনী ও মধ্যবিত্তের জীবনালেখ্য। ধনীর বৈঠকখানার ও বালিগঞ্জের নূতন এরিস্টোক্রেসির ড্রইংরুমে বসত তার আসর। সুন্দর, শিক্ষিত, সুবেশ তরুণ-তরুণীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে ছিল তার কারবার। জিনিসটা পাঠক সমাজের কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। এই সময় বিভূতিবাবু আনলেন Relief, পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরলেন বাঙলা পল্লীর শ্যাম-স্নিগ্ধ রূপ। পাড়াগেঁয়ে দুর্গা ও সব জয়া আমাদের চিত্ত জয় করল। বিভূতি-ভূষণের কলমও ছিল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মতই—সহজ ও সরল।

অল্পদিনের মধ্যেই বিভূতিবাবুও আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। রোজই আসতেন, গল্প করতেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁর আলোচনার বিষয় থাকত প্রকৃতি। প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সামান্য চেষ্টা করলেই, আমরা পরলোকগত আত্মার সান্নিধ্যলাভ করতে পারি।

এই সময় আসেন শৈলজার বন্ধু শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ বাঙলার 'পবিত্রদা'। জলধর দা ও নরেনদার (শ্রদ্ধেয় শ্রীনরেন্দ্র দেবের) পরে বাঙলা সাহিত্যে এ রকম দাদার রূপ নিয়ে আর কেউ আসেন নি। পবিত্রর সঙ্গে কয়েকবার কাজি নজরুল ইসলাম এসেছিলেন। তিনি সমিতির অন্তরঙ্গদের একজন হয়ে ওঠেন নি ঠিকই—কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও চরিত্র মাধুর্য সেকালের সমিতির সদস্যদের মধ্যে আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। যতদূর মনে পড়ে শ্রীবুদ্ধদেব বসু এবং কবি শ্রীঅজিত দত্তও দু'একদিন আমাদের বৈঠকে এসে-ছিলেন। তবে তাঁদের আমরা একান্তরূপে পাই নি।

শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য প্রমুখ সাহিত্যরথীরা সমিতির নিয়মিত পাক্ষিক সভায় গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা পড়তেন, আলোচনা করতেন। খ্যাতিমানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গল্প পড়েছিলেন শৈলজানন্দ। তিনিই তখন ছিলেন সমিতির মধ্যমণি। 'কল্লোল', 'কালি-কলম' বাঙলা সাহিত্যে সে ভাববন্যা বইয়ে দেয়—সেই বন্যার অন্যতম উৎস ছিল সাহিত্য-সেবক সমিতি।

একদিন শ্রীমনোজ বসুর গল্প পাঠের পর সমিতির কোন বিশিষ্ট সদস্য বলে উঠলেন, মনোজবাবু আপনার কলমটা আমাকে দেবেন?

মনোজবাবু ভেবেছিলেন কয়েক ছত্র লেখার জন্য হয়তো কলমটি চাওয়া হয়েছে। সাহিত্যরসিক এই ভদ্রলোকটি কলমটি পকেটে পুরলে মনোজ ও আমরা অনেকেই বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক বললেন, এটি থাকলে আমিও ভাল লিখতে পারব, তাই কলমটি নিলাম।

বলা বাহুল্য এই প্রস্তাবে খুশি হলেও মনোজ কলমটা হাতছাড়া করেন নি।

ব্রহ্মা বড়, কি বিষ্ণু বড় এই নিয়ে যেমন ভক্তদের মধ্যে আগের যুগে লড়াই হত, আমাদের এই আড্ডায়ও শৈলজা বড় কি প্রেমেন বড়, কার প্রতিভা বেশি উজ্জ্বল, এই নিয়ে তাঁদের দুই ভক্তের মধ্যে একদিন হাতাহাতি হয়ে গেল। এক ভক্ত ডিসপেনসারির চৌকির উপর চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন। আর তাঁর বিরোধী বৈঠকখানার সিঁড়িতে পা রেখে পর মুহূর্তেই আগের মত হাস্য পরিহাস পরিবেশন করতে লাগলেন।

গ্রীষ্মকাল। বেলা চারটে হবে। ভক্তদের দেবতাদের তখনও আবির্ভাব হয় নি। সামনে কতকগুলো ঠিকা গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তায় ভিড় জমে গেল। গাড়িগুলোর ওপাশ থেকে পথচারীরা এই দৃশ্য উপভোগ করছেন।

সামনের ষ্ট্যান্ড থেকে ধুলো উড়ে আসছে; বাতাস বেশী থাকলে আসে ঘাসের টুকরো। উগ্র কটু গন্ধের ত কথাই নেই। তবু তরুণ প্রতিভাধর সাহিত্যিকরা কিসের আকর্ষণে যে ঘণ্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন আজও তা বুঝে উঠতে পারি নি।

এর কিছু দিন পরে আমাদের আড্ডায় এলেন প্রতিভাধর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর সৌম্য মূর্তি, দৃঢ় বলিষ্ঠ-গঠন। তাঁর উজ্জ্বল দুটি চোখ সবাইকে আকৃষ্ট করত। অল্প কয়েকটি গল্প লিখে এর মধ্যেই তিনি প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। সমালোচকরা এই তরুণকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। প্রথম থেকেই তাঁর সাহিত্যে বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর ছিল, ছিল, একটা অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য, নর ও নারীর গভীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে তাঁর কারবার। এ বিষয়ে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র স্রষ্টার তুলনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। ক্রমে ক্রমে তিনি সমিতির অন্তরঙ্গদের একজন হয়ে ওঠেন। বহু বন্ধু থাকলেও মানুষটি ছিলেন একান্তই নিঃসঙ্গ। তাঁর মত সাহিত্য স্রষ্টাদের চরিত্রের ধরণই বোধহয় এইরূপ।

দেড় যুগ পরের কথা, মহারাজ কুমার স্নেহাংশু আচার্যের ভবনে রুশ ডেলিগেটদের অভিনন্দন দানের উৎসবে মাণিক ছিলেন বাংলা সাহিত্যিকদের মুখপাত্র। সেখানে তিনি বাংলায় বক্তৃতা করেন। স্নেহাংশুবাবু তাঁর ইংরেজি

তর্জমা শোনালেন। এই অনুষ্ঠানেও মাণিকবাবুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ না করলে সমিতির ইতিহাসে ত্রুটি থেকে যাবে। তিনি হলেন 'বিবাহ-মিলন-কথা' ও 'জতুগৃহ'-এর লেখক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই আনুকূল্যে আমরা শরৎচন্দ্রকে পাই। হীরেনবাবু ছিলেন বৈঠকের একজন ক্লান্তিহীন দৈনন্দিন সভ্য। লোকটি যেমন প্রকৃতি রসিক, তেমনি সাহিত্য রসিক।

কিছু দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ মৈত্র সমিতিতে যোগ দেন। এর আগেই তাঁর 'থার্ড ক্লাশ' পাঠক সমাজে সুপরিচিত হয়েছে। সমিতির সভ্য থাকাকালীন তিনি 'মানময়ী গার্লস স্কুল' লেখেন এবং এই নাটক তাঁকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলে। তিনি ছিলেন একাধারে সুসাহিত্যিক ও সমাজ-সেবী। তাঁর কয়েকটি গল্প শুনে সভ্যরা বিশেষ প্রীত হন। দুঃখের বিষয় এই শক্তিমান লেখক অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আর একজন ছিলেন সুধীর দাশগুপ্ত। আমাদের বৈঠকে তিনি যোগ দিতেন, কোন অধিবেশনেই তিনি বক্তৃতা দেন নি। কিন্তু নিত্যকার বৈঠকে সাহিত্য সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করতেন, সকলেই তা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতেন। তিনি ছিলেন সাহিত্য ও রাজনীতির একনিষ্ঠ পাঠক ; সাহিত্যরসিক ও খাঁটি সমজদার। অকালেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

হাওড়া থেকে আসতেন আর একদল তরুণ সাহিত্য-সেবী। তাঁরা হলেন, ডাঃ রঞ্জিৎ দাশগুপ্ত, শ্রী জগৎ মিত্র, শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সন্ন্যাসীচরণ সাধুখাঁ। তাঁরাও কিছু কিছু গল্প-কবিতা পড়েছেন।

এই সময় সমিতির পাক্ষিক অধিবেশন হত বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের গোপেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে। তিনি ছিলেন একজন বিলাত ফেরত ইঞ্জিনীয়র। তাঁর সঙ্গে কলেজে পড়তুম, তখন আলাপ হয় নি। কবিরাজ হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হল তিনি বিলেত থেকে আসার পর। যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, গোপেনবাবু ছিলেন তারই অনুরাগী। সমিতির কথা শুনে, এবং কার্য-বিবরণী পড়ে তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হন। নিজের বাড়িতে অধিবেশনের স্থান দেন। কিছুদিন বাদে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। দু-একটা গল্পও তিনি সমিতির অধিবেশনে পাঠ করেছেন। তিনি প্রায়ই আমাদের আড্ডায় আসতেন। তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ মধুর ব্যবহারে সকলেই গোপেনবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হতেন।

পূর্বে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁরা সকলেই সমিতিতে গল্প, প্রবন্ধ ও

কবিতা পড়েছেন, আবৃত্তি করেছেন। সুসাহিত্যিক শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায় ও আসতেন। গল্প পড়তেন, প্রবন্ধ পড়তেন।

কিছুদিন পরে সর্বশ্রী প্রণব রায়, পাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায়, হেম বাগচী, সুনীল ধর, ফণী পাল প্রভৃতিকে আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ ভাবে পাই। প্রণব রায় ও হেম বাগচী গল্প আর কবিতা পড়তেন, পাঁচুগোপাল পড়তেন গল্প। সুনীল ধর ব্রাউনিং সম্বন্ধে সুন্দর একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। 'শরৎ সাহিত্যে যৎকিঞ্চিৎ' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন শ্রী আশিস গুপ্ত, সভাপতি ছিলেন শ্রী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঐ সভায় সর্বশ্রী শৈলজানন্দ, প্রবোধ সান্যাল, কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। লেখাটি পরে বেরিয়েছে কৃষ্ণেন্দুবাবুর 'স্বদেশ' পত্রিকায়। এই সময় হাস্যরসাত্মক গল্প ও কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত সুসাহিত্যিক সতীশচন্দ্র ঘটক প্রায়ই আমাদের বৈঠকে যোগ দিতেন এবং গল্প ও কবিতা পাঠ করতেন।

কখনও কখনও তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন। তাঁর বাড়িতেও (বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটস্থ) অনেক অধিবেশন হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনীকার শ্রীরবিদাস সাহা রায় এই সময় সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি গল্প পড়তেন। কবি দীনেশ মুখোপাধ্যায় পড়তেন কবিতা।

নিধিরাজ হালদার ও শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণও আমাদের সভাগুলিতে প্রায়ই যোগ দিতেন। নিধিরাজবাবু পড়েছিলেন তাঁর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কাহিনী। সচিত্র এই কাহিনী সেই সময় মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল, খুব সম্ভব 'ভারতবর্ষ'-এ। ভুল বোঝাবুঝির জন্য নিধিরাজবাবু সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করেন।

প্রবীণ সাব-ডেপুটি কালেক্টার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন উৎসাহী সভ্য। তিনি পর পর কয়েকটি গল্প পড়েছেন। একবার তাঁর লেখার রূঢ় সমালোচনার ফলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমিতির সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন। তারপর মাত্র একটি সভায় এসেছিলেন। সেই সভায় আমার মাতাঠাকুরাণীর স্বর্গারোহণের জন্য শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন সমিতির পরিচালক-সংস্থার কোন সদস্যের পরিবারের কারও মৃত্যু হলে সমিতির পরবর্তী সভায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হত।

শৈলেশবাবুর সঙ্গে আসতেন আর একজন তরুণ সাব-ডেপুটি শ্রীনীহার চক্রবর্তী। তিনি প্রায় প্রতি সভায়ই আলোচনায় যোগ দিতেন। তাঁর মতন

তীক্ষ্ণধী সমালোচক খুব কমই দেখেছি। শৈলেশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সমিতিতে যাতায়াত কমিয়ে দেন।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, জনাব জসিমউদ্দিন, জনাব বন্দে আলি মিঞা, প্রভাতকিরণ বসু, অধ্যাপক আশুতোষ সান্যাল, ইন্দ্র সেন, জনাব কাদের নওয়াজ প্রভৃতি পড়তেন কবিতা। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ যথেষ্ট কবিখ্যাতির অধিকারী হয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় কবি নরেন্দ্র দেব ছিলেন আমাদের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজন। তিনি বহু সভার কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। নরেনদার সঙ্গে দু একটি অধিবেশনে রাধারাণী দেবীও যোগ দেন। তাঁর কবি প্রতিভা পাঠকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত।

আর একটি তরুণ কবি সমিতিতে মধ্যে মধ্যে কবিতা পড়তেন। 'অষ্টাদশী'র কবি হিসাবে আমরা প্রথমে তাঁর পরিচয় লাভ করি। তিনি প্রায়ই আড্ডায় আসতেন। এই তরুণ কবি বর্তমানে অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য নামে বিশেষ পরিচিত।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এই সময় একখানি স্বরচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক পাঠ করেন। নটসূর্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী সেই সভায় সভাপতির ভাষণে নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় পান্ডিত্যের পরিচয় দেন। কবি গিরিজা বসুর নেতৃত্বে নাটক খানি মঞ্চস্থ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু তা আর কার্যে পরিণত হয় নি। আর এক সভায় নীরদবাবু 'কর্তারানী' নামে একখানি একাঙ্ক নাটক পাঠ করেন। ঐ সভার সভানেত্রী স্বর্গীয়া কামিনী রায় এবং শ্রোতৃবর্গ তাঁর রচনা ও পঠন ভঙ্গিতে বিশেষ মুগ্ধ হন।

কবি সুবল মুখোপাধ্যায় প্রায় প্রতি সভায়ই আবৃত্তি করতেন। বাঙালী কবিদের বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত কবিতাই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। গৌরবর্ণ ঋজুদেহ এই সুবল একদিন আমাদের সঙ্গ ছেড়ে কোথায় যে চলে গেলেন তা কেউ জানে না। আজও তিনি নিরুদ্দেশ। এক এক সময় বড় ইচ্ছে হয় তাঁকে দেখতে।

আর একজন তরুণ কবির কথা না বললে সে যুগের সাহিত্য সেবক সমিতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর নাম সুকুমার সরকার। সুদর্শন, সুবেশ এই কবি নিজের খেয়াল খুসি মত চলতেন। আজ আসতেন গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি চড়িয়ে, হাতে সোনার হাতঘড়ি বেঁধে। আঙুলে থাকত দামী পাথর বসান আংটি। দুদিন পরেই হয়তো মলিনবেশে এসে উপস্থিত। ঘড়ি নেই, বোতাম

নেই আংটি নেই। দিন দশ পরে হয়তো আবার আসতেন সিল্কের পাঞ্জাবী পরে সোনার ঘড়ি হাতে বেঁধে, আংটি পরে।

অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি। সুন্দর আবৃত্তি করতেন। কবির অকাল মৃত্যুর পর তাঁর কোন এক বন্ধু নিজ নামে তাঁর কবিতা গুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করতেন। সুকুমারের সঙ্গে আর একজন তরুণ কবি আসতেন, সখানাথ দাশগুপ্ত, তিনিও অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সুকুমারের মৃত্যুর পর সমিতির কার্যনির্বাহক সংস্থা স্থির করেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলির একটি সংকলন প্রকাশ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটিও গঠিত হয়। কমিটিতে শ্রী নরেন্দ্র দেব ও নজরুল ইসলাম প্রমুখ আমরা কয়েকজন ছিলাম। কবিতা নির্বাচনের ভার পড়ে কবি শ্রী নরেন্দ্র দেবের উপর। তিনি কবিতা নির্বাচনও করেছিলেন, কিন্তু বইখানি আর বের হয়নি। তার কারণ একটু বিচিত্র। সুকুমার তার কবিতাগুলো শ্রী প্রবোধ সান্যালকে উৎসর্গ করেছিলেন। সাব-কমিটির একজন শক্তিশালী সদস্য বলে বসলেন, প্রবোধের নামে বই উৎসর্গ করা চলবে না। আমি বললাম, আমাদের সুকুমারের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হতে দাও। কিন্তু বন্ধুটি রাজী হলেন না। আমাদের নিজেদের মতানৈক্যের ফলে সে বই আর বের হয়নি।

বছর দু-তিন পরে সুকুমারের আত্মীয়রা বরিশাল থেকে এসে কবিতাগুলি চান। অনেক কষ্টে তা উদ্ধার করে দেওয়া হয়। তাঁরা কবিতা সংকলন প্রকাশ করবেন বলেও ছিলেন। কিন্তু যতদূর জানি সে বই আর বের হয় নি।

স্বর্গীয়া কবি কামিনী রায় পর পর দুবছর আমাদের সমিতির সভানেত্রী ছিলেন। সমিতির সভ্যদের তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর বাড়িতে একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের দর্শন লাভ করি। আচার্যদেবের সঙ্গে সামার পরিচয় করিয়ে দিয়ে সভনেত্রী তাঁর কাছে সমিতির কথা বলেন। আচার্যদেব কী এক সুমধুর কণ্ঠেই না আমাকে এবং সমিতিকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

কামিনী রায়ের সভাপতিত্বে গোপেনবাবুর বাড়িতে এক সভায় বিভূতিভূষণ পরলোকতত্ত্ব নিয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি পরলোকগত আত্মার অস্তিত্বে শুধু বিশ্বাসীই ছিলেন না, তিনি বলতেন, সাতটি বিভিন্নস্তরে এই আত্মারা বাস করেন, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তরে খুব কম লোকই যেতে পারে। এই দুই স্তর পবিত্রতম আত্মার বাসস্থান, তিনি আরও বলতেন আমরা যাঁদের মহাপুণ্যবান বলে মনে করি তাঁদের আত্মা হয়তো নিম্নস্তরে রয়েছেন আর যাঁদের তত শ্রদ্ধার আসনে বসাই নি

তাঁরা হয়তো উপরের স্তরে চলে গেছেন। বিভূতিবাবুর প্রবন্ধে প্লানচেটে আত্মা আসারও উল্লেখ ছিল।

সভানেত্রী এসব বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেন, বিলেতে এক বা দু-গিনি দক্ষিনা দিয়ে প্লানচেটের আসরে গিয়ে দেখেছি। ওটা একটা বুজরুকি মাত্র।

তিনি পরলোকতত্ত্বে অবিশ্বাস করায় বিভূতিভূষণ সভার শেষে আমাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

কামিনী রায় সভানেত্রী থাকাকালীন কবি জসিমউদ্দিনকে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম। জসিমউদ্দিনের সঙ্গে এসেছিলেন সুগায়ক আব্বাসউদ্দিন। তাঁর মুখেই আমরা প্রথম ভাটিয়ালি গান শুনি। সুকণ্ঠ সুশ্রী গায়ক। শ্রোতাদের সামনে যেন নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের একটা ছবি তুলে ধরতেন।

'পথের পাঁচালী' প্রকাশের কিছুদিন পরে ১৯২৯ সালে ঐ বই নিয়ে এক আলোচনা সভা হয় গোপেনবাবুর বাড়িতে, রায়বাহাদুর জলধর সেন সভাপতি। শ্রী নীরদ চৌধুরী, ডক্টর সুশীল মিত্র, নীরদরঞ্জন-দাশগুপ্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত দাস, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,অবিনাশ ঘোষাল, নরেন্দ্র দেব ও এই নিবন্ধের লেখক সভায় আলোচ্য উপন্যাসটির বিশেষ সুখ্যাতি করেন। তাঁরা বলেন, 'পথের পাঁচালী' বাংলাদেশের উপন্যাসে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত বিভূতিবাবুর অনুরোধে আলোচ্য বই থেকে কিছুটা পাঠ করে শোনান। যতদূর মনে পড়ে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই সভার কার্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীসজনীকান্ত শনিবারের চিঠিতে একটি কবিতায় এই আলোচনা সভার বিবরণী প্রকাশ করেন। কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে ঐ দিন 'পথের পাঁচালী' দিবস নামে পরিচিত। এর পরে সমিতি অনুরূপ আরও কয়েকটি দিবসের আয়োজন করেন। কলকাতায় আমাদের প্রতিষ্ঠান এ ধরনের 'ডে' বা দিবসের প্রবর্তক। তখন সম্পাদক ছিলেন শ্রী অবনীনাথ রায়। তিনি সাহিত্যরসিক সমাজে মিরাটের অবনী রায় নামে খ্যাত। ভারত সরকারের অধীনে ভাল চাকরী করতেন তিনি। কিন্তু তাঁর মন সারাক্ষণই সাহিত্যের সুরে বাঁধা থাকত। যে সব সাহিত্যপ্রাণ লোক দেখেছি, অবনীবাবু শুধু তাদের একজনই নন, তিনি তাঁদের অগ্রণী। সুরেন ভট্টাচার্যের পর একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে আমরা তাঁকেই পাই।

দু-বছর সমিতির কর্ণধার ছিলেন সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র। সভাপতি থাকা কালীন তিনি দু-বার আমাদের সাধারণ সভায় যোগদান করেন। দুটি সভাই

হয় গোপেনবাবুর বাড়িতে। উঠান ও চারিদিকের বারান্দা লোকে ভরে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র সভায় দীর্ঘ প্রবন্ধ-পাঠ বা বক্তৃতা পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন আসর জমানোর মানুষ। বৈঠকী গল্প বলতেন। দুদিনই গল্পচ্ছলে তিনি আমাদের কাছে অনেক কথা বলে গেলেন। সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখলে বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী সম্পদ হত। এই দুদিনই তিনি নিজের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। নিজের কথা তিনি কখনও বলতেন না। এ বিষয়ে তাঁর মত শালীনতা সম্পন্ন লোক সাহিত্য জগতে খুব অল্পই দেখেছি।

এরপর শ্রী নীহার পালচৌধুরী সমিতির সম্পাদক হন। আমাদের সভায় তিনি 'পশু' ও 'চটকল' নামে দুখানি স্বরচিত আধুনিক নাটক পাঠ করেন। নাটক দুখানি পরে প্রকাশিত ও সুধী সমাজে বিশেষ প্রশংসিত হয়।

'চাঁদ মুখ'-এর লেখক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 'গল্প লহরী' সম্পাদক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রায়ই আমাদের সভায় যোগ দিতেন। আর একজনও প্রায়ই আমাদের সভায় গল্প ও কবিতা পড়তেন। তাঁর নাম শ্রীকরুণাশঙ্কর বিশ্বাস।

সমিতির অধিবেশনগুলো বাইরের অনেককেই আকৃষ্ট করত। সুন্দর গল্প ও কবিতা পাঠ, নানা বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা ছিল আকর্ষণের প্রধান কারণ। তীক্ষ্ণধী প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, সজনীকান্ত, মাণিক প্রভৃতির সাহিত্য আলোচনা এবং উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখত।

কয়েক বৎসর আমরা আরও একজনের আনুকূল্য পাই। তাঁর নাম নরেন্দ্র নাথ বসু মল্লিক। তিনি ছিলেন শ্রী গোপাল বসু মল্লিকের বংশধর। বাংলাদেশে 'মণি-পুরী নৃত্য' ও 'কথাকলি' নৃত্য তাঁরই চেষ্টায় প্রচলিত হয়। নরেনবাবুর বাড়িতে সমিতির কয়েকটি অধিবেশনও হয়েছিল। তার মধ্যে দুটি অধিবেশনে শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সভানেত্রীত্ব করেন। উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আরও একজন সঙ্গীত-রসিককে আমরা পেয়ে ছিলাম। তাঁর নাম স্বর্গীয় জ্ঞান গোস্বামী। তিনি সঙ্গীত-রসিক মহলে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করে গেছেন। গোপেশ্বরবাবু ও স্বর্গীয় গোস্বামী মহাশয় গায়ক হিসাবে বাংলাদেশে সুপরিচিত। উপেনবাবুর নাম আজকাল কেউ জানেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। বয়স নব্বইয়ের উপর। সেই সময় তিনি গাইতেন, বাজাতেন। তাঁর রচিত ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক ছোট

ছোট কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ আমেরিকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদকরা বহু মূল্যে ক্রয় করেছিলেন।

এই সময় সমিতির উৎসাহী সভ্য শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমানে চলচ্চিত্রের ডিরেকটর রূপে সুপরিচিত) একআনা মূল্যের 'সাপ্তাহিক কথা ও কাহিনী' সিরিজ প্রকাশ করেন। এর প্রতি সংখ্যায় সমিতির লেখক-লেখিকাদের এক একটি গল্প প্রকাশিত হত। অতি অল্পদিনের মধ্যে 'কথা ও কাহিনী'জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সমিতির সভায় অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের বহু তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন। সেগুলি শুধু আমাদের সমিতির ইতিহাসকে নয়, বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যকেও সমৃদ্ধতর করেছে।

আজ একটি বিশেষ দিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিন সন্ধ্যায় সমিতির অধিবেশন হওয়ার কথা। বেলা ৪-টা নাগাদ গোপেন বাবু এক চিরকুট পাঠালেন: কবরেজ মশাই, আজ আমাদের সভায় অনুরূপা দেবী আসছেন। যাতে লোকজন হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

কাছাকাছি যাঁরা থাকেন তাঁদের খবর দিয়ে পরিচিত অপরিচিত চোদ্দ পনের জন সঙ্গে নিয়ে সভাস্থানে উপস্থিত হলাম। শেষ পর্যন্ত উপস্থিত সভ্যসংখ্যা পঞ্চাশে পেঁাছেছিল। কিছুক্ষণ পরে অনুরূপা দেবী এলেন, পরণে লাল পেড়ে শাড়ী, সাদা জমিন, গায়ে সাদা ব্লাউজ, সাদা সিধে বেশভুষা, দেখে বড়ই শ্রদ্ধা হল। সেদিন ছিল গল্প কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির প্রোগ্রাম।

অনুরূপা দেবীকে অতি অল্প সময়ের জন্য পেয়ে আমরা খুসি হতে পারিনি। চেয়েছিলাম তাঁর আরও সান্নিধ্যে আসতে, স্থির হলো পরের রবিবারই তাঁর জন্য সমিতির এক বিশেষ সভা আহ্বাণ করা হবে।

সভা হল। এবং এই সভায় ডঃ সুশীল মিত্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনুরূপাদেবী হলেন সভানেত্রী। তিনিও নাতিদীর্ঘ একটি ভাষণ লিখে এনেছিলেন। সমিতির সে এক স্মরণীয় দিন।

এই সময় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে যোগদেন। বয়সে তরুণ সাহিত্যে একেবারেই নবাগত। সমিতিতে তাঁর প্রথম পঠিত গল্প শুনে শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশংকর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সমিতির এই দিনের সভার কথা তারাশংকর তাঁর একাধিক রচনায় উল্লেখ করেছেন। সভা সমিতিতেও বলেছেন অনেকবার।

পর পর কয়েক বৎসর কবি কামিনী রায়, রায় বাহাদুর জলধর সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমিতির স্থায়ী সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

সম্পাদক ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেন্দ্র মিত্র। সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, অবনীনাথ রায়, রমেশচন্দ্র সেন, সম্মোহন মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার সোম, জোৎস্না চন্দ, ডাঃ কেশব দে, ধীরেন্দ্রলাল ধর।

সহকারী সম্পাদক হিসাবে সর্বশ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়, দেবতোষ দাশগুপ্ত, সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় কাঞ্জিলাল ও কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমিতির যথেষ্ট সেবা করেন।

আমাদের অনেকেই মনে করতেন যে গোপেনবাবুর বাড়িই বুঝি সমিতির স্থায়ী আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি একটু পারিবারিক অসুবিধার ইংগিত করায় সমিতির নিয়মিত বৈঠকের স্থান পরিবর্তিত হয়। সভা হতে আরম্ভ করে সামনের ৮০ নম্বর বাড়িতে। গৃহস্বামী অমিয় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবহার ছিল খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ। কিন্তু তিনি আমাদের সভায় আসতেন না। তবে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলোকধন গঙ্গোপাধ্যায় সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য হয়ে উঠলেন। তিনি গান লিখতেন,কবিতা লিখতেন।

অমিয় গাঙ্গুলি মহাশয়ের বাড়িতেই 'অপরাজিত দিবস' অনুষ্ঠিত হয়। সরলাদেবী চৌধুরাণী এই সভায় সভানেত্রীত্ব করেন। 'পথের পাচালী দিবসে' যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই এই সভার কাজে অংশ গ্রহণ করেন। অমিয়বাবুর বাড়িতেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' ও 'পুতুল ও প্রতিমা' এবং শৈলজানন্দের গল্প নিয়ে আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়। নীরদরঞ্জন একদিন একখানি একাঙ্ক নাটক পাঠ করেন। ঐ সভায় সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

এই বাড়িতেই শ্রীযুক্ত যোগেশ বাগল তাঁর রচিত 'কলিকাতায় জনশিক্ষার ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। যাঁরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস।

একদিন কবি জসিমউদ্দিনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' নিয়ে গোপেনবাবুর বাড়িতে এক বিশেষ আলোচনা সভা হয়েছিল। সভায় অনেক কবি ও সমালোচক এসে কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন চৌরিচৌরায় ভরাডুবি হয়ে যায়। বাংলাদেশের যে সব সন্ত্রাসবাদী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন তাঁদের অনেকেই চৌরিচৌরার পর অসহযোগ আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। গোপনে আবার তাঁরা হিংসাত্মক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এরই ফল মেদিনীপুরে পর পর কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। আমার ডিসপেনসারির বৈঠকে যে সব সাহিত্য রসিক যোগ দিতেন পুলিশ তাদের অনেককেই গ্রেপ্তার করে, অন্তরীণ করে। খবরটা অমিয়বাবুর কানে যায়। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন, আপনাদের সমিতি দেখছি বিপ্লববাদীদের একটা আড্ডা। তাঁর ইঙ্গিতই ছিল যথেষ্ট। আমরা আর একবাব আমাদের অধিবেশনেব স্থান হারালাম।

এবার নতুন স্থান জুটল বাগবাজারে বৃন্দাবন পাল লেনে কর্মযোগী রায়েব বাড়িতে। সাহিত্য-শিল্পে অনুরাগী এই তরুণ প্রণব রায়-দের সঙ্গে সমিতিতে আসেন। তাঁর বাড়িতে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বৈঠক লেগেই ছিল। গান বাজনা, সাহিত্যের আলোচনায় মশগুল হয়ে থাকতেন তিনি। কবিতা লিখতেন, গল্প লিখতেন। দুই বৎসবের জন্য তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ কবেন। তাঁব বাড়িতে সমিতির অনেক বৈঠক হয়েছে। এক বৈঠকে আমরা অতুল প্রসাদ সেনকে পাই। সাহিত্য সম্পর্কে ভাষণের পর তিনি আমাদের গান গেয়ে শোনান। শ্রী প্রবোধ সান্যাল ১৯৩২ সালের নভেম্বরে আর এক বৈঠকে 'মহাপ্রস্থানের পথে' পাণ্ডুলিপির প্রথম অংশ পড়ে শোনান। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী সজনীকান্ত দাস।

প্রায় দুবৎসর পরে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে 'মহাপ্রস্থানের পথে' নিয়ে আলোচনা সভা হয়। সেই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন রায় বাহাদুর জলধর সেন। প্রধান বক্তা শ্রদ্ধেয় বীরবল। এর কিছুদিন পরে সামান্য কয়েকদিনের অসুখে কর্ম-যোগী রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে শুধু সমিতি নয়, বাংলাদেশ একজন সাহিত্য প্রাণ ব্যক্তিকে হারিয়েছে। এবার সমিতির স্থান হয় বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটস্থ মজিলপুর দত্ত বাড়িতে। এই জমিদার বংশ বরাবরই সাহিত্য শিল্পের অনুরাগী। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে তাঁদের মজিলপুরস্থ বাসভবনের বর্ণনা আছে।

সমিতি এঁদের সান্নিধ্যে আসে নারায়ণদাস ভট্টাচার্যের মাধ্যমে, এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় অন্য সূত্রে; ইনি ছিলেন দত্ত পরিবারের গৃহশিক্ষক। যেমনি সুন্দর সুঠাম দেহ, তেমনি সুপণ্ডিত। সাহিত্যে দর্শনে রাজনীতিতে গভীর

ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য। তিনি সমিতিতে আসার অল্প দিন পরেই সভ্যবৃন্দ তাঁকে সম্পাদক নির্বাচিত করেন। তখন নির্বাচন হত ব্যালট প্রথা অনুযায়ী।

সভা বসত মজিলপুর দত্ত বাড়িতে, কখনও বা চোরবাগানের মিত্রদের বাসভবনে। এই মিত্র বাড়িতে নারায়ণবাবুর কয়েকজন ছাত্র ছিলেন। দত্ত বাড়ির শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ দত্ত এবং মিত্র বংশের শ্রীঅসিতেন্দ্র মিত্র পরে সমিতির সম্পাদক হন। তবে অধিকাংশ কাজ করতেন নারায়ণবাবু স্বয়ং। অর্থ ব্যয়ও করতেন, আলোচনার মাধ্যমে তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যেত।

তখন আমরা পরাধীন, কিন্তু কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন যে দেশ স্বাধীন হলে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দী। সাহিত্যসেবক সমিতি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। সমিতির পক্ষ থেকে বহু প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সব সভার কার্যে মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, আনন্দবাজারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লকুমার সরকার ও অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। সংবাদপত্রেও সভার রিপোর্ট বেরুত। তর্কবাগীশ মহাশয় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কিছুদিন পরে তিনি বললেন, উপর থেকে আমার পরে চাপ দেওয়া হচ্ছে— আমি যেন এই আন্দোলনে যোগ না দেই।

এই চাপ এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কারও কাছ থেকে। তিনি ছিলেন হিন্দি রাষ্ট্রভাষা প্রস্তাবের অন্যতম প্রধান সমর্থক।

নারায়ণবাবুর সময়ে নানা কারণে কল্লোল দলের তরুণ সাহিত্যিকদের উপস্থিতি কমতে থাকে। মাঝে মাঝে আসতেন বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের ঠিক কল্লোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলা চলে না। আমরা নাট্যকার মন্মথ রায়কেও আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম। একাঙ্ক নাটকের জন্য তখনই সাহিত্যরসিক সমাজে তিনি সুপরিচিত। তিনি আমাদের সভায় স্বরচিত নাটক পাঠ করে শোনান। কবি সুনির্মল বসুও আসতেন। কবিতা পড়তেন।

১৯৩৭ সালে সমিতির রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় আলবার্ট হলে। দুদিনব্যাপী উৎসব, প্রথম দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়। এইদিন হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীশচীনদেব বর্মণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সম্ভবতঃ গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিন হয় সাহিত্যসভা, সভানেত্রী ছিলেন শ্রদ্ধেয়া সরলাদেবী চৌধুরানী। রায়বাহাদুর জলধর সেন তখন সমিতির স্থায়ী সভাপতি। অনুষ্ঠানের দুই দিনই কার্ড দিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। জয়ন্তী উৎসবে নারায়ণবাবুই ছিলেন প্রধান হোতা। সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ দত্ত ও তরুণ শিশু সাহিত্যিক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন।

পর বৎসর নারায়ণবাবুর সঙ্গে সম্পাদক হন চোরবাগানের শ্রীঅসিতেন্দ্র মিত্র। তখনও সভ্য এবং সহানুভাবকদের আহ্বানে মধ্যে মধ্যে অন্যত্র সমিতির অধিবেশন বসত। কবি প্রভাতকিরণ বসুর রাজাবাগান স্ট্রীটস্থ বাসভবনে এরূপ কয়েকটি সভা হয়। তাঁরই বাড়িতে আমরা ওমরখৈয়ম খ্যাত কবি কান্তি-চন্দ্র ঘোষকে পাই। তিনি স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনান।

রজত জয়ন্তীর পরও নারায়ণবাবু কিছুকাল সমিতিব সেবা করেছিলেন। পরে পারিবারিক কারণে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে পারেন নি। তবে তিনি বরাবর আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর এবং জমিদার মনীন্দ্রনারাযণ দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে একবার মহাষ্টমীর দিন মজিলপুরে সমিতির সভ্যদের একটি প্রীতি সম্মেলন হয়। দত্ত পরিবাবের আবালবৃদ্ধ সকলেই সভ্যদের বিশেষ যত্ন করেন। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

১৯৩৮ সালে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে সমিতিব এক শোকসভা হয়। ঐ সভায় সাহিত্যাচার্য শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শরৎচন্দ্রের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেন। শরৎ প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর সুশীলচন্দ্র মিত্র, বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে।

মজিলপুরের দত্ত বাড়ি ছাড়াও অন্যত্র আমাদের সভার অধিবেশন হত। বাংলার বিপ্লব যুগের সুপরিচিত কর্মী ক্ষিতীশ সান্যাল মহাশয় তাঁর নবীনকুণ্ডু লেনস্থ ভবনে কয়েকটি সভা আহ্বান করেন। এক সভায় সভাপতি ছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নী শ্রীমতি সরোজদেবী মধ্যে মধ্যে তাঁদের বাড়িতে সভা আহ্বান করে সভ্যদের বিশেষভাবে আপ্যায়িত করতেন। শরৎবাবু পরে (১৯৩৮-৩৯ সালে) শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর সঙ্গে সমিতির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

নরেন্দ্র বসু মল্লিক, মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত মনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী। 'দস্যু' নাটকের লেখক শ্রী আশুতোষ সান্যাল, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ অনেকেই সমিতির সভা আহ্বান করতেন।

আশু সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতেই আমরা প্রথম মোহিতলালকে পাই। সেদিন সভায় অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সামনে সবাইকে নিষ্প্রভ মনে হচ্ছিল। তাঁর বাগ্মিতা, বিদ্যাবত্তা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি সভ্যগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সভার শেষে তিনি কবি যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের 'ডাব' আবৃত্তি করেন।

মনুজবাবু তাঁর জেলে পাড়ার বাড়িতে ও মাতুলালয়ে (শোভাবাজার রাজ বাড়িতে) বিশেষ সভা আহ্বান করেন। মনোমোহণ ঘোষ মহাশয় তাঁর কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীটস্থ বাসগৃহ অতুলভবনে এবং অন্যত্র সমিতির সভায় ঐতিহাসিক গবেষণামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। একাধিক প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করতে চান যে মহাকবি কালিদাস ছিলেন বাঙালী। শ্রী মনুজ সর্বাধিকারীর জেলে পাড়াস্থ বাড়ির সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 'লোকারণ্য' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক প্রফুল্ল কুমার সরকার।

কলুটোলার সুহৃদ লাইব্রেরি আমাদের এক বিশেষ সভা আহ্বান করেন। সেই-সভায় গল্প পাঠ করেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভাপতি ছিলেন শ্রী সজনীকান্ত দাস।

হিন্দু মহাসভার ডাক্তার শ্রী সন্তোষে কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়িতে মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করতেন। তাঁরই বাড়ির এক সভায় শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সাহিত্য সম্বন্ধে একটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মাণিকতলাস্থ ভবনে বঙ্কিম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্য এক অধিবেশন হয়। অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য, পিটার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাশয় বঙ্কিম সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের বাসভবনে সমিতির বঙ্কিম শতবার্ষিকীর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয়। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

১৩৩৯-৪০ ও ৪০-৪১ সালে সমিতির সম্পাদক হন শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবোধ সরকার (বর্তমানে চলচ্চিত্র পরিচালক) সভাপতি

ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস. ওয়াজেদ আলি বার-এ-টল, এই সময় শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়, শ্রী প্রকাশ সরকার ও শ্রী সুশীল মজুমদার সহকারী সম্পাদক রূপে সমিতির বিশেষ সেবা করেন। পরের বছর শ্রী শৈলজানন্দের সঙ্গে সম্পাদক হন শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রবিবাবু 'কুয়োভ্যাডিস' 'দি ম্যান ইন দি আয়রন মাস্ক' ইত্যাদি বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ করে সাহিত্যের সেবা করেছেন।

এই সময় শ্রীব্রজেন্দ্রলাল সাহা নামে একটি তরুণ আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি গল্প লিখতেন, প্রবন্ধ লিখতেন। ব্রজেনবাবু পরে সমিতির সম্পাদক হন। বর্তমানে তিনি বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক। বালক দত্ত লেন ও তারক দত্ত লেনের নিজ বাটিতে তিনি সমিতির একাধিক সভা আহ্বান করেন। বালক দত্ত লেনের সভায় তরুণ কবি শ্রী জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতা শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে।

সম্পাদক রবিবাবুর সঙ্গে সমিতিতে যোগদান করেন শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সেন ও হরিপ্রসাদ মল্লিক। সুরেনবাবু ছিলেন শিশু সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, আর হরিপ্রসাদ ছিলেন বিদ্রোহী কবি। জীবনেও তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বিপ্লবী।

সর্বজন পরিচিত মোহন সিরিজের লেখক শশধর দত্ত ১৯৪০-৪২ সালে সমিতির সহকারী সভাপতি ছিলেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিখ্যাত কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। সেই থেকে তাঁর সভাপতিত্বে সমিতির অনেক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকটি সভায় পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকার সম্পাদক মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার প্রবন্ধ পাঠ করেন। মণীন্দ্রবাবু ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর মৃত্যুর পর 'প্রভাতী' আর বেঁচে নেই।

এই সময় আরও একজন লেখক সমিতির সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হন। তাঁর নাম বিভূতিকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। আমাদের এক অধিবেশনে তিনি একখানি স্বরচিত নাটক পাঠ করেন। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত মঞ্চশিল্পী শ্রী সতু সেন সেই সভায় পৌরোহিত্য করেন। এরপর সতুবাবু রাশিয়া ও আমেরিকায় রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্র জগৎ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। আরও একজন বিভূতি মুখোপাধ্যায় (বনগ্রামের বিভূতি মুখোপাধ্যায় নামে পরিচিত) সমিতিতে গল্প পাঠ করেন।

বৌবাজার কমার্শিয়াল স্কুলে 'দেশ' সম্পাদক শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সেনের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে এক আলোচনা সভা হয়। সভাপতি মহাশয়, নারায়ণ দাস ভট্টাচার্য ও ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন।

কবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে এক অধিবেশনে নারায়ণদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য ও পিটার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুচিন্তিত বক্তৃতার দ্বারা সভ্যবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ অন্ধ আলোক নিকেতনের অধ্যক্ষ শ্রী এস সি. রায় মহাশয় ঐ প্রতিষ্ঠান-গৃহে 'অন্ধের জীবন ও সমস্যা' নিয়ে আলোচনা করেন। এই অধিবেশনটির উদ্যোক্তা ছিলেন সাহিত্য-সমিতির সমিতির পক্ষ থেকে হরিপ্রসাদ মল্লিক।

একদি ' অকস্মাৎ আমাদের বাড়িতে নারায়ণবাবুর প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। তখন তিনি 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার এসিস্টেণ্ট এডিটর ছিলেন।

আলোচ্য কয়েক বৎসরে পরম শ্রদ্ধেয় বীরবল, সাহিত্যাচার্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়গণকে আমরা স্থায়ী-সভাপতিরূপে পাই। খগেনবাবু ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। বাঙলার সাংবাদিক জগতের ভীষ্ম শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ আজও সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সেবা করছেন। এটা দেশের পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

সাধারণ সভায় সর্বশ্রী ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ অনেকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

এরপর কিছুদিন সমিতির কাজে ভাঁটা পড়ে। তখন শ্রীসুধীর সেনগুপ্তকে না পেলে হয়ত এ প্রতিষ্ঠান টিকত না। সুধীরবাবু বার্মা শেল কোম্পানিতে কাজ করেন। মানুষটি সাহিত্য-শিল্পে যথেষ্ট অনুরাগী, সুবক্তা, সুপুরুষ ও একজন ভাল কীর্তন গাইয়ে। নিজের আপিসের বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তিনি ছিলেন কর্ণধার। তিনি ও তাঁর বন্ধু অধুনালুপ্ত গোরাব রিসার্চ লেবরেটরির স্বত্বাধিকারী শ্রী ভবেশচন্দ্র সেন কয়েক বছর সমিতির কার্য পরিচালনা করেন। এই সময় পরিচালকরূপে যোগ দিয়ে শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করেন।

শরৎ সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মুরলীধর সেন লেনে অমৃত সমাজ

হলে স্বর্গীয় দেশনায়ক কিরণশঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে একা সভা হয়। ঐ অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন হরিদাস মজুমদার।

উক্ত অধিবেশনে ডক্টর সুশীলচন্দ্র মিত্র, ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী মনোজ বসু, শ্রী ফণী রায়, মেঘেন্দ্রলাল রায়, কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক সুধী ও সাহিত্যিক যোগদান করেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘেন্দ্র লাল ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্য সেবী ও সমিতির বিশেষ শুভানুধ্যায়ী। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রী অরবিন্দ ঘোষাল (বর্তমানে এম পি.) কবিতা পাঠ করেন। অরবিন্দ বাবুর মধ্যে যথেষ্ট কবিত্ব শক্তি ছিল। এখন রাজনীতিতে যোগদান করে তিনি সাহিত্যসেবায় সেরূপ মনোযোগ দিতে পারেন না। পারলে আমাদের সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হত।

১৯৪৩ সালে শ্রী অরুণকুমার বসু তাঁর বাদুড়বাগানস্থ ভবনে সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। তখন স্থায়ী সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ সভায় মেঘেন্দ্রলাল রায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, সর্বশ্রী নরেন্দ্র দেব, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, পুলবেশ দে সরকার, রণজিৎ কুমার সেন, অধ্যাপক সুধাংশু গুপ্ত সুধীর সেন, ব্রজেন সাহা, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে উপস্থিত সদস্যদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৫ সালে শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী প্রবোধ সরকারের সম্পাদনায় সমিতির পক্ষ থেকে ‘ছুটির ঘণ্টা’ নামে একখানি সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলন সমিতির সদস্য বিখ্যাত ৩৩ জন সাহিত্যিকের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল। বইখানি প্রকাশ করেন ‘দীপালি’ পত্রিকার সম্পাদক কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায। ভবেশবাবুর আনুকুল্যে এই সময়ই আমার ‘শতাব্দী’ প্রকাশিত হয়। বইখানি আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করেন। সমাজ সচেতনতা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে ‘ধাত্রী দেবতা,’ ‘পঞ্চগ্রাম,’ ও ‘মন্বন্তর’-এ সেই ভাবধারার শুরু। প্রচলিত ভাবধারাকে এই সন্দর্ভের লেখকও আর এক নূতন খাতে প্রবাহিত করেন। ‘শতাব্দী’ তারই স্বাক্ষর। ‘কুরপালা’ ‘গৌরীগ্রাম’ ও ‘মালঙ্গীর কথা’ সেই স্বাক্ষরই বহন করে এসেছে।

আলোচ্য কয়েক বৎসরে সমিতির কর্মিগণ আরও কতকগুলি বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। নিম্নে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র দত্ত আই. সি. এস. তাঁর লাভলক প্লেসস্থ ভবনে সমিতির এক বিশেষ সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় দত্ত মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের 'অহনা' পাঠ করে শোনান।

ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে মানবের দুঃখ সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভায় শ্রীরণজিৎ কুমার সেন, শ্রীপুলকেশ দে সরকার ও শ্রী ফণীরায় বক্তৃতা করেন। শ্রী নরেন্দ্র নাথ বসু মল্লিক মহাশয় এক অধিবেশনে প্রাচ্য নৃত্যকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

আর এক সভায় শ্রীব্রজবাসী সিংহ মহাশয় মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ এক বক্তৃতা দেন।

শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে এক আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন কবি সুনির্মল বসু, সর্বশ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, বিশু মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্মথনাথ ঘোষ, অখিল নিয়োগী ও ধীরেন্দ্র লাল ধর।

শ্রী নলিনীকান্ত ভদ্র মণিপুরের ঐতিহ্য ও বর্তমান মণিপুর সম্বন্ধে এক সারগর্ভ প্রবন্ধ পরিবেশন করেন।

এক সভায় আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন শ্রদ্ধেয় এস. ওয়াজেদ আলি. বার-এট-ল, কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায় চৌধুরী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও মনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী।

এক অধিবেশনে শ্রী পুলকেশ দে সরকার 'আগামী বাংলা সাহিত্য' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সংলগ্ন শিবনাথ স্মৃতি মন্দিরে 'সাহিত্যে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর দান' সম্পর্কে আলোচনা সভা হয়।

সভায় সাহিত্যাচার্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দেশনায়ক কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীজগু রায় ও শ্রী রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

শ্রী মৃণাল সাহার আহ্বানে ক্যালকাটা ফ্রেন্ডস ক্লাব গৃহে অধ্যক্ষ শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় জার্মান ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

মজিলপুর দত্ত বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় আচার্য রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ব্রাউনিং সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন।

এক বিশেষ বৈঠকে শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী ও শ্রীপুলকেশ দে সরকার সহকারী সম্পাদকের পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেন।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ শ্রীমানী বাজারের দোতলায় দীনবন্ধু মিত্রের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীসজনীকান্ত দাস ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন।

এক সভায় অধ্যক্ষ শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষ ও কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা গান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

এক অধিবেশনে ডক্টর প্রমথনাথ রায় ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইতালির ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষের বাসভবনে সমিতি গিরিশ স্মৃতি পূজার ব্যবস্থা করেন। ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তিনি, রায় মন্মথমোহন বসু বাহাদুর, শ্রীনরেন্দ্র দেব, মেঘেন্দ্রলাল রায় ও শ্রী দুর্গাকুমাব বসু গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা ও স্টার রঙ্গমঞ্চে তাঁর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আহ্বানে তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রী নলিনীকিশোর গুহ ও শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যে সাম্যতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রী অরবিন্দ ঘোষাল পড়েন একটি স্বরচিত কবিতা।

আশুতোষ হলে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের ৬৬তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়। সমিতির ঐ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন কবিশেখর শ্রী কালিদাস রায।

আমাদের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সাংবাদিক জীবনের ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র প্রদান করা হয়।

এই বৎসর সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রী শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে হুগলীতে সমিতির এক বিশেষ সভা হয়।

চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের শত-বার্ষিকীতে সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েকজন সদস্য যোগদান করেন।

আই-টি-এফ প্যাভেলিয়নে লালগোলার রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। ঐ অনুষ্ঠানে শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীর সেন সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্রীগিরিজাকুমার বসুর উদ্যোগে সমিতি রায়বাহাদুর জলধর সেনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। গোপেন্দ্রনাথ মিত্রের বাস-ভবনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতি-গৃহে অনুষ্ঠিত এক সভায় শক্তিমান কথা সাহিত্যিক শ্রীসুশীল জানা 'কুকুর' নামে একটি গল্প পাঠ করেন। সমিতিতে এইটি তাঁহার প্রথম পঠিত গল্প, এরপরও তিনি অনেক সভায় গল্প পাঠ করেন এবং সমিতির কাজে নানাভাবে সাহায্য করেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বিশি মহাশয় কয়েকটি সভায় গল্প, প্রবন্ধ,উপন্যাস ও নাটিকা পাঠ করেন।

মুক্তারামবাবু স্ট্রীটস্থ রামচন্দ্র ভবনে তারাশঙ্করের সভানেতৃত্বে এক মহতী অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন, সভাপতি মহাশয় সাহিত্য সম্পর্কে সুচিন্তিত একটি ভাষণ দেন।

১৯২৫ সালের পর থেকে মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় প্রায়ই সমিতির সভায় যোগ দিতেন। ১৩৫১-৫৩ সালে তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি। তিনি এসেই আমাদের ইংরেজি ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন, অমন আবৃত্তি খুব কমই শুনেছি। সর্বোপরি ছিল তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য। সাহিত্য আলোচনায় প্রকাশ পেত তাঁর চিন্তাশক্তির স্বকীয়তা। কবি মোহিতলাল সারাক্ষণ সাহিত্যরসে ডুবে থাকতেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে তিনি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বৎসর বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদ ও ভারতীয় দর্শনের প্রভাব।'

পরপর কয়েক বৎসর সমিতিতে ১লা আষাঢ় মেঘোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবগুলিতে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য, পণ্ডিত যামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন, শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রমুখ সুধিবৃন্দ মেঘদূত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সমিতির এক অধিবেশনে শ্রী রমেশচন্দ্র সেনের গল্প-সংগ্রহ 'মৃত ও অমৃত' নিয়ে আলোচনা করেন ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্ত ও শ্রী সুধীন্দ্রলাল রায়। বিদ্যাসাগর কলেজ গৃহে সমিতির এক অধিবেশনে বিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীরমেশচন্দ্র সেনের 'শতাব্দী' নিয়ে আলোচনা হয়। ঐ সভায় প্রবন্ধ পড়েন অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ শীল, শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু। শ্রী অজিত সেনের লেখাটি পরে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বৈদ্যনাথবাবু এরপর সমিতির অনেক অধিবেশনে নাটক ও স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলা সাহিত্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন।

এক সভায় শ্রীনলিনীকান্ত ভদ্র পড়েন 'স্মিত কাপা' বা 'সূর্য শিকারী' নামে নাগা জাতির মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি প্রাচীন কাহিনী। আর এক সভায় শ্রী অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কিছুদিনের জন্য জগদীশনাথ রায় লেনে অনাথ দেবের বাড়িতে সভা বসত। তখন সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রাজেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত আবার আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

এই সময় এম. এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাট পার্টির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী শিবনারায়ণ রায়, পরেশ ধর, দেবব্রত স্বরচোধুরী, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি স্নুনীল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় শ্রীস্নুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি সমিতিতে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠ করেন। পরেশ বাবু ও দেবব্রত বাবু পড়েছেন নাটক ও গল্প। এঁরা উভয়েই শক্তিমান নাট্যকার। এই সময়ে শ্রী শিবনারায়ণ রায় সাহিত্য সম্পর্কে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাহিত্য-রসিক সমাজে সমালোচক হিসাবে তিনি স্নপরিচিত। শ্রী স্নুনীল চট্টোপাধ্যায় পড়েছেন বহু কবিতা। তিনি আজ কবিখ্যাতিব অধিকারী।

এই বাড়িতেই ডক্টর স্নধাংশু সেনগুপ্ত টি. এস. ইলিয়ট সম্পর্কে একটি স্নচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতি ও বক্তারূপে এই প্রতিষ্ঠানেব কাজে সক্রিয অংশ গ্রহণ করেন। জগদীশনাথ রায় লেনের এক সভায় ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বাঙলা সমাজের উৎপত্তি নিয়ে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। আর এক সভায ডস্টযেভ্‌স্কি নিয়ে আলোচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র।

বিশেষ এক অধিবেশনে সাহিত্য সম্পর্কে ভাষণ দেন শ্রীঅরুণ গুহ (পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)। শ্রীমতী বীণা দাস (ভৌমিক) ও বিধান সভার সহঃ অধ্যক্ষ শ্রীআশুতোষ মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। এঁদের নিয়ে আসেন শ্রীস্নধীন্দ্রলাল রায়। স্নধীনবাবু কয়েকটি সভায় পক্ষিতত্ত্ব নিয়ে বিশেষ মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। যতদূর মনে পড়ে ডেপুটী স্পীকার মল্লিক মহাশয় এক সভায় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে স্নুন্দর একটি বক্তৃতা দেন। হরিতকী বাগান লেনের

আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীঅজিত সেন 'রবীন্দ্রকাব্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধপাঠ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে সমিতি গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৩৫৪-৫৫ সালে সমিতির স্থায়ী সভাপতি ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সময় ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীসরোজ আচার্য, শ্রীগোপাল হালদার, অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, ঔপন্যাসিক শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শ্রী অরবিন্দ ঘোষাল ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমিতির কাজে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

এক সভায় শ্রীযুক্ত সরোজ আচার্য মহাশয় মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন।

ধীরেনবাবু বাঙলা সাহিত্য ও বিদেশী সাহিত্য নিয়ে সমিতিতে যে সব মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন তার কয়েকটি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ও সুধিসমাজে সমাদৃত হয়েছে। জগদীশনাথ রায় লেনের এক সভায় তাঁর 'ইসলামীয় সাহিত্যে বৈষ্ণবধর্মের ভাব' নামক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একবার তাঁর সারপেনটাইন লেনস্থ ভবনে সমিতির সভা আহ্বান করে সদস্যদের তিনি আপ্যায়িত করেন।

বিভিন্ন সভায় শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র সেনের উপন্যাস নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সেই সব সভার কাযে অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিক অংশ গ্রহণ করেন। সুনীলবাবু পরে এই প্রবন্ধ সমষ্টি দিয়ে 'বাঙলার পাঁচ জন ঔপন্যাসিক' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এরপর তিনি 'বাংলা সাহিত্যে চতুষ্কোণ' নামে আর একখানি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলিও সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত হয়।

১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ায় অশোক শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে চোরবাগান লেনে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে এক শোক সভা হয়। গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সভাপতি মহাশয় বেদ পাঠ করেন, এক মৌলবী পড়েন কোরাণ এবং পিটার প্রমথ ব্যানার্জি বাইবেল। শ্রীসুধীন রায় পড়েছিলেন গীতা।

এ বছর শ্রী অশোক গুহ মহাকবি গ্যেটের উপর লিখিত একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ে শোনান।

এই সময় পর পর তিন বছর শ্রীভবেশ সেন সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে সহকারী সম্পাদক ছিলেন মশরুফ হোসেন বিশ্বাস। মহাত্মা-গান্ধীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সম্পাদক ভবেশবাবু গ্লোব রিসার্চ ইন্স্টিটিউটে কংগ্রেসসেবী শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়ের পৌরোহিত্যে এক সভার আয়োজন করেন। ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্ত গান্ধীজীর দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। পরের বছর সমিতির স্থায়ী সভাপতি ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীঅজিত সেন। এই বছর ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্তের পঠিত প্রবন্ধের নাম যথাক্রমে, কবি গোবিন্দ দাস', মুদ্রারাক্ষস' ও 'মগধের রাষ্ট্রবিপ্লব'। এই সময় আমরা আমাদের পুরাতন বন্ধু অবনীনাথ রায়কে আবার নিজেদের মধ্যে পাই। তিনি শান্তি নিকেতন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়ে শোনান। পুরাতত্ত্ববিদ যোগেশবাবুর কাছে শুনি পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন কথা। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত গল্পে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের জীবনালেখ্য ফুটিয়ে তোলেন।

বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গল্প খুব বেশী নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে শ্রীদাশগুপ্ত পরে তাঁর এই অনুশীলনের ধারা বজায় রেখেছেন বলে শুনি নি। শ্রীনলিনী ভদ্র আসাম ও নাগা সম্প্রদায় সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধে পড়েন। যুগান্তরের শ্রীসুধীর সেনগুপ্ত পড়েন 'বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব" নামে সন্দর্ভ।

এই বৎসর সর্বশ্রী দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত চক্রবর্তী অরুণবরণ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দেব, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, সমতুল দাস প্রমুখ অনেকেই স্বরচিত কবিতা ও গল্প পাঠ করেন।

মানভূমের পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তির দাবী নিয়ে এক বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতির আসন গ্রহণ করার কথা ছিল। অত্যধিক বৃষ্টির জন্য রাস্তা জলমগ্ন হয়। সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক ভিন্ন আর একটি প্রাণীও সভায় যোগ দিতে পারেন নি। তবে দুই লরী ভর্তি পুলিশের উপস্থিতিতে উদ্যোক্তাদের মান রক্ষা হয়েছিল।

এই বৎসর শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি পালন করা হয়। থিয়সফিক্যাল সোসাইটি

হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় মোহিতলাল 'শরৎসাহিত্যে বৈষ্ণববাদের প্রভাব' শীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পরলোকগত ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী'র বাড়ীতে রাজেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে ঈদ-বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একটি মুসলমান তরুণ কোরাণ পাঠ করেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ের কিয়দংশ পাঠ করেন শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ।

এই অধিবেশনে বাম-পন্থী ও দক্ষীণ-পন্থী সদস্যদের মধ্যে I.P.T A-র গান নিয়ে বিশেষ বাগবিতণ্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত সভাপতি তাঁর সুষ্ঠু মীমাংসা করেন। গৃহস্বামী শ্রীদেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় জলযোগের ব্যবস্থা করায় সভাটি মধুরেণ সমাপ্ত হয়েছিল।

ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীসুধীর সেনের আহ্বানে সোদপুরে এক প্রীতি সম্মেলন হয়। তাঁর আতিথেয়তায় সভ্যগণ বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন। ১৩৫৭ সালে প্রখ্যাত অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য এবং শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায় সমিতির কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। এ বছর সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রলাল সাহা ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের কাব্য সম্পর্কে এক সভায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কেও তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাংলার বানান সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ। শ্রদ্ধেয় শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'চলমান জীবন'-এর পাণ্ডুলিপি থেকে প্রথম অনুচ্ছেদ পড়ে শোনান। শেষোক্ত সভা হয় ভাগ্যকুলের রায় বাহাদুর গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীতে।

আলোচ্য বর্ষে বিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমাদের মধ্যে পাই। এক বিশেষ সভায় তিনি একটি সুন্দর গল্প পাঠ করেন।

এ বছর ঔপন্যাসিক শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ আমাদের মধ্যে আসেন। 'চরকাশেম' ও 'দক্ষিণের বিল' লিখে তিনি ইতিমধ্যেই খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।

সর্বশ্রী হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীন্দ্রনাথ ঘোসাল, বিমলরঞ্জন দাসবক্সী ব্রজেন্দ্রলাল সাহা, চিত্তরঞ্জন দেব প্রমুখ অনেকে গল্প পড়েন।

এই বছর বিভুতিবাবুর অকাল মৃত্যু শুধু সমিতির পক্ষে নয় বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও দুর্ভাগ্য। তাঁকে হারিয়ে এ প্রতিষ্ঠান একজন খাটি বন্ধুকে হারিয়েছে, যাঁর সঙ্গে সমিতির বরাবরই সম্পর্ক ছিল সুনিবিড়। সমিতি

তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কমলা হাই স্কুলে এক স্মৃতি সভার ব্যবস্থা করেন। সেই সভার সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর। অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, শ্রীকান্তিচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেকেই বিভূতিভূষণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

রেণাসাঁ হলে শ্রীনলিনীকিশোর গুহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীরমেশচন্দ্র সেনের 'কাজল' নিয়ে এক আলোচনার বৈঠক বসে। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ, শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় রাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ব্রজেনবাবু ছাড়া সকলেই বইখানির ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্রজেনবাবু বলেন, পতিতা জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার কোনরূপ সার্থকতা নেই। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে শক্তির অপব্যবহার করেছেন।

তাঁর অভিযোগের উত্তরে লেখক 'কাজলের কৈফিয়ৎ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে বাঙালী হিন্দু সমাজে পতিতার সমস্যা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। যাতে সমাজ সহানুভূতির সঙ্গে এই সমস্যার প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টি দেন সেই উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসখানি রচিত।

এই বছর বিজয়া সম্মেলন হয় সোদপুরে শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্তের ভবনে। ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন ডক্টর সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা 'টাইগার হিল' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। আহ্বায়ক ক্ষিতীশবাবু নৃত্য-গীত ও জলযোগের ব্যবস্থা করে সভ্যদের বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হন।

১৩৫৮ ৫৯ সালে সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ। সেই সালে চিত্তবাবুর সঙ্গে শ্রীমৃণালকান্তি সাহা যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। মৃণালবাবু ক্যালকাটা ফ্রেণ্ডস ক্লাবের ও সম্পাদক ছিলেন। ঐ ক্লাব গৃহে তিনি সমিতির বহু সভা আহ্বান করেন।

সেই থেকে প্রায় দশ বৎসর সম্পাদক ও পরিচালকরূপে চিত্তবাবু সমিতির সেবা করে আসছেন। আট বছরই তিনি অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। এক বছর ছিলেন পরিচালক। পল্লীগীতি সম্বন্ধে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্ঠার সহিত তিনি মাতৃভাষার সেবা করে এসেছেন।

১৩৫৮—৫৯ সালে সমিতির সভ্যগণ সাহিত্য, রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। তন্মধ্যে সভাপতির 'জাতীয়

আন্দোলন জাতীয় সাহিত্য' ও শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞের 'কৃত্তিবাসে মূল রামায়ণের বিচ্যুতি' এবং শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর 'অবনীন্দ্রনাথ ও বাঙলার প্রবন্ধ সাহিত্য' এবং শ্রীব্রজেন্দ্রলাল সাহার 'রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায় ও অত্যাধুনিক যুগ' ও শ্রীসুধীর চাকীর 'বঙ্কিম সাহিত্যের ইঙ্গিত,' শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকায় হাস্যরস', শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের 'আমার অন্ধ্র দেশের অভিজ্ঞতা' এবং শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষের কবিতা' ও 'বাংলা ছোট গল্পে প্রমথ চৌধুরী' 'বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বছর ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্ত আমাদের 'শুনঃ শেফ' ও 'লরা' নামে দুইটি গল্প পড়ে শোনান। আলোচ্য বর্ষে তরুণ লেখক শ্রীমানবেন্দ্র পাল সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ট হন। তিনি এবং শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ বিমলরঞ্জন দাসবক্সী, রাখাল ভট্টাচার্য, সুধীর সেন প্রমুখ অনেকে গল্প পড়েন। শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায় পাঠ করেন কয়েকটি নাটক।

আরেকটি নূতন লেখিকাও সমিতির সভ্য হন। তাঁর নাম শ্রীমতী অমিয়া সেনগুপ্ত। 'অনামিকা' ছদ্মনামে বহু পত্র-পত্রিকায় তিনি গল্প লিখেছেন। কয়েকটি গল্পে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। অনেকদিন পরে ১৯৫১ সালে শ্রীনীরদরঞ্জন আমাদের একখানি নাটিকা পড়ে শোনান।

এই দুই বৎসরই মহাবোধি সোসাইটি হলে সমিতির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৎসর সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর ও প্রধান অতিথি আনন্দবাজারের শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য। পরের বৎসর সভানেত্রী ছিলেন শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী এবং প্রধান অতিথি শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল।

১৩৫৮ সালে শ্রী কমল মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে হাওড়া কদমতলা মধুসূদন পালচৌধুরী হাইস্কুলে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

১৩৫৯ সালে আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থ জগন্নাথ দের ভবনে ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্র।

১৩৫৯ সালে ২৯শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের একনবতিতম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। শ্রী ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ দেন। রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি কবিতা পাঠ করেন। শ্রীশংকর সেন করেন আবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে সভাপতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য পূর্ণ ভাষণ শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করে। সভার শেষে তিনি

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।

১৩৬০ সালে সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, বার-এট-ল। যুগ্ম-সম্পাদক শ্রী প্রফুল্ল ভট্টাচার্য ও শ্রী চিত্তরঞ্জন দেব। এ বছর সমিতিতে যাঁরা প্রথম গল্প পড়েন তাঁদের মধ্যে শ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর পরেও তিনি সমিতির কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। সমিতির অন্তরঙ্গদের মধ্যে তিনি একজন উদীয়মান তরুণ লেখক সর্বশ্রী দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, দিলীপ গুপ্ত, তারা মৈত্রেয়, কৃষ্ণা দত্ত, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য গল্প পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠ করেন ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শ্রী সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অনাথ বন্ধু বেদজ্ঞ, শ্রীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে। সুধাংশুবাবু 'লিসিডাস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সুনীলবাবু পড়েন 'প্রগতি ও বুদ্ধদেব বসু' এবং 'ছোট গল্পে বনফুল'। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর প্রবন্ধের নাম 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা' শুদ্ধসত্ত্ব বসু এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সমিতির বহু সভার কার্যসূচীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন তাঁর বন্ধু কবি শ্রীনলিনী গাঙ্গুলী ও শ্রীবিভুদাম রায়চৌধুরী। তাঁরাও আমাদের সভায় একাধিক কবিতা পাঠ করেছেন।

আলোচ্য বৎসরে স্থায়ী সভাপতির একডালিয়া পেনসস্থ বাসভবনে শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায় এক অধ্যায় নামে একখানি নাটক পাঠ করেন। ঐ অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র।

যুগান্তরের শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সমিতি-গৃহে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমিতে অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র মহাশয়ের পৌরোহিত্যে 'গৌরীগ্রাম' সম্পর্কে আলোচনা হয়। ডক্টর সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত, শ্রী সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ প্রভৃতি আলোচনায় যোগ দেন।

এবার যাঁরা কবিতা পাঠ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীগৌর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী গৌরীশঙ্কর রায়, কবি আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন, শ্রী অমর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী অনিল সাই, শ্রী প্রবোধ পাল, শ্রী নলিনীকান্ত রায় ও বনগ্রামের শ্রী অনিল সাই।

কবি নজরুলের জন্ম দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য মুক্তারামবাবু স্ট্রীটস্থ রামচন্দ্র ভবনে এক বিশেষ সভা হয়। শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় 'নজরুল সাহিত্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীসুধীর চাকী

নজরুল সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, কবির চরিত্র ও তাঁর দেশপ্রীতি সম্পর্কে সুচিন্তিত একটি ভাষণ দেন। সভায় কবি নজরুলের গান ও কবিতা আবৃত্তি হয়।

মদন মোহন লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত সমিতির এক সভায় শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র একটি গল্প পাঠ করেন। ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে গল্পের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এই সময় থেকে আবুল কাশেম রহিমুদ্দীন ও শ্রী অমর গাঙ্গুলী সমিতির বিশেষ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। আবুল কাশেম অনেক কবিতা পাঠ করেছেন। বহু সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশনে আবৃত্তি করেছেন। শ্রী অমর গাঙ্গুলী পড়েছেন নাটক। নাটকগুলি পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করেছে। সম্প্রতি তাঁর নাটক 'দ্বান্দ্বিক' বিশ্বরূপাব নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে বহু সৌখিন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন এই লেখক এক বৎসর সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে মেট্রোপলিটন স্কুলে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ডক্টর সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্র যথাক্রমে 'বিদেশে বিদেশী সাহিত্য', 'সাম্প্রতিক কাব্য সাহিত্য' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত তারাপদ লাহিড়ীর পরিচালিত গম্ভীর পরিষদের শিল্পীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে বাঙলার লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৩৬১ সালে বাঙলা সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিক সমাজে সর্বজনপ্রিয় পবিত্রদার (শ্রী পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়) সভাপতিত্বে সমিতি চলার পথে এগিয়ে যায়। এই বৎসর যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন শ্রী প্রফুল্ল ভট্টাচার্য ও শ্রী চিত্তরঞ্জন দেব।

আলোচ্য বর্ষে যাঁরা গল্প পাঠ করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়চৌধুরী, কৃষ্ণা দত্ত, শ্রীমতী প্রতিমা রায়, শ্রী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, অ-কু-রা নামে খ্যাত শ্রী অধীর কুমার রাহা, শ্রীচিত্র সিংহ, শ্রীতপন সেনশর্মা, শ্রীপ্রণয় গোস্বামী, শ্রী কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু, শ্রীমাখনলাল গুপ্ত, শ্রী গৌর বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

দামোদর-ভ্যালি কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণনাধর্মী একটি বড় কবিতা পাঠ করেন। 'গল্প ভারতী'তে কোন কবিতা প্রকাশিত হয় না। কিন্তু আলোচ্য লেখাটি সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাল লাগায় তিনি তাঁর পত্রিকায় ঐটিকে তিন সংখ্যায়

প্রকাশ করেন। কিন্তু সাহিত্য বিচারের মান অতি বিচিত্র। কবি লেখাটি সমিতিতে পাঠ করার পর ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্ত বলেন লেখকের প্রবন্ধটিতে অনেক ঐতিহাসিক মাল-মসলা আছে।

এ বছর যাঁবা কবিতা পড়েন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং সর্বশ্রী অমর গঙ্গোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, সন্তোষকুমার ব্রহ্ম, মাখনলাল গুপ্ত, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু, গৌরীশঙ্কর রায়, তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদি মণ্ডল ও ভারতী সাহিত্য সঙ্ঘের সম্পাদক প্রশান্ত মিত্র পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী শ্রী প্রশান্ত মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইস্পাতের স্বাক্ষরের সুপরিচিত লেখক শ্রী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য পরে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও মহারাজকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে জয়ন্তী কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি সমিতিতে কয়েকটি গল্প পাঠ করেন।

সুনীলবাবুর 'ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ও ছোট গল্পে জগদীশ গুপ্ত' এবং চিত্তরঞ্জন দেবের 'লোক-সঙ্গীতের দেশ বাঙলা ও উড়িষ্যা,' অনাদি মণ্ডলের আন্তর্জাতিক গল্প প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিক পুরস্কার প্রাপ্ত'ছোট গল্প'নামে প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেযোগ্য। নাটিকা পাঠ করেন শ্রীসিতাংশু মৈত্র (পরে ডক্টর) ও শ্রী অমর গঙ্গোপাধ্যায়।

যুগান্তরেব সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক খ্যাতিমান সমালোচক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত আলোচ্য বর্ষে সমিতিব সঙ্গে বিশেষ সহযোগিতা কবেন। সভাপতিরূপে কয়েকটি সভার কার্য পরিচালনা করে তিনি আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হন।

১১ই ফেব্রুয়ারী কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে সমিতি গৃহে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী।

শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার সেনের আহ্বানে ঢাকুরিয়ায় তাঁর বাস ভবনে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবার বিজয়া সম্মেলন ও রবীন্দ্র জয়ন্তীতে পৌরোহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় পবিত্রদা।

কলেজ স্কোয়ারস্থ ষ্টুডেন্টস্ হলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসবে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ডক্টর রথীন রায় সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীমতী রেবা লাহিড়ী, শ্রীমতী হাসি ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রেখা

দেবী, কুমারী গীতাবালা মজুমদার, শ্রীমতী রেনু দেবী, শ্রীমতী দীপিকা সান্যাল, শ্রীতারাপদ লাহিড়ী, শ্রী প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাবল্লভ দাশ, শ্রীসুধীর মল্লিক চৌধুরী প্রভৃতি বিভিন্ন সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মির্জাপুর স্পোর্টিং ক্লাবে শ্রী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। অধিবেশনে গম্ভীরা পরিষদ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীত সহযোগে গম্ভীরার পল্লী-গীতি সম্পর্কে ভাষণ দেন শ্রী অনিল ভট্টাচার্য। শ্রী প্রমথনাথ নাগ ছিলেন এই সভার আহ্বায়ক।

১৩৬২ সালে স্থায়ী সভাপতিরূপে শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সমিতির কার্য পরিচালনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশিষ্ট সদস্য ও সহকারী সভাপতিরূপে তিনি প্রায় তিরিশ বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এই বৎসর শ্রদ্ধেয় কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রীগোপাল হালদার, ডক্টর সুধাংশু-কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ ও শ্রীঅপূর্বমনি দত্ত মহাশয়গণকে সহকারী সভাপতিরূপে পাই।

এবার সমিতিতে নবাগত যাঁরা গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী শোভা হুই, শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, শ্রীমতী অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী উমা মৈত্র, শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীমৃণাল চৌধুরী, শ্রীরমেন ঘোষ, কুমার অজয়েন্দু নারায়ণ রায়, শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীস্মরজিৎ রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী শোভা হুইর বাসগৃহে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভায় শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় নিজের সাহিত্য জীবন সম্পর্কে দীর্ঘ এক ঘণ্টা ব্যাপী অতি সুন্দর একটি ভাষণ দেন। রাখাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাস ভবনে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় অধ্যাপক ডক্টর নিমাইসাধন বসু 'বিলাতে বাঙালী পিয়ন' নামে একটি সুন্দর রম্য রচনা পাঠ করেন। এই ধরনের কয়েকটি রম্য রচনা নিয়ে তিনি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছেন।

নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস ভবনে এক বৈঠকে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সবিতাদি' নামে একটি গল্প পাঠ করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র।

আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় আইনজীবী প্রতিনিধিদের মুখপাত্ররূপে শ্রীনীরদ-রঞ্জন দাশগুপ্ত বার-এট-ল চীন ভ্রমণ করেন। তিনি আমাদের এক সভায় তাঁর চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাঁর কাছেও আমরা তাঁর চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক কিছু শুনতে পাই।

এবার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে অধ্যাপক শ্রীসত্যপ্রসাদ সেনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামমোহন লাইব্রেরী হলে স্থায়ী সভাপতি মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্ত মহাশয় বাঙলা কাব্যে মিস্টি-সিজম বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই উৎসবে লোক নাটক পরিষদের সভ্যগণ শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এক অধ্যায়' নামে নাটক অভিনয় করেন।

১৩৬৩ সালে সমিতির সভাপতি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ডক্টর সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত। শুধু ইংরেজী নয় সংস্কৃতে ও বাঙলা সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়, বৈদিক সাহিত্যে অঙ্কশাস্ত্রেও তিনি গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। সরল প্রকৃতির অনাড়ম্বর এই মানুষটি দশ বৎসরকাল সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই বৎসর বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ও সুপরিচিত কথাশিল্পী শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন সহকারী সভাপতি।

মাসিকপত্র বিচিত্রার যুগে শ্রীঅসিত গুপ্ত বিশেষ প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন। আলোচ্য বর্ষে তিনি আমাদের একটি গল্প শোনান। অন্যান্য যাঁরা গল্প পড়েন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী শৈলজা চৌধুরাণী, শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য (বসিরহাট), শ্রীশৈলেন চৌধুরী, শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজগন্নাথ সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেরই রচনায় ভবিষ্যৎ সাফল্যের অঙ্গীকার ছিল।

এই বছর কয়েকজন নতুন কবিও সমিতিতে যোগ দেন। তার মধ্যে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্যের কবিতার বৈশিষ্ট্য সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীমতী প্রভাবতী ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রবোধ পাল, শ্রীচিত্ত সিংহ, শ্রীআবুল কাশেম রহিমুদ্দিন প্রভৃতি কবিগণ সমিতিকে চলার পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

শ্রীনলিনী ভদ্র আমাদের 'রাতের আকাশ' নামে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ শোনান। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাশশর্মা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসকে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরার জন্য সমিতি শ্রীযোগেশ বাগালকে এক বিশেষ সভা করে সংবর্ধনা জানান। তাঁর বহু গুণমুগ্ধ পাঠক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এ বছরে প্রতিভাধর লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু বাঙলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে। তিনি প্রায় বিশ বৎসর সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ থেকে সুরু করে তাঁর খ্যাতির দীপ্তি সমিতির বহু সদস্য বিশেষ আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা এক সভায় সমবেত

হয়ে এই শক্তিমান লেখকের স্মৃতিতর্পন করেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেনের পৌরোহিত্যে রবীন্দ্র জন্মতিথির আয়োজন হয়। অধ্যাপক শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ আলোচ্য বর্ষে সমিতির এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শ্রীনির্মল সেনের আহ্বানে বাগুইআটি আম্রকুঞ্জে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন খ্যাতিমান নাট্যকার শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে শ্রীদিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত 'কাঠবেড়ালী' নামক একখানি নাটিকা পাঠ করেন। আবৃত্তি, কবিতা পাঠ ও সঙ্গীত অনুষ্ঠানের পর আহ্বায়ক নির্মলবাবু সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

বঙ্গবাসী কলেজ হলে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর শশিভূষণ দাশ-গুপ্ত সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

সঙ্গীত পরিবেশনে যাঁরা সদস্যদের আপ্যায়িত করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী রেণু ভৌমিক, শ্রীমতী দীপা ও শিখা বর্মন। শ্রীমতী উর্মিমালা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গম্ভীরা পুরষদের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৩৬৪ সালে সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। সহকারী সভাপতি ছিলেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ও কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। যুগ্ম সম্পাদক শ্রী সুনীল বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। সহ-সম্পাদক ছিলেন শ্রী তপন সেন ও শ্রী শৈলেন চৌধুরী।

এবার নতুন যারা গল্প পড়েন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী শীতাংশু মৈত্র, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, মানবেন্দ্র পাল, শৈলেন চৌধুরী, মনোজেন্দ্র চক্রবর্তী, সুভাষ সিংহ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতীন্দ্রমোহন সেন ও শ্রী অপূর্বমনি দত্ত যথাক্রমে '১৮৫৭ সাল' এবং 'স্বরবর্ণ ও মনস্তত্ত্ব' নামে দু'টি প্রবন্ধ পড়েন। মতীনবাবু তাঁর প্রবন্ধে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা করেন। সুনীলবাবুর প্রবন্ধের নাম 'ছোট গল্পে জগদীশ গুপ্ত' ও 'রায়গুনাকর ভারতচন্দ্রের কাব্য'।

অমিয়া সেন, শ্রীমতী প্রভাবতী ভট্টাচার্য ও সর্বশ্রী শিবেন চট্টোপাধ্যায়, রমেন ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকেই কবিতা পাঠ করেন।

সমিতি শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য এক বিশেষ সভার অনুষ্ঠান করেন। ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রী প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত। খ্যাতিমান নাট্যকার শ্রীদিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙলার রঙ্গমঞ্চের উপর

শরৎচন্দ্রের প্রভাব' শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেন।

আলোচ্যবর্ষে ডক্টর সুধাংশুকুমার সেনগুপ্তের দুর্ঘটনাজনিত আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদের প্রতিষ্ঠান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি প্রায় সমস্ত অধিবেশনে যোগদান করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার দ্বারা অধিবেশন গুলোকে প্রাণবন্ত করে রাখতেন। যাঁর সরল অমায়িক ব্যবহারে প্রত্যেকেই মুগ্ধ হত, তাঁকে হারাবার ক্ষতি কবে যে পূর্ণ হবে জানি না!

অধ্যাপক শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য্যর পৌরোহিত্যে সমিতি তাঁর স্মৃতি সভার আয়োজন করে। স্মৃতি তর্পন করেন সর্বশ্রী শৈলেন বিশ্বাস, রমেশচন্দ্র সেন, সুধীর সেন ও স্থায়ী সভাপতি মহাশয়।

এই বছর জগদীশ গুপ্ত ও অন্নপূর্ণা গোস্বামীর পরলোক গমনে সমিতি তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

এবার চোরবাগান লেনের শ্রীমনীন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে কাজী আবদুল ওদুদের পৌরোহিত্যে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বালিকা শিক্ষা সদনে খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীগোপাল হালদার। ঐ সম্মেলনে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে 'বাঙলার শিশুসাহিত্য' ও 'আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা' নামে দুইটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

১৩৬৫ সালে, প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সহসভাপতি ছিলেন শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ ও ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। সম্পাদক ছিলেন শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রফুল্ল ভট্টাচার্য, পরিচালক শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। অধ্যাপক দিলীপ গুপ্ত প্রথমে কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন, পরে ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেন।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীমতী হিরন্ময়ী বসু, শ্রীমতী অমিয়া সেন, সর্বশ্রী রমেশচন্দ্র সেন, মানবেন্দ্র পাল, অবিনাশ সাহা, কালিদাস রক্ষিত, অমরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত গুহ ঠাকুরতা, পরেশ ধর, ফণীন্দ্রমনি দত্ত, জগন্নাথ সরকার, হরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে গল্প পাঠ করেন।

এই বৎসর শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী ও শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত নতুন টেকনিকে লেখা দুইটি গল্প পাঠ করেন। এই বিশেষ ধারায় গল্প লিখে সম্প্রতি যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে প্রবোধবাবু, অজয়বাবুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাটক পাঠ করেন শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায় ও অজিত গুহ ঠাকুরতা।

কবিতা পাঠ করেন শ্রীমতী অমিয়া সেনগুপ্তা, শ্রীমতী প্রভাবতী ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবাদল সেন, শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীরমেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপদ সেন ও আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন।

বিভিন্ন সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন সর্বশ্রী সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, চিত্তরঞ্জন দেব, অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ।

শ্রীমতীন্দ্রমোহন সেন 'বেড়াচাঁপা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি 'বেড়াচাঁপা'য় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যবান কতগুলি বস্তুর উল্লেখ করে দেখাবার চেষ্টা করেন যে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত এই স্থানটির ঐতিহাসিক মূল্য ও মর্যাদা অনেকখানি। আলোচ্য সভায় সভাপতি ছিলেন ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' সম্পর্কে আলোচনা হয়। সঙ্গীতাচার্য শ্রীসুরেশ-চন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, শ্রীদীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক দিলীপ গুপ্ত, গম্ভীরা পরিষদের শ্রীতারাপদ লাহিড়ী ও শ্রীরমেশচন্দ্র সেন পল্লীগীতি সম্পর্কে চিত্তবাবুর অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার বিশেষ সুখ্যাতি করেন।

মহাবোধি সোসাইটি হলে শ্রীআবুল কাশেম রহিমুদ্দিনের উদ্যোগে শারদ সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভাপতি ও শ্রীমনোজ বসু প্রধান অতিথি ছিলেন। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী। বিখ্যাত শিল্পীগণ কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশনের পর আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন একটি সুন্দর আবৃত্তি করেন।

শ্রীভুপেশ পাল মহাশয়ের টালা পার্কস্থিত ভবনে শ্রীসিতাংশু মৈত্র 'মাইকেল' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। যে প্রবন্ধাবলীর জন্য তিনি ডি. ফিল উপাধি প্রাপ্ত হন আলোচ্য নিবন্ধটি তার অন্যতম। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধটির বিশেষ প্রশংসা করেন।

বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটস্থ শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র এ্যাডভোকেট মহাশয়ের বাসভবনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সর্বশ্রী

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী ও শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীমতী মায়া সেন, শ্রীঋষীন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ অনেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শ্রীমতী হিরন্ময় বসুর সেভেন ট্যাঙ্কস্ লেনস্থ বাসভবনে শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।'বিজয়ার তাৎপর্য ও বিজয়া অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করে অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ সভার উদ্বোধন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনীরেন চৌধুরী, শ্রীরঞ্জিত রায় ও কুমারী স্মৃতিকণা সেন। শ্রীমতী বসু উপস্থিত সভ্যগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

বিবেকানন্দ রোডস্থ বালিকা শিক্ষা সদনে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই সম্মেলনে এ্যাডভোকেট শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী মহাশয় সঙ্গীত সহযোগে 'নোয়াখালি গীতিকা'র ঐতিহ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

১৩৬৬ সালে তারাশঙ্কর সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। যুগ্ম সম্পাদক হন শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রদ্ধেয় কাজী আবদুল ওদুদ ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র। এই অধিবেশনে সুসাহিত্যিক বীরেশ্বর বসু একটি কবিতা পাঠ করেন।

মাইকেলের কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে এক বিশেষ আলোচনা সভার ব্যবস্থা হয়। ডক্টর শীতাংশু মৈত্র তাঁর 'যুগন্ধর মধুসূদন' পুস্তকে মাইকেল মহাকবি ছিলেন না, এই অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তিপূর্ণ একটি আলোচনা করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি সুনীল বাবুকে সমর্থন করে বলেন ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি তাঁর মনে জাগরূক ছিল তাই মাইকেল মেঘনাদ বধের মত কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

এই বছরই আমরা প্রথম বনফুলকে পাই। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীমতী শান্তি দাশগুপ্ত 'নার্শিসাস' নামে গল্প পাঠ করেন। যুগান্তরের ইংলণ্ডস্থ বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 'বিলেতে ভারতীয়' শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেন। বনফুল উপস্থিত সদস্যদের কাছে তাঁর সাহিত্য জীবন

সম্পর্কে আলোকপাত করে সভার শেষে 'সরস্বতী' নামে স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে তাঁর বৈঠকখানা স্ট্রীটস্থ বাসভবনে সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীহারীত কৃষ্ণ দেব। শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি কবিতা ও শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চর্যাপদের হরিণী' নামে একটি গল্প পাঠ করেন। সর্বশ্রী সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্প ও কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চন্দ্রের ২২৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ বাসভবনে শ্রীমনন্দ্রী রায়ের সভাপতিত্বে কবি-সম্মেলন হয়। সর্বশ্রী মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য, তরুণ সান্যাল, নচিকেতা ভরদ্বাজ, আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন ও সভাপতি মহাশয় স্বয়ং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তারপর সভাপতি মহাশয় আধুনিক কবিতার গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের পরলোকগমনে কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমিতে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে এক শোকসভা হয়। শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ডক্টর রামচন্দ্র অধিকারী ও শ্রীসুমন্ত চট্টোপাধ্যায় নাট্যাচার্যের জীবন ও নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় বাঙলার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের অবিস্মরনীয় অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এ বছর সমিতি পরম শুভানুধ্যায়ী প্রাক্তন সভাপতি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে হারায়। শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সম্মিলিত হয়ে সভ্যগণ তাঁর স্মৃতিতর্পণ করেন। তারাশঙ্কর, সর্বশ্রী হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য স্বর্গতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। শ্রীরবীন্দ্র নাথ মিত্র এ্যাডভোকেটের বাসভবনে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী মায়া সেন ও রাজেশ্বর মিত্র, শ্রীঋষীন্দ্রনাথ মিত্র এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রবীন্দ্র প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন সর্বশ্রী রামপদ মুখোপাধ্যায় ও হীরেন মুখোপাধ্যায়।

তারাশংকরের সভাপতিত্বে ও শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের পাইক পাড়াস্থ বাসভবনে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও বিজয়ার শুভেচ্ছা

আদান প্রদানের পর সমিতির আগামী স্বর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য তারাশংকরকে সভাপতি এবং শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও কাশিমবাজারের মহারাজকুমার সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দীকে সম্পাদক ও সর্বশ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ দক্ষিণা রঞ্জন বসু, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেব প্রমুখ সুধীগণকে নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়। সভাপতির সময়োচিত ভাষণের পর একটি বন্যাত্রাণ তহবিল খোলার প্রস্তাব করেন ও নিজে দশ টাকা দেন। সভাস্থলে পঞ্চাশ টাকা সংগৃহীত হয়। এই তহবিলের ভার পড়ে গৌরীশঙ্কর বাবুর ওপর। আলোচ্য বর্ষে নিজ নিজ বাড়িতে সমিতির অধিবেশনের স্থান দান করে এবং সভ্যগণকে আপ্যায়িত করে ডাঃ সত্যেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীদীনেশ গঙ্গোপ্যধ্যায়, শ্রীঅজিত সেন আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। অজিতবাবুর বাড়ির সভায় সভাপতিত্ব করেন সুসাহিত্যিক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

এবারে যাঁরা গল্প পাঠ করেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী প্রবোধ অধিকারী অবিনাশ সাহা, অজয় দাশগুপ্ত, শ্রীমতী শান্তি দাশগুপ্তা, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ভারত পুত্রম, পুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীঅমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও সুভাষ সমাজদারের নাম উল্লেখযোগ্য।

আগামী স্বর্ণ জয়ন্তীর কথা বিবেচনা করে ১৩৬৬র শেষে কার্য নির্বাহ সমিতির আর নূতন কোন নির্বাচন হয় নি। পূর্ব বৎসরের কর্মকর্তারাই কাজ চালাতে থাকেন। চলতি বছরে (১৩৬১) সমিতির প্রথম সভা আহ্বান করেন শ্রীপ্রদ্যোৎ সেন, শ্রীনলিনীকিশোর গুহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই সভায় শ্রীমতী অমিয়া সেনগুপ্ত ও শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য কবিতা পাঠ করেন। গল্প পড়েন শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। রাজশেখর বসুর পরলোক গমনে শ্রীরমেশচন্দ্র সেনের পৌরোহিত্যে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় রাণা বসু, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেক সাহিত্যরসিক স্বর্গত পরশুরামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

আলোচ্য বর্ষে গল্প পড়েন শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅপূর্ব মিত্র, শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল রায়, অনিমেষ রায়চৌধুরী ও শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। এইসব সভায় সভাপতিত্ব করেন সর্বশ্রী সজনীকান্ত দাস, শৈলজা চৌধুরাণী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভারতী পরিষদের আহ্বানে এক বিশেষ সভায় শ্রীরমেশচন্দ্র সেন গল্প পাঠ

করেন। শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পড়েন 'কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ।

এবার কবিতা পড়েছেন সর্বশ্রী রাম বসু, গোপাল ভট্টাচার্য, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণাসিন্ধু দে, রবিপ্রসাদ চক্রবর্তী, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও সিদ্ধেশ্বর সেন।

শ্রীচিত্ত সিংহের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীশিবনারায়ণ রায় 'সাহিত্য ভূমিকা' নামে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

শচীন সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে শ্রীবিনয় ঘোষাল 'ঝুমঝুমি' নামে হাস্যরসাত্মক এক নাটিকা পাঠ করেন।

আলোচ্য বর্ষে আমরা বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আমাদের মধ্যে পাই। তাঁর পৌরোহিত্যে কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীটস্থ অতুল ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব রবীন্দ্রনাথ ও রাষ্ট্রভাষা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আর এক সভায় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু 'সভ্যতার গতিপথে সংস্কৃতি' নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন এক সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

স্থায়ী সভাপতি তারাশঙ্কর ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য মনোনীত হওয়ায় সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব তাঁকে মাল্যভূষিত করেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন তারাশঙ্করের সঙ্গে সমিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলার পর তারাশঙ্কর তাঁর এই নবলব্ধ সম্মান লাভের পিছনের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীগৌরীশঙ্কর বাবুর বাড়িতে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন বিজয়রত্ন সেন, শ্রীমতী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের সঙ্গীত পরিবেশনের পর গৃহস্বামী সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

শ্রীরাধিকা দত্তের আহবানে কালিদাস সিংহ লেনে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন কথাশিল্পী শ্রীমনোজ বসু। জলযোগের পর সভা শেষ হয়।

সমিতি-গৃহে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিশেষ সভা হয়। শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় 'হেমচন্দ্র' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে হেমচন্দ্রের প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। স্বরচিত কবিতা

পাঠ করেন শ্রীমতী যূথিকা দাস ও শ্রীঅবনী বিন্দু।

সভাপতি মহাশয় কবিতাগুলির প্রশংসা করে হেমচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন।

আলোচ্য বর্ষে পরম শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু শুধু এই প্রতিষ্ঠানের নয়, বাংলাদেশের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্য। তাঁর মহনীয় চরিত্র, উদারতা, সাহিত্যে তাঁর অবদান, ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে কাসিমবাজার রাজভবনে এক সভা হয়। বহু সুধী সাহিত্যিক এই সভার কার্যে অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গের বীর সন্তান প্যাট্রিক লুমুম্বার বর্বরোচিত হত্যার নিন্দা এবং তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদ্বয়ের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করে সমিতি বিশেষ এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বর্তমান বৎসরে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরমেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় সমিতির পক্ষ থেকে সেরা সেরা লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্প নামে একখানি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। বইখানি কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। প্রথমে স্থির হয় যে উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীরমেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় বইখানি বেরুবে। ভূমিকা লিখবেন ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্ত। উপেন্দ্রবাবুর মৃত্যু হওয়ায় সংকলন খানি প্রকাশে বিলম্ব হয়ে গেল। শ্রদ্ধেয় উপেনবাবুর স্থলে সম্পাদনার ভার নিয়েছেন শৈলজানন্দ। সুধাংশু বাবুর পরিবর্তে ভূমিকা লিখেছেন ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রখ্যাত গল্প লেখকদের প্রায় সকলেরই গল্প এতে স্থান পেয়েছে। বইখানির প্রকাশের ভার নিয়ে সমিতির অন্যতম সদস্য 'কথাকথা'র সত্বাধিকারী শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

গত পঞ্চাশ বৎসরে যাঁদের সহানুভূতির ফলে সমিতি আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে নিজ নিজ বাটীতে ও প্রতিষ্ঠানে স্থান দান করে যাঁরা আমাদের আপ্যায়িত করেছেন, সভাপতিত্ব করে ভাষণ দান করে ও রচনা পাঠ করে যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানে জীবনরস সঞ্চারিত করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আজ আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। স্বর্গতরা সমিতিকে আশীর্বাদ করুন, নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে সমিতিকে আজও যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের সহানুভূতি লাভে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। এইখানে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা তিনটি নাম উল্লেখ করছি, তাঁরা হলেন শ্রীসম্মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস রায়চৌধুরী ও শ্রীভুপেন্দ্রনাথ সরকার।

সম্মোহন বাবু আজ তিরিশ বৎসর যাবৎ সমিতির প্রতিটি সাধারণ ও বিশেষ বৈঠকে বিনামূল্যে উপযোগী আসবাবপত্র দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন। এক বৎসর তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক।

হরিদাসবাবু আমাদের কোন অধিবেশনে যোগ দেন নি, কোন প্রীতিসম্মেলনের আনন্দের ভাগীদার হন নি। কিন্তু নেপথ্যে থেকে নীরবে সর্বপ্রকারে আমাদের সাহায্য করেছেন।

সমিতি ভুপেন সরকার মহাশয়কে কর্মীরূপে পেয়েছে আজ মাস কয়েক। কিন্তু জয়ন্তীর কার্যে তাঁর নিরলস, ঐকান্তিক সাহায্যের কথা স্মরণ না করলে প্রত্যবায় ঘটবে।

সর্বশেষে আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের নমস্কার জানাই।

১৩১৮—১৩৬৮

পরিশিষ্ট—এক

রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪—১৯৬২)

রচনাপঞ্জী

রমেশচন্দ্র সেনের পূর্ণাঙ্গ রচনাপঞ্জী কবে তৈরী হবে জানি না। ১৯৮৬ সালের জুন মাসে 'রমেশচন্দ্র সেনের গল্প' সংকলনটি সম্পাদনার সময় পরিশিষ্ট অংশে যে তালিকাটি দিয়েছিলাম তার খুব বেশী হেরফের হয়নি। শুধুমাত্র রমেশ চন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার সেনের সংরক্ষিত ভাণ্ডার থেকে পত্রিকায় প্রকাশিত 'সেলিরানা' নামে একটি উপন্যাসের সম্পূর্ণ কাটিং-এর খোঁজ পেয়েছি। ইচ্ছে ছিল সেটিও এই সঙ্গে রাখার। স্থানাভাবে তা আর হল না।

আগের মতই এবারও রমেশবাবুর রচনাপঞ্জীকে দু-ভাগে ভাগ করে দিয়েছি। বলা বাহুল্য এটি কোন ভাবেই তাঁর রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। আশা করা যায়, বাংলা সাহিত্যের কোন রমেশরসিকের হাতে এ বিষয়টি পূর্ণাঙ্গরূপ পাবে।

গ্রন্থিত রচনা

শতাব্দী (উপন্যাস)। প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩ ২। প্রথম সংস্কবণ, আশ্বিন ১৩৫২। প্রকাশক: গিরীন চক্রবর্ত্তী, পূরবী পাবলিশার্স।

চক্রবাক (উপন্যাস)। প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৫২। প্রকাশক: সুহৃদকৃষ্ণ পাল। শ্রীগুরু লাইব্রেরী।

কুরপালা (উপন্যাস)। প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৩। পূরবী পাবলিশার্স। গ্রন্থকারের ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট সম্বলিত।

কাজল (উপন্যাস)। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯। দ্বিতীয় মুদ্রণে প্রকাশ কাল উল্লেখ নেই। প্রকাশক: রবীন্দ্রনাথ দত্ত, শতাব্দী ভবন।

মৃত ও অমৃত (গল্প সংকলন)। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯। প্রকাশক, পূরবী পাবলিশার্স। সংকলিত গল্প: ডোমের চিতা, বিয়োগান্ত, অন্তর ও বাহির, কাশ্মীরী তুষ, তারা তিন জন, এক ফালি জমি, স্বর্ণ ও লৌহ, মৃত ও অমৃত, পদ্মা, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, প্রেত, হারানী।

কয়েকটি গল্প (গল্প সংকলন)। প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৯। প্রকাশক: পূরবী পাবলিশার্স। সংকলিত গল্প: ভিখারীর জন্ম, খোসা, সাদা ঘোড়া, ইউকে

আর, রাজার জন্মদিন, সাকীর প্রথম রাত্রি, কোন্টাকী পাশা, রোগ নির্ণয়, ষৈবন, টাইমটেবিল, লটারির টিকিট, দুধোরা, কৈলাস।

গৌরীগ্রাম (উপন্যাস)। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩। প্রকাশক ঃ প্রফুল্ল বোস, মিত্র ও ঘোষ।মালঙ্গীর কথা (উপন্যাস)। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪। প্রকাশক ঃ সুমথনাথ ঘোষ, মিত্র ও ঘোষ। পূব থেকে পশ্চিম (উপন্যাস)। প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩। প্রকাশকঃ জে সি সাহা রায়, ভারতী লাইব্রেরী।

তারা তিন জন (গল্প সংকলন)। প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৪। প্রকাশকঃ এস্ চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল কুমুদ লাইব্রেরী। সংকলিত গল্পঃ তাতু হাকিম, ছেলের চাকরি, সৈনিক, বিন্দি, অফিসের কাপড়, সাদা ঘোড়া, রাজার জন্মদিন, এক ফালি জমি, অকুল, মৃত ও অমৃত, টাইম টেবিল, তারা তিন জন।

সাগ্নিক (উপন্যাস)। প্রথক সংস্করণ, কার্ত্তিক ১৩৬৬। প্রকাশিকা: আভারাণী মিত্র, সাহিত্য। নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ (উপন্যাস)। প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৬। প্রকাশকঃ রবীন্দ্রনাথ দত্ত, গ্রন্থ ভবন।

অপরাজেয় (উপন্যাস)। প্রথম প্রকাশ, ১৮৮২ শকাব্দ। প্রকাশিকা সুচরিতা দাস, নিউ স্ক্রিপ্ট। শ্রেষ্ঠ গল্প (গল্প সংকলন)। প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৭। প্রকাশক ঃ ক্ষিতিশ দাশগুপ্ত, কতকথা প্রকাশক। সম্পাদকঃ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সংকলিত গল্পঃ সাদা ঘোড়া, ষৈবন, ভিখারীর জন্ম. খোসা, এক ফালি জমি, কাশ্মীরী তুষ, সাকীর প্রথম রাত্রি, ডোমের চিতা, তারা তিন জন, টাইম টেবিল, ভাত, রোগ নির্ণয়, লটারির টিকিট, গ্রহ বৈগুণ্য, কৈলাস, অন্তর ও বাহির, রাজা, প্রায়শ্চিত্ত, মানরক্ষা, জেন্টল ম্যান অ্যান্ড কোং, পুষ্করা, ওরাং ওটাং, পদ্মা, রাজার জন্মদিন।

পূর্বরাগ (উপন্যাস)। প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৬৮। প্রকাশকঃ শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত, ক্লাসিক প্রেস। 'দেশে' প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'টিকি বনাম প্রেমে'র নামান্তর।

রমেশ চন্দ্র সেনের গল্প (গল্প সংকলন)। প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৮৬। প্রকাশক: সৌরাংশু সাহা। প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণ প্রেস। তারাপ্রসন্ন মার্কেট, আসানসোল—১। সম্পাদকঃ সমীর রায়, সমর চন্দ। সংকলিত গল্পঃ ডোমের চিতা, মৃত ও অমৃত, প্রেত, এক ফালি জমি, রাজার জন্মদিন, জেন্ট্ল ম্যান এ্যান্ড কোং, তারা তিন জন, ষৈবন, কোন্টাকী পাশা, হারাণী, কাশ্মীরী তুষ, সাদা ঘোড়া, স্টুয়ার্ড ডিচ্, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নাম্বার ফোর।

অগ্রন্থিত রচনা

ঋণ শোধ/উৎস/মাঘ/১৩৩৬ দুঃখের ভাগী/মাসিক বসুমতী / ১৩৩৬ ছুটির/ দিনে/বিচিত্রা/১৩৩৬ দীপনা/মাসিক বসুমতী/চৈত্র/১৩৩৬ নেশা/বিচিত্রা/ কার্ত্তিক /১৩৩৬ অগ্নিসংস্কার/উৎস/বৈশাখ/১৩৩৭ কেলো/আত্মশক্তি/১৩৩৭ কৌশল /বিচিত্রা/১৩৩৭ ব্যবচ্ছেদ/গল্পলহরী/মাঘ/১৩৩৮ /ভৈরবের /পথে সর্বহারা/জৈষ্ঠ ১৩৩৮ অকল্যাণ/উত্তরা/বৈশাখ/ ১৩৪০ ফাঁসির আসামী/রূপনন্দা/চৈত্র/১৩৪৪ নিজের দেওয়া চিহ্ন/সোনার বাংলা/শারদীয় ১৩৪৫ আকর্ষণ/ঐ /১৩৪৬ দূর ও নিকট/উত্তরা/ফাল্গুন/১৩৪৭ পাইস হোটেল/বঙ্গশ্রী/জ্যৈষ্ঠ্য/১৩৪৭ বিশ্বকাব /নবশক্তি/ভাদ্র/১৩৪৮ পড়ন্ত রোদের যাদু/ভারত/শারদীয/১৩৪৮ দসহরে প্রভাতী/চৈত্র/১৩৪৮ দুর্গাললিত প্রত্যহ/আশ্বিন/.৩৪৯ মণ্টুর দাদু/সোনার বাংলা/শারদীয়/১৩৫০ হ্যাপি কপ্‌লে (অথবা পশ্চাত্তাপ /উত্তরা/অগ্রহায়ণ/১৩৫৩ দুনম্বর/অনির্বাণ/মাঘ/১৩৫৪ রাজ আলিঙ্গন/অভিযাত্রী/১৩৫৯ রক্তক্ষরা/বঙ্গশ্রী ১৩৫৯ দাদু ও নাতনি/শারদীয় মুখপত্র/১৩৬১ ফাটল/নযা দম দম/শারদীয় ১৩৬৬ কাজ ফুরোলে/সীমান্তের কথা/কার্ত্তিক/১৩৬৬ ফাঁক/আবাহন/শারদীয ১৩৬৭ দরদী/সোনার বাংলা/শারদীযা/১৩৬৭ জাতিস্মব/পথ ওপ্রান্তর/শারদ ১৩৬৮ অপরিচিত/রূষ ভারতী/মে-জুলাই ১৩৬৯ কুশপুত্তলিকা/রুষ ভারতী ১৩৬৯ লাল পাখী/আলোক সরণি/শারদ/১৩৭৭ বেকার বৈঠক/ ইতো নষ্টঃ / উত্তরাধিকার / রূপান্তর / স্পাই / এক্সপেরিমেণ্ট/ দেশ ত্রিশঙ্কু/ কোকেনরাণী/ মুকুব /অকূল/চিরন্তনী শারদীয় যুগান্তর মধ্যাবিন্দু/ আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা/রূপান্তর অমৃত/প্রতিবিম্ব/সুরুচি/সেতু নতুন পত্রিকা/উপেক্ষিতা/ সৃষ্টি/ এ্যালুমিনিয়মের/ পোঁচ/আবাহন/ হেমন্তীর চিঠি/ প্রভাতী ফিল্ম ফেস /ভারততীর্থ/হীরার চুড়ি প্রভাতী/ রাজপথে/মাসিক বসুমতী/ জেলের পাখী নবশক্তি/১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা দরদী/১ম বষ ১৩শ সংখ্যা/ গল্প না কবিতা প্রচারক /জাগো হিন্দুস্থান সাহানা /ছত্রিশ নম্বর নবশক্তি ১ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা গে য়ো যোগী আজকাল জনক/হতাশ/ প্রেমিক মানত/শ্মশান বৈরাগ্য/শাশ্বত/অল ইণ্ডিযা লাভার্সকারেন্স (হাতে লেখা) অল ইণ্ডিয়া হাজব্যাণ্ডস কনফারেন্স/টেলিফোনে (নক্সা) ভগ্নদূত ২য় বর্ষ ৪৯শ সংখ্যা দফতর কী ধোতী হিন্দী অনুবাদ ঃ নন্দিতা চ্যাটার্জী হিন্দুস্থান ডিসেম্বর ১৯৫৭ সফেদ ঘোড়াহিন্দী অনুবাদ ঃ গোবিন্দ লাল চ্যাটার্জ্জী আজকাল ডিসেম্বর ১৯৫৯ পম্মাইংরাজী অনুবাদঃ এস. কে. সেনগুপ্ত প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানা যায় নি। আমাদের কলেজ সেণ্টিনারি সুভেনুর বিদ্যাসাগর কলেজ ১৮৫৯-১৫৯৯ সেলিরিণা (উপন্যাস) শারদীয় মধ্যবিত্ত।

পরিশিষ্ট—দুই

রমেশ সম্বর্ধনা

রমেশচন্দ্র সেন একবারই সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। সম্বর্ধনার আগে আনন্দ-বাজার, হিন্দুস্থান, যুগান্তর প্রমুখ পত্রিকায় নিম্নোক্তরূপ একটি সংবাদ ছাপা হয়ঃ

সাহিত্যিক শ্রীরমেশচন্দ্র সেনের সম্বর্ধনা

বাংলার নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকবৃন্দ আগামী ২৮শে আগষ্ট, রবিবার সাহিত্য সেবক সমিতির সহযোগিতায় 'শতাব্দী', 'কুরপালা', 'কাজল' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক শ্রীরমেশচন্দ্র সেনকে সম্বর্ধনা জানাইবেন। আমরা সকল সাহিত্যিক সাংবাদিক ও সাহিত্যানুরাগীদিগকে এই সম্বর্ধনা উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে আহ্বান জানাইতেছি। এ সম্পর্কে উৎসাহী ও সাহায্যপ্রেরণকারীগণ রমেশ সম্বর্ধনা কমিটির আহ্বায়ক শ্রীমৃণালকান্তি সাহা, ২১, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট কলিকাতা—৭ এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন। নিবেদন ইতি—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসরোজ রায়-চৌধুরী, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, ডক্টর সুধাংশু সেনগুপ্ত ও শ্রী নীরদ দাশগুপ্ত।

এই সম্বর্ধনা সভায় পৌরোহিত্য করেন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রমেশচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা একটু বিলম্বে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার রচনা সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হইবে।

সর্বশ্রী নরেন্দ্রদেব, নলিনীকিশোর গুহ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ সুধা শু সেনগুপ্ত, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিরাও বক্তৃতা করেন।

মোহিতলাল ও মজুমদার এই সম্বর্ধনা সভায় আহূত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য উপস্থিত থাকতে পারেন নি। একটি চিঠি দিয়ে তিনি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন। চিঠিটি হুবহু ছেপে দেওয়া হল ঃ

(২৪ পরগণা)

প্রীতিভাজনেষু, ইং ২৪।৮।৪৯

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্বর্ধনা করিতে যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি। রমেশচন্দ্র অসুস্থ

শরীরেও দীর্ঘকাল যে রূপ নিষ্ঠার সহিত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বাংলার অধিকাংশ প্রবীণ ও নবীন সাহিত্য সেবক তাঁহার শ্রদ্ধা স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়া যে ঋণে আবদ্ধ আছেন সেই ঋণ স্বীকার করিবার এই উপলক্ষ্যটি বড়ই শোভন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমিও তাঁহাদের সহিত অন্তরে যোগদান করিয়া আনন্দলাভ করিতেছি—সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিলে কর্ত্তব্য আরও সুসম্পন্ন হইত, কিন্তু স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব হইল না বলিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত আছি। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র শুধুই সাহিত্য প্রেমিক নহেন—সাহিত্য রচনাতেও তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সামান্য নহে।

আমি তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা কবি, তিনি যেন সুস্থ হইয়া তাহার সাহিত্যিক-সেবা ও সাহিত্যসেবা-ব্রত আশানুরূপ উদ্‌যাপন করিতে পারেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পরিশিষ্ট—তিন

পত্রগুচ্ছ—রমেশচন্দ্র সেনকে মোহিতলাল মজুমদার

দুঃখের বিষয় রমেশচন্দ্র সেনের লেখা কোন চিঠি খুঁজে পাইনি। চিঠি নিশ্চয়ই তিনি লিখতেন। তা না হলে অন্যদের চিঠির জবাব দিতেন কিভাবে। এখানে রমেশবাবুকে লেখা মোহিতলালের দুটি চিঠি ছাপা হল। দুটিই রমেশ-বাবুব উপন্যাস 'শতাব্দী' সম্পর্কিত। প্রথমটি রমেশবাবুর চিঠি এবং 'শতাব্দী' পাওয়ার পর এবং দ্বিতীয়টি 'শতাব্দী' পাঠের পর মোহিতলালের প্রতিক্রিয়া।

বাগনান

শ্রদ্ধাস্পদেষু ১৬ ১.৪৬

আপনার বই এবং পত্র পাইয়াছি। বইখানি ধীরে ধীরে পড়িতেছি—এ পর্যন্ত ভালই লাগিয়াছে। আশা করি শেষ পর্যন্ত ভালই লাগিবে। এখন কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, আপনার উপন্যাসের বিষয় যে সমাজ—সেই সমাজের চিত্র এমনভাবে আর কেহ এ পর্য্যন্ত আঁকেন নাই। আর একটি কথা এই যে, আপনার ভাষা চমৎকার। পরে আমার অভিমত জানাইব।

আপনার কুশল প্রার্থনা করি। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন (বি. এন. আর)

শ্রদ্ধাস্পদেষু ২৫। ১। ১৯৪৬

আপনার 'শতাব্দী' পড়া শেষ হইয়াছে। আমি অন্যত্র উহার পরিচয়মূলক আলোচনা করিব। আপনার পত্রের উত্তরে এই কয়টি কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি।

বইখানি পড়িয়া আপনাকে অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনি আমাকে বিস্মিত করিয়াছেন। এই উপন্যাস একটি সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। ইহা বাংলা কথাসাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এমনও মনে হইতেছে আপনি নবযুগের নবজীবনের সহজ ছন্দটি ধরিতে পারিয়াছেন—একেবারে বাংলার বাঙালীর নবজীবন। এই উপন্যাস এমন সময় বাহির হইয়াছে, যখন আমাদের মহারথীরা তাঁহাদের সকল শক্তি ইতিমধ্যে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন—এখন নিজ নিজ সরস্বতীকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া চিৎকার ও আর্ত্তনাদ করাইতেছেন। আপনার লেখাটিতে কি ভাবে, কি ভাষায় কোথাও চীৎকার নাই। দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ তেমনি স্থির; কল্পনা অতিশয় সংযত—কোনখানে অতিরিক্ত রং বা মসলা নাই, ভাষাও তদুপযুক্ত। এই ভাষাই আপনার রচনাটির জীবন—উহাই আপনার প্রধান কৃতিত্ব আপনার দৃষ্টি বা মনোভাব, কল্পনার সমগ্ররূপ রচনার যাহা কিছু কৌশল তাহা এই ভাষাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে; ঐ ভাষাই তাহা ধরিয়া আছে। সকল শ্রেষ্ঠ রচনার লক্ষণ ইহাই—ভাষাই সব; প্রেরণা যদি সত্য এবং সম্পূর্ণ হয় তবে লেখক তাহার উপযুক্ত ভাষাও লাভ করেন. ঐ ভাষাই তাহার স্ফূর্তি। উহাই শক্তি উহাই আনন্দ। এই উপন্যাসে আপনি কোথাও এতটুকু আত্মভ্রষ্ট হন নাই অর্থাৎ ফাঁকি দেন নাই—আপনার সারা জীবনের ধ্যান, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইহার সকল উপকরণ যোগাইয়াছে—একটা জীবনের যাহা কিছু সঞ্চয় এবং প্রাণপূর্ণ উপলব্ধি আপনি ইহাতে ঢালিয়া দিয়াছেন; তাই ইহা এত সত্য ও সফল হইয়াছে। আমার বিশ্বাস আপনি আর কোন উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিবেন না, করিলেও তাহা পুনরাবৃত্ত হইবে মাত্র, আবশ্যকও নাই, কারণ অন্যে অনেক লিখিয়া একটাতে সিদ্ধিলাভ করে, আপনি একটাতেই তাহা করিয়াছেন।

এই উপন্যাসে আপনি বাঙালী জীবনের তথা সমাজের একেবারে মূলে বা তলদেশে দৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই জীবনের অতিশয় সরল ও সহজ ধারাটিকে আধুনিক কালের বিশাল জীবন সমুদ্রে মিলাইয়া দিয়াছেন। অথচ কোন মতভেদের উগ্রতা নাই, চরিত্র সৃষ্টিতে কোন জটিলতা নাই—নাটকীয়

ঘটনার চমক বা কাব্য কল্পনার রঙও নাই। নায়ক রাজেশ্বরের জীবন ও তাঁহার চরিত্রকে ঘেরিয়া যে চরিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহারা যেমন স্বতন্ত্র ও সজীব তেমনি কাহিনীরও সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হইয়াছেন। নায়ক চরিত্রে যে বিকাশ এই উপন্যাসে দেখানো হইয়াছে, যাহাকে ইংরাজীতে growth বা development বলে, এমন আমি বাংলা উপন্যাসে অল্পই দেখিয়াছি। তার কারণ এই চরিত্রটি যেমন উপন্যাসের মেরুদণ্ড, তেমন ইহার স্বরূপটি আপনার কল্পনায় অতিশয় সত্য ও গভীরভাবে ধরা দিয়াছিল—ঐ একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনের স্পর্শে আর সকল চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনার এই কেন্দ্রটি ঠিক ছিল বলিয়াই, আপনি উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন।

দোষত্রুটিও কিছু কিছু আছে—না থাকিতেও পারিত। শেষের দিকে একটু তাড়াতাড়ি করিয়াছেন। ঝড়েশ্বরের জীবিতকালের একটা তারিখ আপনি গোড়া হইতে ঠিক রাখিয়াছেন—সমস্ত কাহিনীটির একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। এই উপন্যাসে তাহার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু শেষের দিকের ঘটনা অতিশয় বর্ত্তমান বলিয়াই মনে হয়—ঝড়েশ্বরের বয়সের সহিত তাহা মেলে কি? গান্ধী আন্দোলন পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত পৌঁছে কি? আপনি এখানে একটু গোঁজামিল দেবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঝড়েশ্বর শেষ পর্যন্ত হিন্দুই রইল? তবে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ কোন মতে সম্পন্ন হইল? এইরূপ কয়েকটি গ্রন্থি শিথিল হইয়া আছে—তাহাতে বাস্তবতার হানি হয়।

তৎসত্ত্বেও আপনার এই উপন্যাস একটি অভিনব রচনা, অভিনব এবং অতিশয় সহজ এবং ধীর গভীর বলিয়াই সহসা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিতেও পারে। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার লক্ষ্যভেদ হইয়াছে। একটা বিষয়ে আপনি সত্যই অপরাধ করিয়াছেন—এত ছোট অক্ষরে ছাপা উচিৎ হয় নাই—উপন্যাস পাঠক সর্ববিষয়েই একটু আরাম চায়, এজন্য অনেকেই বিমুখ হইতে পারে। বইখানি আরো সুশ্রী হওয়া উচিৎ ছিল।

পুনরায় আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার